দিনাজপুর ১৯৭১

অংশগ্রহণকারী ও প্রত্যক্ষদর্শীর বয়ান

দিনাজপুর ১৯৭১

অংশগ্রহণকারী ও প্রতক্ষদর্শীর বয়ান

সম্পাদক
মুহাম্মদ লুৎফুল হক

প্রথমা প্রকাশন

দিনাজপুর ১৯৭১
অংশগ্রহণকারী ও প্রত্যক্ষদর্শীর বয়ান
গ্রন্থস্বত্ব © মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্র
প্রথম প্রকাশ : জ্যৈষ্ঠ ১৪২০, মে ২০১৩
প্রকাশক : প্রথমা প্রকাশন
সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ
কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫, বাংলাদেশ
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : কাইয়ুম চৌধুরী
সহযোগী শিল্পী : অশোক কর্মকার
মুদ্রণ : কমলা প্রিন্টার্স
৪১ তোপখানা, ঢাকা ১০০০

মূল্য : ২৭৫ টাকা

Dinajpur 1971
Angshagrahankari O Prattakkhadarshir Boyan
Edited by Muhammad Lutful Haq
Published in Bangladesh by Prothoma Prokashan
CA Bhaban, 100 Kazi Nazrul Islam Avenue
Karwan Bazar, Dhaka 1215, Bangladesh
Telephone: 8180081
e-mail: prothoma@prothom-alo.info

Price : Taka 275 only

ISBN 978 984 90254 0 5

ভূমিকা

মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী ও অংশগ্রহণকারীদের মৌখিক বিবরণ সংগ্রহের কাজ আমরা শুরু করেছিলাম ১৯৯৬ সালে। দেশের পাঁচটি অঞ্চল—কসবা, বরিশাল, দিনাজপুর, খুলনা ও চুয়াডাঙ্গা এবং রাজশাহী অঞ্চল থেকে সংগৃহীত বিবরণগুলো প্রয়োজনীয় সম্পাদনার পর ইতিমধ্যে মোট ২০ খণ্ডে (প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার পৃষ্ঠায় এ-৪ আকারে) গ্রন্থিত হয়েছে। এখনো অন্যান্য অঞ্চলের, বিশেষত ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট জেলার আরও বেশ কিছু কাজ আমাদের হাতে আছে। যতখানি কাজ এ পর্যন্ত করা হয়েছে, তা থেকে ধারণা করা যায়, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনার তথ্যভান্ডার ক্রমেই সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে।

যখন কোনো ঐতিহাসিক আন্দোলন বা রূপান্তরের সঙ্গে সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিপুলসংখ্যক মানুষ যুক্ত হয়ে পড়ে, তখন তাদের সাক্ষ্য ও প্রতিবেদনাদি সংগ্রহ করা যথার্থ ইতিহাস রচনার জন্য প্রয়োজনীয় পন্থা হিসেবে স্বীকৃত। ইতিহাস যাতে কেবল বিজয়ীপক্ষের নেতাদের ইতিহাস, ক্ষমতার দখলভোগীদের ইতিহাস, শাসকদের আত্মগরিমা ও পারিবারিক ইতিহাসে পর্যবসিত না হয়, সে জন্যই ইউরোপের প্রথম গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সময় ইতিহাস রচনার এই বিকল্প ধারার উদ্ভব ঘটে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে ফরাসি বিপ্লবের সময় সাধারণ মানুষের সংগ্রাম ফরাসি ইতিহাসবিদদের বিশেষ মনোযোগের ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। ফরাসি বিপ্লবের পর ওই দেশে ইতিহাস রচনার শৈলী সম্পূর্ণ নতুন দিকে মোড় নেয়। নতুন ধারার ইতিহাসবিদেরা শাসকশ্রেণীর ইতিহাস রচনার প্রচলিত রীতি পরিত্যাগ করে সাধারণ মানুষের সংগ্রাম ও অভিজ্ঞতাকে ইতিহাসের মুখ্য স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেন। তৃণমূল-ইতিহাস ইতিহাসশাস্ত্রে এক সম্মানজনক স্থান লাভ করে। সমাজের সাধারণ মানুষের স্তর থেকে দেখার মৌখিক বিবরণ কীভাবে ইতিহাসে পরিণত হতে পারে, কীভাবে তা যুক্তিসিদ্ধ শাস্ত্রে পরিণত হয়, তার পদ্ধতিগত উৎকর্ষও ঘটে ফরাসি ইতিহাস রচয়িতাদের হাতে।

বিংশ শতাব্দীতে, বিশেষত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর তৃণমূল-ইতিহাস রচনার

পরিমাণ বেড়ে চলে টেপ-রেকর্ডিং যন্ত্রের সহজলভ্যতার কারণে। পাশাপাশি পৃথিবীর নানা দেশের অনগ্রসর ও অবহেলিত মানুষের সংগ্রামের ইতিবৃত্ত গড়ে ওঠে তৃণমূল-ইতিহাস গ্রন্থনার ধারায়। সমাজের সাধারণ মানুষের স্তর থেকে দেখা ইতিহাস—'history from below' কেবল ইতিহাসচর্চায় নয়, রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রেও কিছু শুভ ফল সঞ্চার করে থাকে। সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও সংগ্রাম অনেক রাষ্ট্রেই কল্যাণকর বিবর্তনের অন্যতম চালিকা শক্তি।

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনায় বাংলাদেশেও অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রান্সের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা সম্ভব ছিল। কেননা, মুক্তিযুদ্ধ পাকিস্তানি আমলের বিকাশমান শাসকশ্রেণীকে নিষ্ক্রিয় করে ফেলে। স্বাধীনতার পর দেশের শাসনক্ষমতা সর্বাংশে কেন্দ্রীভূত হওয়ার আগে তৃণমূল-ইতিহাস রচনা অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল। পাকিস্তানের সামরিক চক্র অতর্কিতে নির্মম সামরিক অভিযান শুরু করার পর সাধারণ মানুষ যে নিতান্ত বাধ্য হয়েই মুক্তিযুদ্ধে নেমেছিল, অশেষ দুঃখকষ্ট ও নির্যাতন সত্ত্বেও তারাই যে এ দেশের স্বাধীনতা অর্জনের প্রধান চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে গেছে, সে কথার গুরুত্ব ক্রমেই হ্রাস পেয়ে চলে।

এমনকি এ দেশের প্রবাসী সরকার, যাদের প্রচেষ্টার ফলে নিঃসন্দেহে স্বাধীনতার পথ সুগম হয়েছিল, তাদের কাজের দলিল-দস্তাবেজ স্বাধীনতার পর ঢাকায় আনার পরও কোনো আর্কাইভে সংরক্ষিত হয়নি। কেন হয়নি, সে প্রশ্নের জবাব খুব বেশি রহস্যে ঘেরা নয়। তথ্যের এই শূন্যতার প্রেক্ষাপটে কেবল নেতৃত্বের বন্দনার বিরাম ঘটেনি কখনো। ক্ষমতার দৃশ্যপট পরিবর্তনের সঙ্গে এক অথবা আরেকজনের নেতৃত্বের মাহাত্ম্য প্রচারিত হয়, যার সঙ্গে ইতিহাসের বাস্তবতার মিল অতি সামান্যই। রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এই দ্বৈত নেতৃত্ববন্দনার হয়তো কিছু বাস্তব উপযোগিতা আছে। ফলে দেশের ক্ষমতার ওপর কর্তৃত্ব করার নৈতিক অধিকারবোধ হয়তো তাদের জন্মায়। কিন্তু ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন দেশের সরকার তাদের আর্কাইভ থেকে বাংলাদেশ-ভারত-পাকিস্তানসংক্রান্ত গোপন দলিল যেভাবে অবমুক্ত করে চলেছে, তাতে পুরোনো ধ্যানধারণা বজায় রাখা হয়তো শিগগিরই কষ্টসাধ্য হয়ে উঠবে।

এর আগে আমরা *gwîhG« Kmev: AskMnYKvix I cZÅÞ`kxi weeiY, gwîhG« Ljbv I PqvWvãv: AskMnYKvix I cZÅÞ`kxi weeiY, gwîhG« w`bvRci: cZÅÞ`kx I AskMnYKvixi weeiY, gwîhG« ewikvj: cZÅÞ`kx I AskMnYKvixi weeiY, gwîhG« ivRkvnx: AskMnYKvix I cZÅÞ`kxi weeiY,* তিন খণ্ডে *evsjvG`Gki gwîh« 1971: bvix, History from below 1971, ivRkvnx 1971: AskMnYKvix I cZÅÞ`kxi eqvb, KvgÍv 1971: AskMnYKvix I cZÅÞ`kxi eqvb* এবং *Kvgvjci 1971: mÁÅLGhv«v ‰es fviZxq I cvwKÕwb mgi weGklæG`i K^v* নামে ১২টি গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলাম। এবার প্রকাশিত হলো *w`bvRci 1971: AskMnYKvix I cZÅÞ`kxi eqvb*। সব মিলিয়ে একটি চিত্রই ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠছে—মানুষ, প্রধানত তৃণমূল মানুষের বাঁচা-মরার অসাধ্য সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বৃহত্তর অনেক কিছু আলোড়িত হয়ে উঠেছিল ১৯৭১-এ, ফলে বিভিন্ন রাষ্ট্রশক্তির সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে, বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা পায়।

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনার জন্য তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের যে বিপুল পরিমাণ কাজ এখনো বাকি রয়েছে, তা সম্পন্ন করার জন্য সমাজের মেধা ও সম্পদকে যুক্ত করার আবশ্যকতা রয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি, সরাসরি সূত্রে পাওয়া ঐতিহাসিক তথ্যাদি ছাড়া আরও যেসব তথ্য তৃণমূল মানুষের কাছে আছে, সেগুলো প্রয়োজনীয় সতর্কতাসহ সংগ্রহ করা দরকার। এতে যথার্থ ইতিহাস তৈরির পথ সুগমই হবে।

ঢাকা
এপ্রিল ২০১৩

মঈদুল হাসান
সদস্য পরিচালক
মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা ট্রাস্ট

সম্পাদকের কথা

স্বাধীনতাযুদ্ধ বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে প্রধান ঘটনা। পরিতাপের বিষয় যে স্বাধীনতার ৪২ বছর পরও এ ঘটনার পূর্ণাঙ্গ ও গ্রহণযোগ্য ইতিহাস রচিত হয়নি। দলিলপত্র বা তথ্যের অভাব ইতিহাস রচনার একটি প্রধান বাধা হিসেবে গণ্য হচ্ছে। যত দিন যাচ্ছে অবস্থা আরও সংকটাপন্ন হচ্ছে।

সাড়ে সাত কোটি বাঙালির অনেকে স্বাধীনতাযুদ্ধে সরাসরি অংশ নেন, অনেকে সহযোগিতা করেন আর অনেকে ক্ষতিগ্রস্ত হন; যুদ্ধ দেশের প্রায় সবাইকেই কোনো না কোনোভাবে প্রভাবিত করে। তাঁরা প্রতিনিয়ত যুদ্ধকে প্রত্যক্ষ করেন আর যুদ্ধও তাঁদের জীবনযাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করে। সাড়ে সাত কোটি বাঙালির যুদ্ধ-অভিজ্ঞতা অভিন্ন না হলেও বলতে গেলে একই ধারার। সবার স্মৃতিতে মুক্তিযুদ্ধের অনেক তথ্য জমা হয়ে আছে। মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্র ১৯৯৬ ও ১৯৯৭ সালে 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১ : কথ্য ইতিহাস' প্রকল্পের আওতায় স্মৃতিতে জমে থাকা এসব তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে দলিলে রূপান্তরের উদ্যোগ নেয়। তখন দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে স্বাধীনতাযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী, প্রত্যক্ষদর্শী ও ক্ষতিগ্রস্ত আড়াই হাজারের বেশি মানুষের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। এ সাক্ষাৎকারগুলোয় মূলত অংশ নেন গ্রামগঞ্জের অতি সাধারণ মানুষ, যাঁদের নিজ এলাকার বাইরে বিশেষ কোনো পরিচিতি নেই। এঁদের অধিকাংশই কৃষক, শ্রমজীবী, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী বা স্বল্প আয়ের চাকুরে। সাধারণভাবে এসব ব্যক্তি তাঁদের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির কথা কোথাও বলার সুযোগ পান না। যুদ্ধকালে তাঁরা যা করেছেন, যা দেখেছেন আর যা বুঝেছেন, তা-ই নিজের ভাষায় নিজের মতো করে বলে গেছেন। সাক্ষাৎকারভিত্তিক এই দলিলগুলো ভবিষ্যতের গবেষণাকর্মে বিশেষভাবে সাহায্য করবে।

কথ্য ইতিহাস প্রকল্পের আওতায় বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার ১৭৬ জন প্রত্যক্ষদর্শী ও অংশগ্রহণকারীর সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। এর মধ্যে ২২ জনের সাক্ষাৎকার মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্র ২০০৪ সালে *gwîhG« w`bvRci* নামের একটি গ্রন্থে প্রকাশ করে। বাকি সাক্ষাৎকারগুলো থেকে শুধু বর্তমান দিনাজপুর

জেলার ৩০ জনের সাক্ষাৎকার *w`bvRci 1971: AskMnYKvix I cZÅÞ`kxi eqvb* গ্রন্থে প্রকাশ করা হলো। সংকলিত সাক্ষাৎকারগুলোতে স্বাধীনতাযুদ্ধ চলাকালের বর্তমান দিনাজপুর জেলার চিত্র আংশিক হলেও ফুটে উঠেছে।

সাক্ষাৎকারের মূল পাণ্ডুলিপিতে বেশ কিছু প্রশ্ন আছে, যা গুরুত্বের বিবেচনায় খুব একটা প্রয়োজনীয় মনে হয়নি। মূল্য কম রাখতে হলে বইয়ের কলেবরও খুব বড় করা যায় না। সে কারণে এ ধরনের কিছু প্রশ্ন ও তার উত্তর বাদ দেওয়া হয়েছে। সাক্ষাৎকারগুলোতে কখনো কখনো স্থানের নামের উচ্চারণের ভিন্নতার কারণে বিভ্রান্তি দেখা দেয়। যতটুকু সম্ভব সঠিক নাম জেনে তা শুধরে নেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। সাক্ষাৎকারদানকারীর দেওয়া সব তথ্যই সঠিক বলে প্রমাণিত হয় না, তথাপি কথ্য ইতিহাসের নীতিমালা অনুযায়ী তা অবিকৃত বা অক্ষুণ্ন রাখা হয়েছে। সাক্ষাৎকার প্রদানকারীরা বিভিন্ন পেশা, বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতার অধিকারী হওয়ায় তাঁদের ব্যাখ্যা ও বিবেচনাতেও তারতম্য দেখা যায়।

১৯৯৭ সালে মাঠপর্যায়ে সাক্ষাৎকার নেওয়ার দুরূহ ও সময়সাপেক্ষ কাজটি করেছেন ভবেন্দ্রনাথ বর্মণ, আবদুল কাইয়ুম ও অমরচাঁদ গুপ্ত। তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এ ছাড়া সাক্ষাৎকারগুলো প্রকাশযোগ্য করে গ্রন্থিত করার জন্য প্রকল্পের তদানীন্তন পরিচালক ড. সুকুমার বিশ্বাসের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। সাক্ষাৎকার গ্রহণকালে সাক্ষাৎকারদানকারীদের ছবি সংগ্রহ না করায় দীর্ঘদিন পর তাঁদের খুঁজে বের করা বা তাঁদের ছবি সংগ্রহ করা বেশ দুরূহ হয়ে পড়ে। তথাপি সাক্ষাৎকারদানকারী মুক্তিযোদ্ধাদের ছবি সংগ্রহ করে দেওয়ার জন্য *c^g AvGjv*র স্থানীয় প্রতিনিধি সাদেকুল ইসলাম (ফুলবাড়ী), এ এস এম আলমগীর (বিরামপুর ও নওয়াবগঞ্জ), জাহিদুল ইসলাম (হাকিমপুর) ও মো. আসাদুল্লাহ সরকারকে (দিনাজপুর) ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পরিশেষে গ্রন্থটি প্রকাশনার দায়িত্ব নেওয়ার জন্য প্রথমা প্রকাশনকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

মুহাম্মদ লুৎফুল হক
ঢাকা, মে ২০১৩

সূচিপত্র

আবদুর রাজ্জাক সরকার	১৩
এস এম আব্বাস আলী	২৩
নজরুল ইসলাম	৩১
মমতাজ আলী	৩৮
মো. আজিজুল হক	৪৬
মো. আবদুর রশীদ	৫১
মো. আবদুল খালেক	৫৬
মো. আবদুস সাত্তার	৬২
মো. আবদুস সামাদ	৬৫
মো. এহিয়া মণ্ডল	৭০
মো. জহুরুল হক সরকার	৭৫
মো. জারজিশ আলী	৭৯
মো. নজরুল ইসলাম	৮৪
মো. মকবুল হোসেন সরকার	৮৯
মো. মতিউর রহমান	৯৫
মো. মহসীন আলী চৌধুরী	১০১
মো. রহিমউদ্দীন	১০৯
মো. সাইদুর রহমান	১১৫
মো. সাহেব সরকার	১১৯
মো. সিদ্দীকুল হক	১৩৩

মোজাফফর রহমান	১৩৮
মোসাম্মৎ আনোয়ারা মালেক	১৪৩
মোহাম্মদ আবদুর রশিদ	১৪৮
মোহাম্মদ খলিলুর রহমান সরকার	১৫৭
মোহাম্মদ জহুরুল ইসলাম	১৬২
মোহাম্মদ মকবুল হোসেন	১৬৭
মোহাম্মদ মজিবর রহমান	১৭১
মোহাম্মদ মতিউর রহমান	১৮৪
মোহাম্মদ শাহাবুদ্দীন শাহ্	১৯১
শহীদুর রহমান	২০৪
পরিশিষ্ট : মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা ট্রাস্ট	২০৮

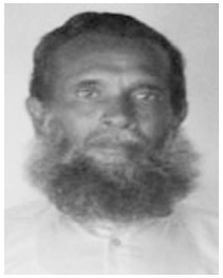

আবদুর রাজ্জাক সরকার

পিতা : মরহুম হুজুর আলী সরকার, গ্রাম : গুণবিহার, ডাক : পুঁটিমারা
থানা : নবাবগঞ্জ, জেলা : দিনাজপুর, শিক্ষাগত যোগ্যতা : ষষ্ঠ শ্রেণী
১৯৭১ সালে বয়স ১৬ বছর, ১৯৭১ সালে বেকার ছিলেন
বর্তমানে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী।

পাকিস্তানি সেনাদের দ্বারা আপনি কি আক্রান্ত হয়েছিলেন?

- না, তাদের হাতে আমি ধরা দেই নাই।

আপনি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেন কেন?

- মুক্তিযুদ্ধে আমি অংশগ্রহণ করছি এ জন্যই যে শান্তি কমিটির যে চেয়ারম্যান ছিল, আমাকে তাদের দলে নিয়ে যাওয়ার জন্য এবং রাজাকারে ভর্তি করাবার জন্য আমার বাড়িতে তিন দিন আসে। আমি বলেছিলাম, না, আমি রাজাকারে কোনো দিন যাব না। আমাকে যদি যেতে হয়, আর জীবন যদি দিতে হয়, আমি দেশের জন্য দেব, তবু এই রাজাকারের জন্য দেব না—এই মনে করে আমি মুক্তিফৌজে গেছি।

আপনার এলাকায় কখন থেকে পাকিস্তানিরা আক্রমণ করল?

- ২৬ মার্চের প্রথম থেকেই এখানে আক্রমণ শুরু হইছিল।

তারা আপনার এলাকায় কীভাবে আক্রমণ করে?

- শুক্রবার দিন, হিলি বর্ডার থেকে শুরু করে ঠিক ১২টার সময় আমাদের গ্রামে আগুন লাগাই দেয়, দুই পাশ দিয়ে আগুন লাগাই দেয় এবং আসে।

পাকিস্তানি সেনারা কি আপনার এলাকায় শুধু আগুন লাগিয়ে দেয়, নাকি আরও কিছু করেছে?

- আগুন লাগাই দিছে, মা-বোনদের ইজ্জত ধ্বংস করছে, লুটতরাজ করছে।

আপনার পরিবারের কেউ কি শহীদ হয়েছেন?

● আমার পরিবারের কেউ শহীদ হয় নাই।

আপনার এলাকায় কখন থেকে মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা শুরু হয়?

● আমার এলাকায় গোলযোগ শুরু হওয়ার এক-আধ মাস পর মনে হয় হবে।

আপনি কখন থেকে মুক্তিবাহিনীতে তৎপরতা শুরু করেন?

● মার্চের দুই মাস পর।

আপনাদের এলাকায় যারা রাজাকার, আলবদর, আলশামস ছিল, তারা কি আপনাদের বিরোধিতা করেনি?

● তারা তো বিরোধিতা করেছেই।

আপনার গ্রাম বা এলাকায় রাজাকার, আলবদর, আলশামস কারা ছিল?

● আমরা যখন মুক্তিফৌজে গেছি এবং দেশ স্বাধীন করে দেশে ফিরছি, ওই সময় আমরা ছিলাম না। সে জন্য গ্রাম বা এলাকা সম্পর্কে কিছু জানি না। তবে শুনছি রাজাকার ছিল।

দেশ যখন স্বাধীন হলো, তখন কি এই রাজাকার, আলবদর, আলশামসদের ধরা হয়েছিল?

● ধরা হয় নাই এই কারণে যে, অনেকে বলেছে যে তাদের জীবন বাঁচাবার জন্য তারা গেছে, তারা হয়তো তেমন ক্ষতি করে নাই।

আপনি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে কোন এলাকায় যুদ্ধ করেছেন?

● প্রথম ট্রেনিং শেষ হলে সনজিয়া বর্ডারে আমার প্রথম ডিউটি পড়ে।

সেখান থেকে আপনি কোন এলাকায় যুদ্ধ করলেন?

● সনজিয়া বর্ডার থেকে আসছি পার্বতীপুর।

পার্বতীপুরে যুদ্ধ করেছেন?

● পার্বতীপুরে যখন আমরা ঢুকি, তখন খানসেনারা টিকতে পারে না। তখন পার্বতীপুর ডিপোতে আগুন ধরাই দিয়ে চলে যায়। আবার ওখান থেকে আমরা ব্যাক করে চলে যাই বড়াইহাট। যখন আমরা বড়াইহাট যাই, তখন ওরা মোহনপুর ব্রিজে। ফুলবাড়ী দিনাজপুর মোহনপুর ব্রিজ। মোহনপুর ব্রিজে আমাদের বহু ছেলে আহত ও নিহত হয়। এভাবে সাত দিন যুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানিরা ওখান থেকে হঠতে বাধ্য হয়। মোহনপুর ব্রিজ থেকে পাকিস্তানি সেনারা চলে যাওয়ার পর আমরা ব্রিজ দখল করে নিলাম। ব্যাঙ্গো দীঘি থেকে শেলিং শুরু করে তারা ব্রিজের কিছুটা অংশ ধ্বংস করে দিল। আমরা তবু ওখানে ছিলাম। এক রাত থাকার পর আবার তারা ট্যাংক নিয়ে আসে। যখন আমরা টিকতে পারি না, তখন করলাম কি, আমরা ওই ব্রিজের কিছু অংশ উড়িয়ে দিই। আবার তিন দিন পর যুদ্ধ শুরু হলো। খানসেনারা দিনাজপুর থেকে ট্রেনে করে পার্বতীপুর আসে। তখন ইন্ডিয়ান সৈনিকদের ওপর ওপর থেকে অর্ডার আসল। বলা হলো, চিরিরবন্দরে যে রেলের ব্রিজ আছে যমুনায় সেই ব্রিজটা উড়িয়ে দেওয়ার জন্য। ভারতীয় বাহিনী আমাদের সঙ্গে নিল। তারা বলল, আমরা আপনাদের সহযোগিতা করব কিন্তু আপনাদেরও সহযোগিতা করতে হবে। এই ব্রিজ উড়াবার অর্ডার হয়েছে আমাদের ওপর। আপনারা কিছু ছেলে দেন এবং আমরাও কিছু দেই, ব্রিজটা ওড়াই। সেখানে শিখ সেনারা হলো আড়াই শ এবং মুক্তিযোদ্ধা হলো আড়ই শ—এই ৫০০। এখন মোহনপুর থেকে আমরা চিরিরবন্দরের দিকে যাই। ব্রিজ ওড়াতে গিয়ে আমার জানামতে প্রায় ১০০ মুক্তিযোদ্ধা প্রাণ হারান।

এ সময় ভারতীয় ফৌজ কত মারা গেছে?

● ওদের হিসাবটা আমরা জানতে পারিনি। ব্রিজটার ওপর সব সময় ২৫ জন রাজাকার ডিউটি করত। বসে থাকত দিনরাত। আমরা রাত ঠিক একটার সময় পৌঁছে গেলাম ব্রিজে। মোহনপুর থেকে কয়েক দলে বিভক্ত হয়ে।

ব্রিজে উঠে গেছেন আপনারা?

● না না, ব্রিজের এ পাশে আমরা আছি। এ পাশে থাকতেই ব্রিজে পাঁচ মিনিট পর পর খালি ফায়ার হয়। তখন আমরা মনে করলাম, কী ব্যাপার, আমাদের লোক তো এখানে আর কেউ আসে নাই। ফায়ার হওয়ার কারণটা কী? তখন আমাদের কমান্ডাররা চলে গেল আমাদের আড়ালে থুইয়ে। যাইয়ে দেখে, রাজাকাররা ব্রিজের ওপরে বসে বসে ডিউটি করতেছে লাইন হয়ে, আর একজন একজন করে গুলি করতেছে। একজনের গুলি শেষ হলে আরেকজন গুলি করতেছে। আবার ওনার গুলি শেষ হয়ে গেলে পাঁচ মিনিট পর আবার আরেকজন গুলি করতেছে। পর পর এইভাবে ফাঁকা ফায়ার করতেছে।

সেখানে কি পাকিস্তানি সেনা ছিল না।

● পাকিস্তানি কোনো সৈন্য ব্রিজের ওপর ছিল না। পাকিস্তানি সৈন্যরা চতুর্দিকে এমনভাবে বাংকার করেছিল যে এক বাংকার থেকে আরেক বাংকারে যেতে হলে ওপরে ওঠার দরকার নেই। মাটির নিচ দিয়েই সুড়ঙ্গ করে ওদের গাড়ি চলাচলের ব্যবস্থা করেছে এবং ব্রিজের চতুর্দিক দিয়ে তারা মাইন পেতে রেখেছে। মাইন সেট করে একটি ফিতা ফেলেছে। পাকিস্তানিরা ফিতার ওপর দিয়া বাংকারে যাইত। এরকমভাবে ব্রিজের প্রায় হাফ মাইল পর্যন্ত চতুর্দিকে বাংকার করে খানসেনারা থাকত। আর রাজাকারেরা শুধু ওই ব্রিজের ওপর থেকে রাত্রে একের পর এক ফায়ার করত। আমাদের সঙ্গে দু-একটা ওয়্যারলেস সেট ছিল। তখন আমাদের হেড অফিস থেকে ওয়্যারলেসে বলতেছে যে কেমন পরিস্থিতি? তখন আমরা পরিস্থিতি বললাম। সেখানে যে ফায়ার হচ্ছে তা-ও জানালাম। আমাদের বলা হলো, আগে দেখো কীভাবে ফায়ার হচ্ছে। তারপর আমাদের কমান্ডাররা গেল। কমান্ডাররা যায়া দেখে আসল যে রাজাকাররা ঘুমও

পাড়তেছে আবার ফায়ারও দিতেছে। ওখান থেকে তারা দেখে আসার পর আমাদের যেভাবে প্রস্তুতি নেওয়ার সেইভাবেই নিয়ে যার যেটা কাজ সেটা শুরু করা হলো। একসঙ্গে আমরা অ্যাডভান্স করে চলে গেলাম ব্রিজের ওপর। ব্রিজের ওপর যাইয়া ওদের আমরা ধইরা ফেললাম।

রাজাকারদের ধইরা ফেললেন?

● হ্যাঁ, রাজাকারদের ধইরা ফেললাম।

কতজন রাজাকার ছিল?

● ২৪ জন। ধরার সঙ্গে সঙ্গে ওরা বলছে যে কী ব্যাপার? বলি, কোনো ব্যাপার নেই। আপনারা চুপচাপ থাকেন, কোনো সাউন্ড দিতে পারবেন না। আমরা যে পাশে ব্রিজ ওড়াব ওই পাশে ওদের হাতিয়ারগুলা নিয়ে ওদের ওই ব্রিজের সঙ্গে বান্দলাম। বাইন্দে ব্রিজটা আমরা উড়িয়ে দিয়েছি। ওদের হয়তো হাড়হাড্ডি-মাংস কিছুই আর পাওয়া যাবে না।

কিন্তু আপনাদের মুক্তিযোদ্ধারা কীভাবে মারা গেল?

● আমরা ওখানে যে কাজ করছি এটা তো খানসেনারা জানতেছে না। যখন ব্রিজটা উড়ে গেল, বিকট শব্দ হলো। একদম গোটা শহরটা, কাকপক্ষী, কুকুর, গরু, বাছুর—সব কলরব করে উঠল। আমার মনে হচ্ছে, ঠিক ৮০ গজ নিচে চলে গেছে। এমন একটা ধাক্কা হলো। তারপর পাঁচ মিনিট পর আবার একটা কলরব করে উঠল। এরপর একদম নীরবতা। তারপর গোলাগুলি শুরু হলো পাকিস্তানিদের সঙ্গে। যতক্ষণ পর্যন্ত ব্রিজটা উড়ে যায়নি ততক্ষণ পর্যন্ত ওরা জানতে পারতেছে না যে, ব্রিজ উড়তেছে। বাংকারে ঘুমায়ে থাকতেছে। আর রাজাকাররা তো ডিউটিতে আছেই, ওদের ধারণা। ব্রিজটা উড়ে যাওয়ার পর রাত দেড়টা থেকে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত পাকিস্তানি সেনাদের সঙ্গে গোলাগুলির মধ্যে আমাদের বহু ছেলে চলে যায়। মারা যায় আরকি! আমাদের কোনো বাংকার নাই। ওদের কাছে হেভি অস্ত্র। আমরা তো সামান্য কিছু নিয়ে গেছি।

সে দিন আপনাদের কতজন আহত হয়েছিল?

● আহতের কথাটা তো বলা যায় না। আমরা তো ওখানে আছি এবং পিছনে গাড়ি আছে। যার কাছে যে আহত হচ্ছে তাকে গাড়িতে দেওয়া হয় এবং যে মারা যাচ্ছে তাকেও গাড়িতে দেওয়া হয়। মুক্তিফৌজের লাশ যেখানে যে মারা গেছে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় ক্যাম্প অফিসে। অফিস থেকে বাংলাদেশে মাটি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। আমার জানামতে, আমি একজনকে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। আমি ডাক্তারকে বললাম, ওর মাটি যেন বাংলাদেশে হয়। ডাক্তার বলল, তুমি কোনো চিন্তা কোরো না, ওর মাটি বাংলাদেশে হবে। তারপরে ওখান থেকে আমরা অ্যাডভান্স করে চিরিরবন্দরে ঢুকি।

ব্রিজ যেটা ওড়ালেন, সেটা কি কাউয়ার ব্রিজ?

● হ্যাঁ, কাউয়ার ব্রিজ।

নদীর ওপর যে বড় ব্রিজটা। সেটা কী আত্রাই নদী?

● আত্রাই নদী, বড় ব্রিজ।

পরে কী হলো?

● তখন ভোর হয়ে গেল। ওরা যেখানে ছিল আমরা সেখানে চার্জ করতে গেলাম। তখন আমরা একই সঙ্গে যাচ্ছি। যেতে যেতে এক খানসেনা করেছে কি, তার আগে সে আমাদের এক মুক্তিফৌজকে মারছে। মারার পর ওই মুক্তিযোদ্ধার শার্ট, তার লুঙ্গি, তার গামছা সে নিজে পরে নেয়। আমাদের দেখে বাংকার থেকে পালাতে থাকে। আমরা 'হ্যান্ডস আপ' বলতেই সে বলল, কিয়া হ্যান্ডস্ আপ? হাম তো মুক্তিফৌজ হায়, হাম তো মুক্তিফৌজ হায়, কইতে কইতে পজিশনে গেছে। জায়গাটা একটু সাপোর্টে ছিল। পজিশনে যাইয়ে ওই এক খানসেনা আধা ঘণ্টা ধরে আমাদের সকল মুক্তিযোদ্ধাকে মোকাবিলা করছে। আমাদের সঙ্গে একা মোকাবিলা করার পর তার কাছে যখন গোলাবারুদ ছিল না, তখনই সে আত্মসমর্পণ করল। তাকে আমরা ধরে ফেললাম। তাকে নিয়ে ওখান থেকে আমরা চিরিরবন্দর থানাতে গেলাম।

সে দিন আপনারা কতজন পাকিস্তানি সেনাকে ধরতে পেরেছিলেন?

● জীবিত অবস্থায় একটাই ধরেছিলাম।

তারা কতজন মারা গিয়েছিল?

● তারা মারা গেছিল বহু। আমাদের তো গুনতি পারা বা দেখার সময়-সুযোগ হয় না। যখন আমরা অ্যাডভান্স করে যাই, তখন যে জায়গাটাতে যুদ্ধ হয়, সেই জায়গাটাকে আমাদের দখলে নিতে যাইয়ে স্থানটিতে অন্য রকম অবস্থা থাকে। গোনাগুনির সুযোগ কম থাকে। কোনো সময় এমন হয় যে যতই দামি জিনিস থাক বা কিছু থাক কারও নেওয়াও সম্ভব নয় বা কেউ নিবে না, আমাদের মধ্যে এটা নেইও। তখন কেবল আমরা দেখেই যাব। কেবল অস্ত্রশস্ত্র যেগুলো থাকে, সেগুলোর মধ্যে নেওয়ার সুযোগ যেগুলো থাকে, কেবল সেগুলো নেওয়া হয়। ওখান থেকে আমরা চিরিরবন্দর ঢুকি।

ওই দিনই?

● ওই দিন মানে, ওই সময়ে। চিরিরবন্দরে গেলাম। চিরিরবন্দর পর্যন্ত ওদের বাংকার। রেললাইনের ধার দিয়ে। ওদের গাড়িটাড়ি গেছে। আমরা আবার ওই দিকে চার্জ করে যাচ্ছি। চিরিরবন্দর থানায় যাইয়ে ঢুকলাম এবং সব ঘরটর তল্লাশি করে দেখতেছি, এ সময় এক লোককে সেখানে পাই বন্দী অবস্থায়, আওয়ামী লীগের একজন বিশিষ্ট নেতা তিনি, ওনার বাড়ির অবস্থা বিরাট। তারে

সাত দিন থেকে ওই থানার মধ্যে আটক করে রাখছে। তার আত্মীয়স্বজন গেছিল, তাদের দেখাইছে যে তাকে মারা হইছে।

ওনার নাম কি আপনি বলতে পারেন?

● ওনার নামটা সঠিক বলতে পারব না, তবে তার বাড়ির কথা বলতে পারি।

কোন গ্রামে বাড়ি?

● যে ব্রিজটা আছে, ব্রিজের দক্ষিণ পাশে যে গ্রামটা।

গ্রামের নাম বলতে পারবেন?

● গ্রামের নাম বলতে পারব না। ওখানে আমি বেশি দিন ছিলাম না। তিন দিন মাত্র ছিলাম। যখন ওই ব্রিজটা উড়ে যায় তখন জানলা ধরে এমনভাবে ওই লোক চিৎকার করছে যে মনে হয় ১০ মাইল দূর থেকে লোকে শুনতে পাবে। কিন্তু তখন তার গলায় কোনো শব্দ নেই। লোকটা আপনার চেয়েও লম্বা-চওড়া হবে এবং স্বাস্থ্যবান। লোকটাকে কিছুই খাইতে দেয়নি। ওই অবস্থাই আছে। জানলাতে হাতটা ঢুকায়ে দিয়ে রড ধরছে। আমরা যখন ঘরে ঢুকি তখন সে ওই অবস্থায় আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। অন্য রকম হয়ে গেছে। তখন তাকে ওখান থেকে নামানো হয়। কথাবার্তা বলতে পারতেছে না। একদম কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেছে। তখন উনি ইশারায় বলতেছে যে, আমাকে একটা কলম দেন। কলম দিয়ে লিখতে পারে নাই। আমাদের কমান্ডার দিল চক। চক দিয়ে উনি দেয়ালে লিখে দিল যে আমার বাড়ি অমুক খানে। আমি আওয়ামী লীগের একজন কর্মী। আমরা কয়েক শ লোক তাকে গ্রামে নিয়ে যাই। সেখানে যে তিন দিন আমরা ছিলাম, তিন দিন ধরে সমস্ত প্রকার খানা-পানি ওই লোক সবাইকে খাওয়াইছে। কাউকে পাকশাক করতে দেয়নি এবং যত প্রকার সহযোগিতা করার লাগে ওদের লোকজন দ্বারা আমাদের করছে।

আপনার জীবনের সবচেয়ে ভয়াবহ যুদ্ধ কোন জায়গায় ঘটেছিল?

● ভয়াবহ যুদ্ধ ঘটেছিল বারারহাটের দক্ষিণে।

সেখানে কীভাবে যুদ্ধ হলো?

● আমরা মুক্তিফৌজ ছিলাম ১২০ জন। ওই গ্রামে আশ্রয় নিয়েছি। দিনটা ছিল রবিবার। আমরা সকলেই ওই দিন কাপড়চোপড় পরিষ্কার করতেছি। এমন সময় তিনজন লোক আসল আমাদের কাছে। আমরা যে গ্রামে থাকি ওখানে কোনো লোকজন ছিল না। সব ভারতে চলে গেছে। একদম ফাঁকা। গ্রামের নামটা আমার সঠিক খেয়াল নেই। তবে ওখানে যাইয়ে আমাদের বলতেছে, ভাই, আপনারা এখানে আছেন, আপনাদের খাওয়াদাওয়ার অসুবিধা। আমরা বলি, না, আমাদের তো কোনো অসুবিধা নাই। ওই তিনজন বলছে, এগুলো আমাদের বাড়িঘর। আমার চাচার বাড়ি এটা, ভাইয়ের বাড়ি ওটা—এরকমভাবে বলতেছে

এবং শুনতেছে। তারা বলল, আপনাদের আমরা একটু সহযোগিতা করতে চাই। কেমন? আপনারা মাছ খাবেন? তো মাছ-মাংস তো আমরা খাই। গ্রামে কোনো লোকজন নাই। শুধু আমরাই। তখন আমাদের বলল যে অমুক বাড়িতে জাল আছে, আমাদের সঙ্গে আসেন। ওদের সঙ্গে গেলাম। ওরা জাল বাইর করে নিয়ে গ্রামের বাইরে পুকুরের কথা বলল। বিরাট পুকুর। উঁচু উঁচু পাড়। ওনারা আগে আগে যাচ্ছে। আমাদের কমান্ডার আবার বলতেছে যে মাছ আনতে তো সবাই যাচ্ছেন—যাক, অন্য কিছু না নিয়ে গেলেও দুরবিনটা নিয়ে যান।

দুরবিন?

● হ্যাঁ, দেখার জন্য। ওরা আগে আগে যাচ্ছে। আর আমরা পিছনে সবাই আনন্দ কইরা যাচ্ছি যে এখানে তো আর কিছু নেই।

মাছ মারার জন্য?

● মাছ মারার জন্য। দিনের বেলায়।

আপনাদের কাছে কোনো অস্ত্র ছিল না?

● অস্ত্র সব কমান্ডারের কাছে জমা রেখে ওদের সঙ্গে যাচ্ছি। ১১০ জনের ভিতর ৩০-৪০ জন যাচ্ছে শখ করে মাছ মারবে, আমরা দেখব। সিভিলে সব। আমাদের তো পোশাক ছিল না। তখন ওরা করছে কি ওই দিক থেকে খানসেনাদের খবর দিয়ে নিয়ে আসছে। নিয়ে আইসে পুকুরের উত্তর পাশে রাখছে। আর এদিক থেকে আমরা যাইতেছি। ওরা কিন্তু রাজাকার। আমরা বুঝতে পারিনি। আমাদের নিয়ে যাচ্ছে। আমাদের ছেলেরা পুকুরের পাড়ে তখনো উঠে নাই। লাইন ধরে যাচ্ছে। আর পূর্ব পাশ দিয়ে, পশ্চিম পাশ দিয়ে খানসেনারা দেখতেছে যে কতগুলো ছেলে আসতেছে। আমার পিছনে যে ছেলেটা ছিল, যার হাতে দুরবিন ছিল, ও দুরবিন দিয়ে দেখে যে, হ্যাঁ, কাজ হয়েছে, খানসেনা। আমাদের মধ্যে একটা চিহ্ন থাকে।

সংকেত?

● হ্যাঁ, ওই সংকেত দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সব পজিশনে চলে গেলাম। পজিশনে যাওয়ার পরই পাকিস্তানিরা তো বুঝতে পারল। তখন পাকিস্তানিরা আমাদের ওপর ফায়ার করা শুরু করল। তখন আমাদের যারা পিছনে আছে তারা তো আর ফায়ার করতে পারে না। তারা জানে যে, সামনে আমাদের ছেলে, ওরা হয়তো ভাবছে, আমরা পিছন থেকে ফায়ার করব, এখন কে মরবে? আমরা তো কিছু বুঝতে পারছি না। শেষ পর্যন্ত আমরা কোনোরকমে আমাদের এরিয়ায় গিয়ে উপস্থিত হই। পরে সেখানে এক দিন, মানে সমস্ত দিন ধরে, তাদের সঙ্গে আমাদের মোকাবিলা হয়। এই সংঘর্ষে আমাদের মধ্যে দুইজন ছেলে মারা গেল।

তখন আপনারা নিরস্ত্র অবস্থায় ছিলেন?

- নিরস্ত্র অবস্থায় ব্যাক করে আসার সময় ওদের হাতে মারা গেছে দুইজন। পরের দিন সকালে আমরা ওই পুকুরের পাড়ে আবার যাই। গিয়ে দেখি ওরা একটা লম্বা বাঁশে দড়ি লাগাইছে। দুই পাশে দড়ি লাগাইয়ে দুইজন টানতেছে। আবার দুইজন গৃহস্থ ছাতি নিয়ে জমি দেখতেছে। আর দুইজন করে ধান ঠিক কইরে দিতেছে। এইভাবে আসতেছে ওই পুকুরের দিকে।

পাকিস্তানি সৈন্যরা?

- পাকিস্তানি সৈন্যরা। তখন আমরা বুঝতে পারলাম যে একটা লোক বা একটা গৃহস্থের জমিতে যদি বাঁশ দেয় তবে একটা গৃহস্থের জমি এক দাগে কয় বিঘা থাকতে পারে? হয় দশ, বিশ, না হয় পঞ্চাশ বিঘা। তার বেশি তো থাকতে পারে না। তো ওরা বাঁশ টানতেছে আর আসতিছে। পাকিস্তানিরা যখন আমাদের রেঞ্জের মধ্যে ঢুকে গেল, তখন আমরা এই ১১০ জন একবারে ফায়ার করলাম। একটাও ফেরত যেতে পারল না। পরে আমরা যখন ওদের চার্জ করি, দেখি, কারও গুলি লাগছে এখানে, আবার দুই বিঘা দূরে গিয়ে ওখানে মারা গেছে। একেকটার চারটা, পাঁচটা, সাতটা পর্যন্ত গুলি লাগছে।

সে দিন আপনাদের গুলিতে কতজন পাকিস্তানি সৈন্য মারা গেছে?

- সে দিন মারা গেছে আটজন।

সেখানে কি তাদের বাংকার ছিল?

- না, ওখানে বাংকার ছিল না। বাংকার আরও দূরে ছিল।

এ ধরনের আর কোথায় আপনার সঙ্গে যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছে?

- আর একটা ঘটনা হয়েছে। তবে সেটা যুদ্ধ হয়নি। ওই এলাকায় রাজাকার ছিল ১১ জন। এর মধ্য থেকে মুক্তিফৌজে আসবে তিনজন।

সেটা কোন গ্রামে, কোথায়?

- মোহনপুর ব্রিজের পূর্বে একটা উঁচা ঢিবি এবং ছোট একটা কালভার্ট আছে। জামগাছ আছে সেখানে। এলাকার সঠিক নাম মনে নেই। আসলে রোডের উত্তর পাশে পূর্ব কর্নারের গ্রাম। তিনজন যখন মুক্তিফৌজে আসার জন্য আলোচনা করছিল কথাটা বাকি আটজন শুনতে পায়। এই তিনজনের কথা খানসেনাদের কাছে বলে দেয়। পরে ওই তিনজনকে এমনভাবে মারধর করে যে কোনোরকমে তাদের জীবন বাঁচায়ে রাখে। মারধর করার পর আবার রাজাকারেই তাদের রাখে। তারা শুধু সুযোগ খোঁজে যে কেমন কইরে মুক্তিফৌজকে পাবে। এইভাবে তারা ঘুরতে থাকে আর ডিউটি করে চতুর্দিকে। ওরা শুনতে পেল যে অমুক জায়গায় মুক্তিফৌজরা আসছে এবং ওখানে থেকে তারা যুদ্ধ করতেছে। তারাও বাইরে আগে আইসে। একদিন রাত একটার সময় ওদের সঙ্গে আমাদের মোকাবিলা হয়। পরের দিন ভোর পাঁচটায় ওরা জীবনের ভয় হয়তো করে নাই। ওদের সঙ্গে তিন দিন ধরে মোকাবিলা করতেছি, কিছুই পারি না। আমাদের কিছু হয় না, ওদেরও আমরা হটাতে পারি না। রোড আমরা ক্যাপচার করতে পারি না। রোডে উঠতেও পারি না। এই দিনাজপুর রোড। তখন পিছন থেকে ভারতীয় সেনাদের শেলিংয়ের ফলে ওরা বিতাড়িত হলো। আমরা রোডে উঠলাম। রোড আমাদের হাতে থাকল। ওই রোডে ওরা জীবন দেওয়ার পণ করেই আসছে। আইসে তিন রাজাকার আমাদের বলল, ভাই, আমাদের মারছে। ওরা সবাই রাজাকার। আপনারা যদি আমাদের সহযোগিতা করেন, তাহলে আমরা ওদের ধইরা দিতে পারব। তখন ওদের নিয়ে রাত্রে আমরা চইলা গেছি গ্রামে।

গ্রামটার নাম কী?

- গ্রামের নাম আমার স্মরণে নেই। বহুদিনের কথা। ওই গ্রামে আমরা গেলাম। গিয়ে যখন উঠলাম, তখন মুক্তিফৌজের একটা ডাক পড়ে গেল। বহু লোকজন এবং গ্রামের লোকজন সব জড়ো হলো। তাদের বললাম, হ্যাঁ ভাই, আমরা মুক্তিফৌজ, কোনো ভয় নেই। আপনারা এক কাজ করেন। এই গ্রামের সবচেয়ে ফাঁকা জায়গা কোনটা আছে। তখন বলল যে অমুক জায়গাটা আছে, গ্রামের মাঝখানে। বললাম, সাত বছরের ছেলে থেকে যাদের বয়স ৫০-৬০ পর্যন্ত, তারা সবাই ওই জায়গায় একত্র হন। চতুর্দিকে লোকজন গেল এবং বহু লোক জড়ো হলো। সমস্ত লোক বসালাম। বসার পর বলতেছি, দেখেন, আমরা কিন্তু খানসেনা নই, আমরা মুক্তিযোদ্ধা। আপনারা হয়তো সকলেই মুসলমান। ধরেন, আপনাদের গুলি করে মারা হবে। একদম সব চুপচাপ। তখন জনতার মধ্যে সবাই তো এক নয়। যারা সাহসী তারা তখন বলতেছে, ভাই, আপনারা আমাদের মারবেন, মারেন, কোনো দুঃখ নেই। তবে আমাদের যে মারবেন আমাদের অপরাধটা কী? আমি বলছি, হ্যাঁ, অপরাধ আপনাদের আছে। আপনাদের মধ্যে ১১ জন রাজাকার আছে, এই ১১ জন রাজাকারকে আমরা চিনি না। ১১ জন রাজাকারকে ধইরা দেন। আর যদি এদের বাইর কইরে না দেন, তাহলে আপনাদের সবাইকে মারব। আর এদের যদি ধইরা দেন, তাহলে আপনাদের মরতে হবে না, এ কথাগুলো আমাদের কমান্ডার বলল। তখন ওরা আর কথা বলে না। তখন এক লোক বলতেছে, কিরে, এত দিন তো বেশ মানুষের খাসিটাসি খাইছেন, এখন কেমন অবস্থা? তখন ওরা দাঁড়াল। ১১ জন দাঁড়াল। বললাম, আপনারা বাইর হয়ে আসেন। বাইর হয়ে আসল। আপনাদের হাতিয়ার? হাতিয়ার আমাদের বাড়িতে আছে। আমরা বাড়ি থেকে নিয়ে আসি। হবে না। আপনারা এইখানে আসেন। আর আপনার ভাই, বাবা কে আছে,

তাদের বলেন হাতিয়ার আনতে। তারা হাতিয়ার নিয়ে আসল। হাতিয়ার নিয়ে আসার পর ওই তিনজন, যে তিনজন মুক্তিফৌজ হওয়ার জন্য গেছিল, ওই তিনজনকে আমরা ক্যাম্পে পাঠিয়ে দিলাম। ক্যাম্পে যখন পাঠিয়ে দিলাম তখন সমস্ত হাতিয়ার জমা নিয়া ওদেরকে আমাদের দলে দিল।

যুদ্ধের শেষে আপনি গ্রামে ফিরলেন কবে?

● দেশ স্বাধীন হওয়ার আট-দশ দিন পর।

আপনি বাড়িতে ফিরে এলেন?

● বাড়িতে ফিরে আসলাম।

বাড়িতে ফিরে এসে আপনার এলাকার অবস্থা কী দেখলেন?

● বাড়িতে ফিরে আইসা এলাকার অবস্থা তো দেখছি। সব জায়গাতে খানসেনারা মানুষ মারছে বা আগুনটাগুন লাগায়ে দিছে।

চরাহাটে যে গণহত্যা হইছে বা লোকজন মারছে, এটা আপনি কোথায় শুনেছেন?

● এটা আমি ক্যাম্পে শুনিছি।

আপনার কী মনে হয়েছিল?

● এই সংবাদটা তো অন্য কেউ দিতে পারত না। দিয়েছিলেন আমাদের এমপি জলিল মোল্লা। আমাদের ক্যাম্পে উনি যান। পতিরাম ক্যাম্পে তখন আমরা ছিলাম। যাইয়া বলছেন যে, নওয়াবগঞ্জ-দিনাজপুর ডিস্ট্রিক্ট, নবাবগঞ্জ থানা বা পুঁটিমারা ইউনিয়নের কোনো ছেলে এই ক্যাম্পে আছে নাকি? তখন হাবিলদার মেজর বলছে, হ্যাঁ, আছে। বলছেন, ওদের একটু ডাকেন। আমাদের ডাকল। ডেকে নিয়ে কথাটা বললেন যে এরকম চরারহাট...আন্দরগ্রাম...মানে সাতটা পাড়ার কথা বলছিলেন। সেখানে দুইটা লোক বাঁইচে আছে। একজন হলো নওশাদ আরেকজন হলো মোহসীন চেয়ারম্যান। এ ছাড়া আর কোনো লোক নেই। সাত বছরের ওপরে যাদের বয়স তাদের সবাইকে মারিছে। এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে আমরা তো সবাই অজ্ঞান।

কত লোককে তারা হত্যা করেছে, আপনি কি শুনেছেন?

● আমি শুনছি ১১০ জন।

আপনার গ্রামে এসে আপনার এলাকার অবস্থা কী দেখলেন?

● বাড়ি নাই, ঘর নাই, মানুষ রাস্তায়।

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **ভবেন্দ্রনাথ বর্মণ**
নভেম্বর ০৮, ১৯৯৬

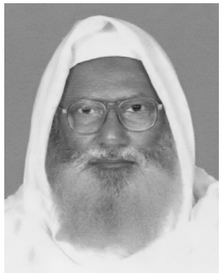

এস এম আব্বাস আলী

পিতা : মৃত এস এম আমানউল্লাহ, গ্রাম : বিশ্বনাথপুর, ডাক : আমবাড়ী-দৌলতপুর, থানা : চিরিরবন্দর, জেলা : দিনাজপুর, শিক্ষাগত যোগ্যতা : এসএসসি, ১৯৭১ সালে বয়স ৩৫ বছর, ১৯৭১ সালে স্বেচ্ছায় অবসর নেওয়া সৈনিক ছিলেন, বর্তমানে বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক।

১৯৭০-৭১ সালে আপনি কী করতেন?

● আমি তখন রাজনীতি করতাম। আওয়ামী লীগের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। এর আগে আমি পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে ছিলাম। ৩২ ক্যাভলরিতে। আমার পোস্টিং ছিল পাকিস্তানের শিয়ালকোটে। ওখানে থাকাকালে, ১৯৬৮ সালের শেষের দিকে, আমাদের বাঙালিদের মধ্যে গুঞ্জন শোনা গেল যে আমাদের কয়েকটি ইউনিটের বাঙালিদের পাকিস্তানিরা বন্দী করতেছে। শুনে আমার মনে ভয় ধরে গেল। তখন ওখান থেকে '৬৮-র ডিসেম্বরের দিকে আমরা সাত-আটজন বাঙালি ছেলে একসঙ্গে পালাইয়া আসি। প্রথমে শিয়ালকোট থেকে মোটরে চলে গেলাম লাহোরে। তারপর ভারতের ভেতর দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের ঘটনা শুনে আপনার কী মনে হয়েছিল?

● লোকমুখে এবং রেডিওতে শুনি যে খান বাহিনী ট্যাংক, গোলাবারুদ—সব নিয়ে আমার বাঙালি ভাইদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। পঁচিশে মার্চের রাত ছিল মর্মান্তিক। সে দিন ঢাকায় প্রতিটা বাড়িতে গিয়া হানাদার বাহিনী যেভাবে লোকজনকে হত্যা করতেছিল, তাতে আমার মনে হয়েছিল যে আর আমরা এই দেশে থাকতে পারব না। তখন আমাদের এখানে ইপিআরের এক মেজর [সম্ভবত হাবিলদার মেজর] হাবড়া থেকে একটা ইউনিট নিয়ে পালিয়ে আসেন। আইসা উনি আমাকে বললেন যে, আব্বাস, তুমি এই রোডের যতগুলো ব্রিজ এবং কালভার্ট আছে, সবগুলোতে

ব্যারিকেড দাও। তো আমি আওয়ামী লীগের সমর্থক ও আমার গ্রামের কয়েকজন ছেলেকে নিয়ে ব্যারিকেড দেওয়া শুরু করলাম। ব্যারিকেড দেওয়ার পরের দিন আবার দেখি ফুলবাড়ী থেকে ট্যাংক নিয়ে খান বাহিনী রাস্তার দুই পাশের ঘরবাড়ি জ্বালাও-পোড়াও কইরা আসতেছে। আমি সেটা দেখতে গেছিলাম রাজারামপুরে। এটা দেখে সেখান থাইকা আবার দৌড়াইয়া বাড়িতে চইলা আসি। আইসা দেখি, ছামাদ সাহেবের বাড়ির এইখানে আগুন জ্বলতেছে। তখন আমি বাড়িতে আইসা আমার মা, বাবা, আমার প্রতিবেশী সকলকে বললাম যে, তোমরা এখন ভেগে যাও।

১৯৭১ সালে আপনি কি পাকিস্তানি সেনাদের হাতে আক্রান্ত হয়েছিলেন?

- ১৯৭১ সালের প্রথম দিকে আমি আক্রান্ত হইনি। আমি আগেই চলে যাই ইন্ডিয়াতে। মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের পর আমি আক্রান্ত হয়েছিলাম।

আপনি তখন কীভাবে আক্রান্ত হলেন?

- কাটলা ক্যাম্পে আমি সুবেদার মেজর হিসাবে চার্জে ছিলাম। আমি তিন-চার হাজার ছেলেকে সেখানে ট্রেনিং দিয়ে হায়ার ট্রেনিংয়ের জন্য শিলিগুড়িতে পাঠাই। সেখানে পাঠানোর পর ওরা যখন ফিরে আসে, তখন আমাদের ক্যাম্পেই তারা আশ্রয় নেয় এবং বাংলাদেশের ভেতরে ঢোকে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, তাদের মধ্যে ৪০০-৫০০ ছেলে মারা যায়। শেষের দিকে আমি যখন সুন্দরপুরে, তখন ইন্ডিয়ার ফোর্স বাংলাদেশের ভিতরে গোলা মারতে শুরু করে। সেই দিন আমবাড়ী এলাকার ১১টি ছেলে ওই গোলার আঘাতে মারা যায়। আমি এটা ওইখান থেকে শুনতে পাই। তারপর ডিসেম্বরের ৯-১০ তারিখে আমি তাজপুরে আসি। সে সময় সেখান দিয়ে ভারতীয় ফোর্সের ক্যাপ্টেন এস এস বাথ সাহেব ট্যাংক বাহিনীর একটা ইউনিট নিয়ে বাংলাদেশের ভিতর ঢুকতেছিলেন। আমি তখন তাজপুরে তাঁর সাথে দেখা করতে যাই। এখানে তাঁর ইউনিটের এক ট্যাংকের ড্রাইভার মারা গেছিল। বাথ সাহেব আমাকে দেখে বললেন, তুমি তো ট্যাংকের ড্রাইভার, তোমাকে আমাদের সঙ্গে ট্যাংকে যাইতে হবে। আমি না যাওয়ার জন্য অনেক চেষ্টা করলাম। কারণ, আমি কাটলা ক্যাম্পের পুরাতন লোক ছিলাম। অনেক দিন ধরে এই ক্যাম্পে আছি। তার পরও বাধ্য হয়ে আমাকে ট্যাংক নিয়ে যাইতে হয়। এই ট্যাংক নিয়ে আমরা প্রথম আমবাড়ীতে আসি। সেখানে এসে আমবাড়ী হাইস্কুলের সায়েন্স রুম ট্যাংকের গোলায় উড়িয়ে দেওয়া হয়। ওখানে খানসেনাদের ঘাঁটি ছিল। তারপর আমরা এক রাত আমবাড়ী ওয়েট করি। পরের দিনই ওখান থেকে আমরা আবার স্টার্ট দিয়ে ফুলবাড়ীতে যাই। ফুলবাড়ী থেকে চরকাইতে ট্যাংকের বোম্বিং করা হয়। বোম্বিং করার পর আমরা চরকাই উপস্থিত হই। সেখান থেকে আমরা লালদীঘিতে যাই। লালদীঘি স্কুলের ভিতরে তখন খানসেনারা মিটিং করছিল। আমরা ওখানে দুটি

বাসগাড়ি দেখতে পাই। এই বাসগাড়ির ওপর যখন আমরা ট্যাংকের গোলা মারি, তখন ওটার ভিতর বহু গুলি, গোলাবারুদ ছিল। সেগুলো ফুটতে শুরু করল। তখন ওইখান থেকে ওরা ভেগে যায়। এক খানসেনাকে আমরা ধরি। ওই খানসেনাকে আমরা আমাদের সিও সাহেবের কাছে উপস্থিত করি। ওখান থেকে আমরা চলে যাই বগুড়ার মহাস্থানগড়ে। মহাস্থানগড় থেকে খানসেনাদের হটাতে পারিনি। মহাস্থানগড়ের আশপাশে তারা এমনভাবে বাংকার তৈরি করেছিল যে সেখান থেকে আমরা তাদের হটাতে পারিনি। ওখানে আমরা দুদিন ধরে গোলাগুলি করি। তারপর উড়োজাহাজ দিয়ে বোম্বিং করানো হয়। উড়োজাহাজের বোম যখন দু-চারটা পড়ল, তখন ওখান থেকে খানসেনারা সরে চলে গেল বগুড়া শহরের পাশে জামিল ফ্যাক্টরিতে। তখন আমরা সেখানেই একটা প্রাইমারি স্কুলে অবস্থান করি। এদিকে আমরা সিও সাহেবের কোনো খোঁজ পাচ্ছিলাম না। এ নিয়ে আমরা খুব ব্যতিব্যস্ত ছিলাম। এ সময় সিও সাহেব ওয়্যারলেস করে বললেন, আমি বগুড়া শহরের অপজিটে আছি। পুলিশ লাইনের ওই দিকে। তোমরা ওই দিক থেকে গোলাগুলি শুরু করো। আমরা গোলাগুলি শুরু করার পরই খানসেনারা সারেন্ডার করে। ১৬ ডিসেম্বর আমরা রেডিওতে শুনতে পাই ঢাকাতেও খানসেনারা সারেন্ডার করেছে। তখন বগুড়ার পাকিস্তানি সেনারাও সারেন্ডার করল। ১০৭১ জন খানসেনা এবং রাজাকার, আলবদর পুলিশ লাইনে একত্র করা হয়। এ সময় হঠাৎ আমাদের কাছে ওয়্যারলেস আসল যে রংপুর তখনো ক্যাপচার হয়নি। তখন আবার আমাদের ম্যুভ অর্ডার হয়ে গেল। আমরা চলে গেলাম রংপুরে। রংপুর ক্যাপচার করে ওখানকার খানসেনাদের আমরা কারমাইকেল কলেজে নিয়ে যাই। ওখান থেকে এক দিন পরই আমরা আবার বগুড়ায় চলে আসি। বগুড়ায় থাকি ১৮ দিন। এরপর বাড়িতে চলে আসি।

আপনি কোন জায়গায় আক্রান্ত হলেন—এ কথা তো বললেন না?

- ১৩ ডিসেম্বর, এ কথা বলতে ভুলে গেছিলাম। মহাস্থানগড়ের পাশে আটপুকুরি না কী যেন নাম, ঠিক এখন মনে নাই, ওই জায়গায় আমরা সব ট্যাংক রাত্রে একত্র করি। একত্র করার পর আমি ট্যাংক থেকে নেমে কাছাকাছি একটা বাড়িতে পানি খাওয়ার জন্য গেছিলাম। ওখান থেকে আসার সময় পাকিস্তানি বাহিনী আমাদের ওপর গুলি চালায়। রকেট বোমটোমও চালায়। এই সময়ে আমি ক্রল করে আমার ট্যাংকের কাছে যাওয়ার সময় আমার বাম ঊরুতে একটি গুলি লাগে। ওই গুলি খেয়েও আমি ক্রল করে আমার ট্যাংকের কাছে চলে যাই।

আপনি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেন কেন এবং কীভাবে অংশগ্রহণ করলেন?

- যুদ্ধের শুরুতে আমি ইন্ডিয়ায় বসন্তী গ্রামে ছিলাম। তখনো আমি মুক্তিযোদ্ধা নই। সেখানে একদিন দেখি ইন্ডিয়ান এক সুবেদার মেজর, তাঁর নাম শরণ সিং,

কয়েকজন ছেলেকে গালাগালি করছেন। কতকগুলো ছেলে খানসেনাদের মারার জন্য গেছিল। না মারতে পেরে তারা ফিরে আসে। শরণ সিং ওখানে খাড়ায়া ছিলেন। আমিও তাঁর পিছনে ছিলাম। উনি আমাদের বাঙালি ছেলেদের গালাগালি করতেছিলেন। আমি তখন তাঁকে বলি, গালাগালি করতেছেন কেন, কী ব্যাপার? ক্যায়া হুয়া, কিস লিয়ে উস লোককো বাকোয়াস করতা হ্যায়! তখন উনি বললেন, ওধার মে দু-চার খান হ্যায়, ইয়ে উনিশ আদমি উছকা নাহি মারনা পারা। ক্যায়া বাত হ্যায়! তখন আমি তাঁকে বললাম, ঠিক হ্যায়, কেয়া হুয়া, হাম দেখলেঙ্গে। উনি আমাকে তখন হুকুম দিলে আমি ওদের নিয়া তাজপুরের পশ্চিম পাশে আসলাম। সেখানে আট কি নয়জন খানসেনা ছিল। উনি আমাকে এলএমজি এবং ১৯ জন ছেলেকে সাথে দিয়ে তাজপুরে যাইতে বললেন। আর ওইখান থেকে আমাদের ফায়ার করতে বললেন। এই ছেলেদের মধ্যে কয়েকজন ইপিআর ছিল। এই হুকুম দেওয়ার পর আমি ছেলেদের নিয়ে ওইখানে পজিশন নিয়ে গোলাগুলি শুরু করি। আমরা ওইখানে তিন খানসেনাকে মারি। খানসেনারা এরপর ওয়্যারলেসে দিনাজপুরকে জানায়। তখন দিনাজপুর থেকে ট্রাকে ট্রাকে খানসেনাদর ফোর্স আসতে শুরু করে। আমরা ২০ জন মুক্তিযোদ্ধা। চারদিক থেকে খানসেনারা আমাদের ঘিরে ফেলে। উপায় না দেখে আমি উইথড্রোল ফায়ার করি। এই ফায়ার দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুবেদার মেজর শরণ সিং এলএমজি ফায়ার শুরু করে। পাকিস্তানিরাও ওই এলএমজি ফায়ার লক্ষ্য করে ফায়ার শুরু করে। আমরা পিছন দিক দিয়ে পালিয়ে যাই। ওখানে পাশেই দিঘির পাড়ে একটা তালের গাছ লক্ষ্য করে শরণ সিং ফায়ার করতে থাকেন। পরে আমরা সবাই উনার কাছে যাই। ইপিআরের একজন হাবিলদার ছিলেন আমাদের সঙ্গে, উনি ওখানে যুদ্ধে মারা যান। তাঁর নাম আমার স্মরণ নাই। আমি সে সময় নতুন ওখানে। আরেকটা ছেলে ওখানে মারা যায়। দুজন মুক্তিযোদ্ধা ওখানে মারা যায়। এরপর আমার ফ্যামিলিকে খোঁজার জন্য আমি গ্রামের দিকে চলে গেলাম।

গ্রামে ফিরে যাওয়ার পর আপনি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেন কখন?

- পরের দিন আমি বাড়ির পাশে বাজারে ছিলাম। মোল্লাদীঘির হাটে। তখন ফজলু (পরে বিডিআরের মহাপরিচালক হন) এবং ফুলবাড়ীর নওয়াব ওইখানে আমার সঙ্গে দেখা করেন। তাঁরা বললেন, আব্বাস ভাই, আপনি কালকে তো এখানে যুদ্ধ করেছেন। আপনাকে রহিম সাহেব দাঙ্গারহাটে দেখা করতে বলেছেন। আমি পরের দিনই রহিম সাহেবের কাছে যাই। রহিম সাহেব আমাকে বললেন, আমি এখানে অনেকগুলো ছেলেকে মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে ভর্তি করছি। কিন্তু এদের চালানোর মতো কোনো লোক আমি পাচ্ছি না। ফজলু নতুন, নওয়াবও নতুন।

তুমি একজন পুরাতন সৈনিক। তোমাকে এদের দায়িত্ব নিতে হবে। তখন আমি দুই ট্রাক মাল-সামান নিয়ে দাঙ্গারহাটের পশ্চিমে কাটলা নামের এক জায়গার এক বাগানে ক্যাম্প তৈরি করি। প্রথম দিন আমি ২৮টা টেন্ট টানানোর পর বাড়িতে আসি। পরের দিন ৬০০ ছেলেকে ওই ক্যাম্পে ভর্তি করি। ওই দিন থেকেই আমি মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করি।

কাটলা ক্যাম্পে আপনি কোন দায়িত্বে ছিলেন?

- আমি সুবেদার মেজর হিসাবে কাজ করেছি।

এবং নতুন ছেলেদের ট্রেনিং দিয়েছেন। আপনি কতজন ছেলেকে সেখানে ট্রেনিং দিয়েছেন?

- আমি তিন হাজার কি সাড়ে তিন হাজার ছেলেকে ট্রেনিং দিছিলাম।

আপনার এলাকায় পাকিস্তানিরা কখন আক্রমণ করে।

- পাকিস্তানিরা আক্রমণ করে এপ্রিলের প্রথম কি দ্বিতীয় সপ্তাহে হবে।

পাকিস্তানি বাহিনী আপনার এলাকায় কীভাবে আক্রমণ চালাল?

- পার্বতীপুর থেকে বিহারিদের সঙ্গে নিয়ে এরা গ্রামে গ্রামে হামলা করল। গ্রামের মা-বোনদের ইজ্জত নষ্ট করল এবং যুবক যুবক ছেলেগুলোকে হত্যা করল। যেখানে-সেখানে তারা হত্যা এবং অত্যাচার শুরু করল। ফুলবাড়ীতে দেখলাম ওইদিক থেকে ট্যাংক বা সাঁজোয়া গাড়ি নিয়ে আমাদের বাড়ির পাশে যে রোড আছে, সেই রোডের দুই পাশের লোকদের হত্যা করছে। আগুন দিয়ে জ্বালাও-পোড়াও করা তাদের অভ্যাস ছিল।

পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর আক্রমণে আপনার পরিবারের কেউ কি শহীদ হয়েছে?

- আমার পরিবারের একজন শহীদ হয়েছে। আমি যে দিন ইন্ডিয়াতে যাই, এইটা এপ্রিলের ২০ তারিখ হবে বোধ হয়, আমার সঠিক মনে নাই, ওই তারিখে আমার চাচাতো এক বোন খানসেনাদের গুলিতে মারা যায়।

আপনার এলাকায় কখন থেকে মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা শুরু হয়?

- আমি ক্যাম্পে যাওয়ার পর আমাদের এখানকার ছেলেরা ট্রেনিংয়ে যায়। এর আগেও কতকগুলো ছেলে পতিরাম ক্যাম্পে ভর্তি হয়েছিল। তারাও এসে তৎপরতা শুরু করে। মে বা জুনের দিকে মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতা শুরু হয়?

আপনি কাটলা ক্যাম্পের সুবেদার মেজর ছিলেন এবং মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং দিতেন। আপনি প্রথম কোন দিন বা কখন সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেন?

- ডিসেম্বরের ৯-১০ তারিখে, আগে যে কথা বলেছি। আমি ক্যাম্প থেকে আইছিলাম তাজপুরে। সেখানে আসার পর মুক্তিযোদ্ধারা কে কোথায় আছে, সেটা দেখার জন্য আমার ওপর অর্ডার হলো। আমি সেই দিন ছিলাম তাজপুর এবং তাজপুরের বসন্তী এলাকায়। আমি দেখি ভারতীয় ট্যাংক বাহিনী তাজপুরের ওই স্থান দিয়ে যাচ্ছে। ওদের দেখে আমিও সেখানে গেলাম। সেখানে যাওয়ার পর ক্যাপ্টেন সাহেবের অনুরোধে ওই দিন থেকে আমি ট্যাংকে

যোগদান করি। তাদের একজন ট্যাংক ড্রাইভার মারা গেছিল। সে জন্য ওই ইন্ডিয়ান ট্যাংকে আমাকে নেওয়া হয়। ওই ইন্ডিয়ান ট্যাংক বাহিনীর সাথে আমি যুদ্ধে চলে যাই।

এরপর ওই মুক্তিযোদ্ধা ট্রেনিং ক্যাম্পে আপনি আর ফিরে আসেননি?

- আমি আবার গেছিলাম, দেশ স্বাধীন হওয়ার ১৮ দিন পর আমি বাড়িতে ফিরে আসি। আবার আমি ওই ক্যাম্পে যাই। আমি টেন্ট, হান্ডি এবং কতকগুলো বাসনপত্র আমার চার্জে নিয়ে আসি। তখন ক্যাম্পের ডেপুটি কমান্ডার, তিনি ছিলেন একজন ক্যাপ্টেন, উনি বললেন, ভাই, আপনি যেখান থেকে এই মাল-সামানগুলো নিয়া আসছেন, এইগুলো সেখানে পৌঁছে দেন। তখন আমি ফুলবাড়ীতে ওই সামানগুলো পৌঁছে দিয়ে আসি। সামান পৌঁছে দেওয়ার পর আবার ক্যাম্পে ঘুরে আসি। ওখান থেকে আইসা ছেলেদের সার্টিফিকেট দেই। দেওয়ার পরে আমার কাছে তখনো কিছু মাল-সামান ছিল, সেগুলো এবং বাকি সামানগুলো আমি নওয়াব সাহেবের হাতে দেই। সেগুলো উনি নিয়ে যান। এরপর বাড়িতে আসি।

আপনার গ্রাম বা এলাকায় রাজাকার কারা ছিল?

- রাজাকার তো ম্যালা ছিল। তারা পিস কমিটির মেম্বার, চেয়ারম্যান, সেক্রেটারি হয়েছিল এখান থেকে। এখানে এমাজ শাহ পিস কমিটির মেম্বার ছিল। এইখানে হারিস খানদের পাকসাক করত। এরাও ছিল রাজাকার। মফিজ ছিল। আর পিস কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন ধন্দু মৌলভি। আর একজন ছিল, বাসুপাড়ার এক হাজি। তার নাম আমার স্মরণে নাই। সে এখনো বেঁচে আছে। আর ব্রহ্মপুরের মনসুর, মনসুর আলী শাহ ছিল। আর কেশবপুরের এক হাজি ছিল। আমার আশপাশে বালুপাড়া, দৌলতপুরে অনেকগুলো রাজাকার ছিল।

শান্তি কমিটিতে কারা ছিলেন?

- শান্তি কমিটিতে অনেক লোক ছিল। রাজাকারও ছিল। আলবদরও ছিল।

তারা এখন কোথায়?

- তারা বর্তমানে বাড়িতেই আছে।

আপনার এলাকায় আলবদর, আলশামস কারা ছিল?

- আলবদর, আলশামস ছিল মোহনপুরের সাত্তার। সাত্তার, গাফফার এরা দুই ভাই এখানে ছিল আলবদর। সাত্তারের কোনো খোঁজখবর এখন পর্যন্ত নাই। কোথায় যে সে গেছে, তার আত্মীয়রাও বলতে পারবে না। গাফফার বাড়িতেই আছে।

এ সকল স্বাধীনতাবিরোধীকে ধরা হয়েছিল কি?

- না, এই স্বাধীনতাবিরোধীদের কাউকে ধরা হয়নি। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও তারা পালিয়ে বেড়াইছে। পালিয়ে থাকায় তাদের আর ধরা হয়নি।

যুদ্ধকালের কোনো স্মরণীয় ঘটনা জানা থাকলে বলুন?

- হঠাৎ আমার কাছে একবার সংবাদ গেল যে উচিতপুরে বহু শরণার্থীকে আটক করা হয়েছে। ওরা গরুর গাড়িতে আসতেছিল। গাড়ি, গরু এগুলো সব লুটতরাজ করে আগুন লাগাই দিছে। যারা সংবাদ দিল তারা বলল, আপনারা যদি কোনো সাহায্য করতে পারেন, তাহলে যেতে পারেন। তখন আমি ১০-১২ জন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে উচিতপুরে রওনা দেই। উচিতপুরে যখন আইসা পৌঁছাই তখন দেখি খানসেনারা গরুর গাড়িতে যে আগুন জ্বালিয়ে দিছিল, সেই আগুন প্রায় শেষ হয়ে গেছে। খানসেনারা অনেক লোককে গুলি করেছে। অনেক লোক ওখানে মারা গেছে। আর কতকগুলো লোককে খানসেনারা ধরে নিয়ে গেছে। আর একটা শিশু ওখানে মা মা করে কান্নাকাটি করতেছে। সে যে কার শিশু, আমরা বলতে পারি না। তখন আমরা চতুর্দিকে ফায়ারটায়ার করি, কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। তখন আমরা এই কান্নাজড়িত শিশুটাকে কোলে করে নিয়ে গেলাম ইন্ডিয়ায়। সেখানে পরে ওর মাকে খুঁজে বের করে তার কোলে দিয়ে দিছি।

খানসেনারা সে দিন সেখানে কতজন লোককে মেরেছে?

- ওখানে অন্তত ৪০-৫০ জন লোককে খানসেনারা মারছিল। লাশগুলো ওখানেই পড়েছিল। ওখান থেকে লাশ কেউ নেয়নি। বহু দূর-দূরান্ত থেকে এসব শরণার্থী আসছিল ইন্ডিয়া যাওয়ার জন্য। ওই শিশুর কান্না আজও আমার হৃদয়ে ভাসতেছে। আর একটি স্মরণীয় ঘটনা মনে হচ্ছে, আমরা যে দিন প্রথম যাই ত্রিশূলা ক্যাম্প দখল করার জন্য, সে দিন সেখানে গিয়ে দেখি খানদের একটা বাংকারের মধ্যে চারটি মেয়ে। তাদের বুকে শুধু বডিস এবং পরনে ল্যাংগট ছিল। এ ছাড়া কিছুই ছিল না। তাদের মুখ শরীর আঁচড়ানো, ছিঁড়ে তছনছ করা। সেই চারটি মেয়েকে আমরা সে দিন অত্যাচারী খানসেনাদের হাত থেকে উদ্ধার করে নিয়ে তাদের বাড়িতে পৌঁছে দেই।

সে দিন কি খানসেনাদের সাথে আপনাদের যুদ্ধ হয়েছিল?

- হ্যাঁ, সে দিন আমরা সেখানে প্রথম ট্যাংকের গোলা ছুড়ি এবং গোলাগুলি করি। ওরাও উত্তর দেয়। আমরাও তাদের ওপর প্রচুর গোলাবারুদ চালাই। তারপর ওরা পিছু হটে এবং ওদের বাংকার পড়ে থাকে। সেই বাংকারে গিয়ে আমরা ওই চারটি মেয়েকে পেয়েছিলাম।

আমরা তো জানি যে হিলিতে সবচেয়ে বড় যুদ্ধ হয়েছিল। সে যুদ্ধ সম্পর্কে আপনি কি কিছু জানেন বা সেখানে কি আপনি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন?

- আমি সেই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিনি। কিন্তু আমার ক্যাম্পের বহু মুক্তিযোদ্ধা হিলিতে এক দিনের এক যুদ্ধে মারা গেছিল। আমার ক্যাম্পের মুক্তিযোদ্ধা

ভাইয়েরা সে দিন বালুরহাটে গিয়েছিল। খাওয়াদাওয়ার পর ছেলেরা সন্ধ্যার সময় চলে গেল বালুরহাটে। অন্তত ২০০ ছেলে গেছিল। সেখানকার ইন্ডিয়ান আর্মিকে বলেই গেছিল। ইন্ডিয়ান আর্মি এক মেজরের নির্দেশে তাদের হিলিতে নিয়ে যায়। নিয়ে গিয়ে তাদের ওখানে হাতিয়ার দেয়। তাদের হাতিয়ার দেয় খানসেনাদের সঙ্গে লড়াই করার জন্য এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সাহস দিয়ে বলে, এটা খুব ছোট কাজ। তাদের উৎসাহে ওরা মনে করে যে আমাদের জন্য সত্যিই ছোট একটা কাজ! ঠিক আছে আমরা যাব। তারপর তারা হিলিতে যায়। একটি ছেলেও সেখান থেকে ফিরে আসেনি। আমার সব ছেলে মারা গিয়েছিল। ২০০ ছেলের একটি ছেলেকেও আমি ফেরত পাইনি। সব ছেলে সে দিন হিলিতে মারা যায়।

যুদ্ধ চলাকালে আপনি তো সুবেদার মেজর হিসেবে ভারতীয় সেনাদের সঙ্গে ছিলেন, আপনার জানামতে, কতজন ভারতীয় সেনা মারা গেছে। এ সম্পর্কে আপনি কতটুকু বলতে পারেন?

- আমার জানামতে, বগুড়ার মহাস্থানগড়ের ওইখানে ভারতীয় সৈন্য যারা গুর্খা, তারা ১০০ থেকে ১৫০ জনের বেশি মারা গেছে।

ভারতীয় সৈন্য কীভাবে মারা গেল?

- ওখানে আমরা দুই পক্ষ গোলাগুলি শুরু করেছি। খানসেনারাও গোলাগুলি করতেছে। আমরাও গোলাগুলি করতেছি। আমাদের সামনে যারা পদাতিক বাহিনী ছিল, তারা সব গুর্খা সৈন্য। আর আমরা ট্যাংক বাহিনী পিছনে ছিলাম। আমাদের পিছনে ছিল মর্টার গান। যারা অ্যাডভান্স পার্টি, অ্যাডভান্স পার্টিতে সবচেয়ে বেশি ছিল গুর্খারা। এই গুর্খারা সবচেয়ে বেশি মারা যায় ওখানে।

যুদ্ধের শেষে গ্রামে ফিরে আপনার এলাকার অবস্থা কী দেখলেন?

- যুদ্ধের শেষে আমি যখন বাড়িতে আসি তখন এলাকায় বাড়ি বলতে ছিল না। খানসেনারা আগুন দিয়ে সব জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে শেষ করে দিছিল। স্কুল, কলেজ সব ভেঙে চুরমার। পুল-কালভার্ট যা ছিল, সম্পূর্ণ ভাঙা ছিল। তখন খেতখামারে কেউ চাষ করতে পারেনি। সে সময় তো আমরা সবাই ইন্ডিয়াতে চলে গেছিলাম। এদিকে যারা ছিল হয়তো সামান্য কিছু খেতখামারে চাষ করছে। এই অবস্থায় আমি আমার গ্রামে আসি।

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **ভবেন্দ্রনাথ বর্মণ**
অক্টোবর ১৬, ১৯৯৬

নজরুল ইসলাম

পিতা : খোদাবক্স মণ্ডল, গ্রাম : কল্যাণপুর, ডাক : বিরামপুর
ইউনিয়ন : পূর্ব জগন্নাথপুর, থানা : বিরামপুর, জেলা : দিনাজপুর, শিক্ষাগত যোগ্যতা : পঞ্চম শ্রেণী, ১৯৭১ সালে বয়স ২৪-২৫ বছর, ১৯৭১ সালে সেনাসদস্য ছিলেন, বর্তমানে অবসর জীবন যাপন করছেন।

১৯৭১ সালের মার্চ মাসের ঘটনাবলি সম্পর্কে আপনি কী জানেন?

- মার্চ মাসে সৈয়দপুর এলাকায় পাকিস্তানি সেনা এবং বিহারিরা বাঙালিদের ওপর ব্যাপকভাবে আক্রমণ শুরু করে। আমরা থার্ড বেঙ্গলের সৈনিক-অফিসাররাও আক্রমণের শিকার হলাম। ফুলবাড়ীতে একটা লড়াই হয় ব্রিজের ওখানে। তার কয়েক দিন পর আমরা সৈয়দপুর অ্যাটাক করলাম। সেখানে দুই দিন আমরা অ্যাটাক করেছি। এক দিন রেস্টে থাকলাম। পরের দিন মেজর নিজামউদ্দিন বললেন যে হাবড়ায় আমরা যে মার খেলাম, তার প্রতিকার দরকার। থার্ড বেঙ্গল রেজিমেন্টের আইয়ুব হাবিলদার ছিলেন। উনার টুআইসি ছিলাম আমি। মুজাহিদ ছিল বোরহান সাহেব, আরেক আনসার ছেলে ছিল হিলির।

আপনারা মোট কতজন বেঙ্গল রেজিমেন্টের ছিলেন?

- বেঙ্গল রেজিমেন্ট তো ভাগাভাগি হইছিল। আমাদের কাছে খুব বেশি ছিল না, ৫০-৬০ জন হবে। ইপিআর ছিল, থানা পুলিশ, আনসার, মুজাহিদ ছিল। আমরা রিজার্ভ ছিলাম। আমরা চারজন পাকিস্তানিদের ঘেরাওয়ের ভিতর পড়ে গেছিলাম।

পাকিস্তানি সৈন্য কতজন ছিল?

- আমার ধারণা, ওরা দুই-আড়াই শ জন ছিল।

দুই-আড়াই শ জন ছিল?

- হ্যাঁ। আমাদের হাবড়াতে ঘিরে ফেলেছিল। আনসার, মুজাহিদ শ খানেকের মতো মারা গেছিল। দুইটা গাড়ি শেষ।

পাকিস্তানি সেনা কতজন মারা গেছে বলে আপনার ধারণা?

● পাকিস্তানি ফোর্স ওখানে কম মারা গেছে।

হাবড়া যুদ্ধ শেষ করে আপনারা কোথায় গেলেন?

● যখন আমরা ওখানে ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়ে গেছিলাম, তখন ওখান থেকে ক্রল করে লাশের ঠ্যাং ধরে সরায়ে দিয়ে আমরা আল্লার নাম নিয়ে চলেছি। হাবিলদার আইয়ুব আমাকে বলেছিল, নজরুল, যদি আল্লায় আমাদের হায়াত রাখে তো আমরা বাঁচব। তুমি আমার পিছে আসো। তহন ওখান থেকে চারজন ক্রল করে, পশ্চিমে একটা মরা নদী আছে, সেই নদীতে গিয়ে পড়ে গেলাম। নদীতে পড়ে, সে নদীর ধার ধরে যেতে যেতে একটা জঙ্গল পেলাম। সেই জঙ্গলে উঠে ওখান থেকে ডবল মার্চ করে চলে আসলাম ফুলবাড়ী। আইসা দেখি যে, লোক নেই। কেউ কেউ ডিফেন্স নিয়ে বসে আছে। আর ফুলবাড়ীতে একটা হইচই পড়ে গেছে যে আমাদের চারটা লোক পাকিস্তানি সেনাদের হাতে ধরা পড়ে গেছে।

তার পরে কোথায় অ্যাটাক করলেন?

● ফুলবাড়ী আসলাম। সেখানে আইসে ওখান থেকে আমাদের ৬৫ জনকে পাঠাল চরকাই। মেজর নিজামউদ্দীন বললেন যে, বেলা চারটার সময় বোম্বিং হবে বাগানে। নদীর ওপর যে বাগান আছে, সেই বাগানে বোম্বিং হতে পারে। মেজর নিজামউদ্দীন ওখান থেকে ব্যাটালিয়নকে পিছনে ব্যাক করাইল।

চরকাই আসল?

● চরকাই দুর্গাপুর আসলাম। এখানে আসার পর বেলা চারটার সময় বোম্বিং হয়ে গেল।

বোম্বিং কে শুরু করল?

● পাকিস্তানি সেনারা। ওখানে বোম্বিং যহন হয়ে গেল, তহন আমাদের দলের এরা সন্ধান নিল যে কী ব্যাপার? মেজর নিজাম খবর জানলেন কী করে? সন্ধান নিয়ে ধরা পড়ল, মেজর নিজামউদ্দীনের সাথে খানসেনাদের যোগাযোগ আছে। উনার পাঞ্জাবি বউ, উনার বালবাচ্চা আছে। ওয়্যারলেসে তাদের সঙ্গে কথা বলতেছেন তিনি। এই জন্য আমাদের লড়াইয়ে তিনি মন দিচ্ছেন না বা আমাদের আগে-পিছে করাচ্ছে। আমাদের ব্যাটালিয়নের ক্ষতি করতেছে।

মেজর নিজামউদ্দীন তাহলে পাকিস্তানিদের পক্ষে ছিল?

● পাকিস্তান পক্ষের মানে, দুই দিকে ছিল। দুই দিকেই ছিল তহন মেজর নিজামউদ্দীন। বিরামপুর ধরা পড়েন তিনি। মেজর নিজামউদ্দীনকে তার পরের দিন সকালে এখানে শ্যুট করে মারে, এই পল্লবী সিনেমা হলের সামনে।

তাকে গুলি করে আপনারা মাইরে দেন?

● না না, আমাদের লোক মারল। তারপরে এইখান থেকে আমাদের পাঠাল

বাগডুবি ডিফেন্সে। বাগডুবির ডিফেন্সে এক রাত থাইকে ওখান থেকে আবার অ্যাডভান্স করি। ওখানে ফায়ারিংয়ে থার্ড বেঙ্গলে ছিল রিয়াজ, সিরাজুল। আরও কয়েকজন ছিল, নামগুলান ভুলে গেছি। কিন্তু তাদের চায়না ব্রেনগান বা একজনের একটা মেশিনগান ছিল। চায়না মেশিনগানে একসঙ্গে আড়াই শ রাউন্ড গুলি যায়। আর চায়না ব্রেনগানে যায় ১০০ রাউন্ড। পাকিস্তানিরা যেই আমাদের ডিফেন্সে ঢুকেছে, তহন মেশিনগান ফায়ার দিয়ে ওদের ২৫-৩০ জনকে ফেলে দিল আমাদের গানম্যানরা।

পড়ে যাওয়ার পর তহন ওরা আর সামনে অ্যাডভান্স করতে পারল না। ওরা পিছে চলে গেল। পরের দিন বেলা আটটা-নয়টার সময় শহীদুল্লাহ সুবেদার সাব আমাদের বলল যে, তোমাদের ৬৫ জন হিলিতে চইলা গেছে। তোমাদেরও হিলিতে যেতে হবে। তহন আমরা ওখান থেকে পাঁচ-ছয় জন হিলিতে চলে যাই। হিলিতে ব্যাক করার পর ওখান থেকে আমাদের ভারতে নিয়ে গেল।

হাবড়ার আগেই কি আপনারা পার্বতীপুরে, সৈয়দপুরে অ্যাটাক করছেন?

● অ্যাটাক করছি ফার্স্ট ওই ফুলবাড়ীতে। তারপর বর্ডার সৈয়দপুরে।

ফুলবাড়ীতে কীভাবে অ্যাটাক হলো?

● পাকিস্তানি সেনা কিছু ভাইগা আসছিল। মোহনপুরের দিক থেকে আসছিল। ইটার ভাটার ওখানে ডিফেন্স করছিল। ব্রিজ ভাঙা ছিল উত্তর পাশে, ওখানে তারা ডিফেন্স করছিল। ওখানেই ওদের সঙ্গে আমাদের ফায়ারিং হয়। এখানে নিষিদ্ধপল্লির মেয়েরা আমাদের ধামা ধামা চালভাজা, মুড়ি, কলসি ভরা পানি দিয়ে জীবন বাঁচাইছে। এই মেয়েদের কথা আমরা ভুলব না। তারপরে সৈয়দপুর অ্যাটাক করলাম।

সৈয়দপুর কীভাবে অ্যাটাক করলেন?

● সৈয়দপুর আমরা দক্ষিণ ও পশ্চিম দিক থেকে অ্যাটাক করলাম।

আপনারা এখানে কতজন বেঙ্গল রেজিমেন্টের সদস্য ছিলেন?

● আমরা ওখানে সুন্দরবন কোম্পানি, ইপিআর এবং আমাদের বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈন্য নিয়ে না হলেও দুই শ-আড়াই শ ছিলাম।

তো কীভাবে অ্যাটাক করলেন?

● ওখানে গিয়ে আমরা প্রথম ফায়ারিং দিছিলাম, আর্টিলারি ফায়ারিং। সিক্স পাউন্ডার আর্টিলারি ফায়ারিং দিছিল আমাদের অফিসার।

ফায়ারিং দেওয়ার পরে কী হলো?

● আমাদের সঙ্গে পাকিস্তানিদের ফায়ারিং আরম্ভ হয়ে গেল। দুই দিন ওখানে সংঘর্ষ চলে। দুই দিনের পর এক দিন রেস্টে থাকলাম। তারপর ফুলবাড়ীতে বোম্বিং হওয়ার আগেই আমাদের চরকাই ব্যাক করাল।

পার্বতীপুরে পাকিস্তানি সেনাদের সাথে আপনাদের যুদ্ধ হয়নি?

- পার্বতীপুরে আমাদের সঙ্গে পাকিস্তানি সেনাদের যুদ্ধ হয়নি। কিন্তু বিহারিগুলোর সঙ্গে হইছিল। তারপর ডিফেন্স থেকে আমাদের হিলিতে ব্যাক করাল। হিলি থেকে ভারতে। সেখান থেকে আমাদের একদম নিয়ে গেল রাধিকাপুর। সেখান থেকে পাঁচপাড়া। পাঁচপাড়া থেকে কিশোরগঞ্জ।

বাঙালি-বিহারি সংঘর্ষ সম্পর্কে আপনি কী জানেন?

- আমাদের এলাকায় বিহারিরা বাঙালিদের মারতে আরম্ভ করল। মারামারি আরম্ভ হয়ে গেল। তখন হাতাহাতি সংঘর্ষ আরম্ভ হয়। বাঙালিদের হাতে যেসব অস্ত্র ছিল, আর বিহারিদের কাছে যে অস্ত্র ছিল, তাই নিয়ে হাতাহাতি সংঘর্ষ শুরু হয়। সৈয়দপুর থেকে যে থার্ড বেঙ্গল রেজিমেন্ট বাহির হইছিল, তারাও এই সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে।

আপনি মুক্তিযুদ্ধে কেন অংশগ্রহণ করলেন?

- আমি আওয়ামী লীগের সাপোর্টার আর তা ছাড়া অন্য কোনো পথও ছিল না। কোনো বিকল্প পথ না থাকার জন্য আমাদের দলের প্রত্যেকেই মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করলাম।

আপনার এলাকায় কখন থেকে পাকিস্তানিরা আক্রমণ শুরু করল?

- পাকিস্তানিরা মারামারি করতে করতে আস্তে আস্তে সৈয়দপুরে চলেই আসল। পরে সৈয়দপুর থেকে পার্বতীপুরে আইসে অ্যাটাক কইরে আবার পার্বতীপুর ক্যাপচার করে নিল। পার্বতীপুর থেকে আমাদের ফুলবাড়ী। তারপরে চরকাই চলে আসল। তখন আমরা হিলি দিয়ে রাধিকাপুর, সেখান থেকে পাঁচপাড়া। পাঁচপাড়া গিয়ে এক দিন থাইকে ওখান থেকে আমাদের কিশোরগঞ্জ পাঠাল। কিশোরগঞ্জ যাইয়া ওখান থেকে আমাদের বিরলে পাঠাইল। বিরলে অ্যাডভান্স করে যাইতে আমাদের একজন মারা গেল।

পাকিস্তানিরা কীভাবে আক্রমণ করল আপনাদের?

- ওরা আগে বিহারিদের অ্যাডভান্স করাত।

কীভাবে সেটা?

- ওরা আগে বিহারিদের অ্যাডভান্স করাত। আর ওরা আর্টিলারি ফায়ারিংটা দিত।

পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী আপনার এলাকায় আর কী কী করল?

- আমি তো আর এখানে ছিলাম না, তাই কিছু দেখিনি। আমি তো আড়াই মাস-তিন মাস ভাই, মা-বোনদের কারও মুখ দেখতে পাই নাই। কাজেই এলাকার কথা বলতে পারব না।

আপনার এলাকায় মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা কখন থেকে শুরু হয়?

- মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা শুরু হয় জ্যৈষ্ঠ মাস থেকে।

আপনাদের বিরোধিতা কারা করেছে?

- ওই জামায়াতে ইসলামীরা। এই এলাকার মা-বোনদের ক্ষতি করিছে মোটর মিয়া আর ফজলা। এই দুইটাই কিন্তু আমাদের এলাকার বেশি ক্ষতি করছে।

আপনার এলাকার রাজাকার, আলবদর, আলশামস কারা ছিল?

- আলবদর, রাজাকার এলাকার ভিতর ছিল। ফজলা আর তার ছেলে তরমুজ মিয়া ছিল। আলবদর, রাজাকার ছিল অনেকগুলান। কিন্তু সবার নাম আমার খেয়াল নাই।

যুদ্ধ চলাকালে বা দেশ স্বাধীন হওয়ার পর কি তাদের ধরা হয়েছিল?

- ধরা হয়েছিল। অনেকে মারা গেছে। আবার অনেকে বেঁচেও আছে।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে আপনি বাংলাদেশের কোন এলাকায় যুদ্ধ করেছেন?

- বাংলাদেশের বালুপাড়ায় বড় লড়াই হইছে। আমবাড়ীর ওপাশে, ওখানে হইছে লড়াই। তার পরে আমাদের রামসাগর, প্রাণসাগর—ওখানেও হইছে। তারপর আমাদের শিলিগুড়ি পাঠাল। তিন দিন শিলিগুড়ি থাকার পর ওখান থেকে আমাদের এক্সপ্লোসিভ দিয়ে আবার পাঠাল বাংলাদেশে।

কোন এলাকায় সেটা?

- কামারপাড়া।

কামারপাড়া থেকে বাংলাদেশের কোন এলাকায় এলেন?

- কামারপাড়ার ত্রিমোহনী এলাকায় প্রথম আসলাম।

তারপর আপনি কোথায় যুদ্ধ করলেন?

- তারপরে ওখান থেকে চলে গেলাম খানপুর বর্ডারে। ওখানে আমার অফিসার ছিল লেফটেন্যান্ট আউয়াল চৌধুরী। খানপুর বর্ডারে লড়াই হলো। ওখানে যুদ্ধে লেফটেন্যান্ট আউয়াল চৌধুরীর পায়ে গুলি লাগে। অনেকগুলান মুক্তিযোদ্ধা ভাইগে গেল। ওখান থেকে আমরা গেলাম হিলি সেক্টরে। হিলি সেক্টরে গিয়ে লে. আউয়াল চৌধুরীর ট্রিটমেন্ট করা হলো। এরপর কামারপাড়া থেকে অপারেশন ক্যাম্প তরঙ্গপুর নিয়ে যাওয়া হলো।

খানপুরে কতজন মুক্তিযোদ্ধা ছিল?

- ওখানে একটা প্লাটুন, মানে ৩০-৩৫ জন ছিল।

আপনাদের কতজন আহত এবং নিহত হইছে?

- ওই যুদ্ধে কেউ নিহত হয় নাই। তবে লেফটেন্যান্ট সাহেবের পায়ে গুলি লাগছে। পরে তাজুলে লড়াই হইছে। চিন্তামনের লড়াইয়ে আমাদের দুইটা ছেলে মারা গেছে।

পাকিস্তানি সৈন্য মারা গেছে?

- না, তারা মারা যায় নাই। তাজুলে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের কোনো ক্ষতি হয়নি বা পাকিস্তানি সেনাদের কোনো ক্ষতি হয়নি। সামান্য লড়াই। আটপুকুর হাটে

চারজন পাকিস্তানি সেনা মারা গেছে। রউফ ওস্তাদ আর আমি নিজ হাতে ফায়ার করছি।

ভয়াবহ যুদ্ধ কোথায় সংঘটিত হয়েছে, যেখানে আপনি ছিলেন?

● সবচেয়ে ভয়াবহ যুদ্ধ আমাদের হয়েছিল চাঁপাইনবাবগঞ্জের ওখানে, মালদহের দক্ষিণ অংশে। হিলিতেও আমাদের লড়াই হইছে। হিলিতে ট্রেন মাইরেছিলাম।

হিলিতে ট্রেন মারছিলেন?

● ট্রেন মারছি।

আপনি সেই যুদ্ধে ছিলেন?

● আমি ওই যুদ্ধে ছিলাম।

কীভাবে ট্রেনটিকে আপনারা...?

● ওখানে আমাদের রেজিমেন্ট, থার্ড বেঙ্গল রেজিমেন্টের সুন্দরবন কোম্পানি আর্টিলারি গোলা ফেলাইছিল। থ্রি ইঞ্চ মর্টারের গোলা ইঞ্জিনে এবং পাঁচটা বগির মধ্যে ফেলাইছে। এই অ্যাটাকের পর পিছনের ইঞ্জিন দিয়ে ট্রেনটা পিছে চইলা গেছে। তারপর পাকিস্তানিরা হেভি হাতিয়ার দিয়া বৃষ্টির মতন গুলি করছে। গুলির চোটে বিএসএফ তো সব ভাইগে গেছে। তহন আমরা বাধ্য হয়ে পিছে ব্যাক করি।

আপনারা কতজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন?

● ওখানে আমরা ৫০-৬০ জন ছিলাম।

সেই যুদ্ধে কি আপনাদের কোনো মুক্তিযোদ্ধা মারা যায়নি?

● না, মারা যায়নি। আমাদের কোনো মুক্তিযোদ্ধার ক্ষতি হয়নি।

আপনারা কি পাকিস্তানিদের মারতে পারছিলেন?

● পাকিস্তানি সৈন্য মারা গেছিল কি না সঠিক আমি বলতে পারব না। কিন্তু ট্রেনের কিছু লোক মারা গেছিল।

নবাবগঞ্জে আপনি কীভাবে যুদ্ধ করেছেন?

● নবাবগঞ্জে আমার অফিসার ছিলেন লেফটেন্যান্ট আউয়াল চৌধুরী। মহতীপুর থেকে এর আগে ক্যাপ্টেন জাহাঙ্গীর কিছু মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে অ্যাডভান্স করছিলেন। এ সময় ওখানে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা মারা গেছিল। কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা মারা যাওয়ার পর কিছু ছেলে ওখান থেকে ভাইগে গেছিল। ভাইগে যাওয়ার খবর পালাম। খবর পায়া লেফটেন্যান্ট আউয়াল চৌধুরীর নির্দেশে আমরা দেড় শ ফোর্স নিয়ে সেখানে গেলাম। যাওয়ার পর ওখানে দুই দিন আমরা রেস্টে থাকলাম। রেস্টে থাকার সময় পাকিস্তানিরাই আমাদের ওপর অ্যাটাক করল। আমাদের অ্যাটাক করলেও তারা আমাদের ডিফেন্স থেকে হটাতে পারে নাই। এক দিন পর আমরা পাকিস্তানিদের অ্যাটাক

করলাম। অ্যাটাক করে ওদের ডিফেন্স থেকে হটালাম। পাকিস্তানিরা হটে যাওয়ার পর আমরা সামনে এগোলাম। তারপর শিবগঞ্জ থানা পর্যন্ত আমাদের রেকি চলল।

আপনাদের কতজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন?

● আমাদের ওখানে মুক্তিযোদ্ধাদের ছিল তিনটা পার্টি। গিয়াসউদ্দীনের পার্টি ছিল, আমাদের লেফটেন্যান্ট আওয়াল চৌধুরীর পার্টি আর ক্যাপ্টেন জাহাঙ্গীরের পার্টি। এই তিনটা পার্টি।

তিন পার্টিতে কতজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন?

● মুক্তিযোদ্ধা তিন শ-সাড়ে তিন শ ছিল।

আপনাদের সঙ্গে কোনো ভারতীয় ফোর্স ছিল?

● ভারতীয় ফোর্স ছিল, তারা পিছনে ছিল।

আপনাদের সঙ্গে কী কী অস্ত্র ছিল?

● আমাদের সঙ্গে ছিল থ্রি ইঞ্চ মর্টার, স্টেনগান, এসএলআর আর রাইফেল। যুদ্ধের সময় যে দিন ক্যাপ্টেন জাহাঙ্গীর মারা গেল, সে দিন কি তার পরের দিন আমরা নদী পার হয়ে অ্যাডভান্স করলাম। পানির ভিতর ডুবে ডুবে আমরা পার হয়ে চলে গেছি রাত্রে। পার হয়ে গিয়ে তুমুল লড়াই আবার আরম্ভ হয়া গেল। লড়াই করতে করতে আমরা উপরে উঠে চলে গেছি। পাকিস্তানিরা দিনের বেলা লড়াই কইরা রাত্রে আপনার ঈশ্বরদীর রাস্তা দিয়ে ভাইগে গেছে। শুনছি যে, ৪৫টা গাড়ি নিয়া ভাইগে গেছে। আর রাজশাহীর রাস্তা দিয়ে চারটা গাড়ি গেছে।

সেই যুদ্ধে আপনাদের মুক্তিযোদ্ধা কতজন মারা গেছিল?

● কোনো মুক্তিযোদ্ধা মারা যায়নি। কয়েকজন আহত হইছিল। আমি নিজে আহত হইছিলাম। থ্রি ইঞ্চ মর্টারের চারটা টুকরা লাগছিল। সেটা প্রথম বুঝতে পারি নাই। মনে হইছে আগুনের ছ্যাঁকা লাগছে। তারপর তো চিকিৎসা করাইছি। ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে কিছুদূর যাইয়া দেখি এক বাংকারে সাতজন শত্রু। ডিফেন্স থেকে পাকিস্তানিরা ভাইগে যাওয়ার সময় বোধ হয় তারা সরতে পারে নাই। ওখানে লুকাইয়া ছিল। ব্রেনগান দিয়া সাতজনেরে শেষ শোয়ান শোয়াইয়া দিছি।

সবাই পাকিস্তানি সেনা?

● রাজাকার আর পাকিস্তানি সেনা। তিনজন পাকিস্তানি সৈন্য ছিল।

যুদ্ধের শেষে গ্রামে ফিরে আপনার এলাকার অবস্থা আপনি কী দেখলেন?

● গ্রামে মাতম অবস্থা। সবাই শরণার্থীর মতো দিন কাটাচ্ছে।

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **ভবেন্দ্রনাথ বর্মণ**
নভেম্বর ১৯, ১৯৯৬

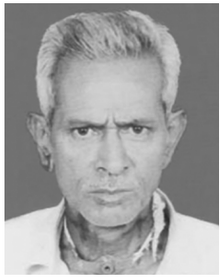

মমতাজ আলী

পিতা : কলিমউদ্দীন, মহল্লা : গৌরীপাড়া-সুজাপুর, ডাকঘর থানা ও পৌরসভা : ফুলবাড়ী, জেলা : দিনাজপুর, শিক্ষাগত যোগ্যতা : তৃতীয় শ্রেণী ১৯৭১ সালে বয়স ২২-২৪ বছর, ১৯৭১ সালে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ছিলেন বর্তমানে অবসর জীবন যাপন করছেন।

১৯৭১ সালের যুদ্ধের কথা কি আপনার মনে পড়ে?

● হ্যাঁ, মনে আছে। তার আগে ১৯৭০ সালে আমরা নৌকায় ভোট দিছিলাম। ভোট দেওয়ার পর টুকটাক করি আন্দোলন শুরু হইল। শহরে মিছিলটিছিল হয়। তারপরে তো গোলাগুলি হইল সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্টে। তখন বিভিন্ন ধরনের লোক আসলো ফুলবাড়ীতে। তারপর ইপিআররা আসলো। তারা এখানে ইপিআর ক্যাম্পে যে খান আর বিহারি ছিল তাগো সাথে লড়াই করল। আবার এপ্রিল মাসে খান আসি ফুলবাড়ী ঢুকি গেল। আমরা খানদের ঘেরাও করলাম। খানদের গাড়ির টায়ার বার্স্ট হইয়া একজনের পাও ভাঙ্গি গেল। খানরা ফুলবাড়ীর বিভিন্ন সাইডে পজিশন নিল। খানদের সাথে যুদ্ধ হইল। খানরা পালাইয়া গেল। কয়েকটা খান ধরা পড়ল। তার আগে আমাদের একজন কয়, মনে হয় ওইহানে খানরা লুকাইয়া আছে। আমরা সব গিয়া সেই জায়গাটা ঘেরাও করলাম। তারা ধরা পড়ল। এটা নিমতলার মোড়ে। পাঁচজন খান জনগণের হাতে মারা পড়ল। এরপর খানরা আবার আসি ফুলবাড়ী ঘেরাও করে দখল করল। আমরা ছত্রভঙ্গ হইয়া গেলাম। খানরা ওই দিক হইতে লোকজনকে মারতে মারতে ঢোকে। আগে ঢুকল কানাহার। ওখানে আগুন লাগাইল। তখন আমরা ছেলেমেয়ে সব ওই বর্ডার এলাকায় নিয়া গিয়া থুইয়া আইছি। থুইয়া আবার আমরা বাড়িতে আসি

দেখলাম যে বৃষ্টির মতো গুলি। তখন আমরা আর টিকতে পারি না। আমরা আবার বাইর হইয়া গেলাম। যখন শান্ত হইল, তখন আবার ফিরি আসলাম। বাড়িতে ধান-চাউল ছিল। সে জন্য ফিরি আসি বাড়িতেই আছিলাম। দুই দিন পর খানসেনারা আসি আমাকে ধরল। আর ছাড়ি দেয় না। আমাকে ধরল। তারপর ওসমান বুড়াকে ধরল। সাত্তারকে ধরল। ওদের ছাড়ল। কিন্তু আমাকে আর ছাড়ে না। মারপিট করে কয়েক দিন পর আমাকে ছাড়ি দিল। খানদের হাত থাকি ছাড়া পাইয়াই আমি ভারতের দিকে রওনা দিলাম। আর ঘরে আসি নাই।

প্রথম তালতলায় গেছি। ঠাকুরপুকুরের পাশে তালতলা। ওটা ইন্ডিয়ার ভিতরে। ওখানে আমি গেলাম। আগেই আমি বাড়িতে থাকি কিছু চাউল নিয়া গেছিলাম। কিছু টাকাপয়সা আগে পাঠাই দিছিলাম। ওখানে থাকি খাই আর চিন্তা করি, কী করি? এক দিন আমি শিলপাটা কিনার জন্য দাঙ্গারহাট গেছিলাম। ওখানে আমাকে পিছন থাকি একজন ধরি ফেলল। তখন আমি চমকি গেলাম আর ভাবলাম, কী ব্যাপার? যে ধরছে সে কয় যে ভয় নাই। সে আমাকে কয়, দেখেন, আপনাদের দেশ বাঁচাইতে হবে। আপনাদের যাইতে হবে। আমি কই, কোথায় যাইতে হবে। সে কয়, মুক্তিযোদ্ধায় নাম দিতে হবে। তখন আমি ভয় পাইয়া গেলাম। সে আমাকে ক্যাম্পে নিয়া গেল। তার সাথে গিয়া দেখি সেখানে আমাদের চিনাজানা বহু ছেলেপেলে। ওরাও ক্যাম্পে জমা হইছে। কাউকে ধরি আনছে, কেউ নিজেই গেছে। আমাদের নিয়া গেল কাটলাতে। কাটলা থেকে আবার নিয়া গেল কামারপাড়া ক্যাম্পে। নিয়া গিয়া ওখানে নামটাম লিস্ট করি, মেডিকেল-টেডিকেল করি খাওয়াদাওয়া করাইল। এক দিন পর মোটরে করি নিয়া গেল শিলিগুড়ি। ওখানে আমাদের ট্রেনিং হইল। ২১ দিন ট্রেনিং হইছে। তারপর আমাগরে নিয়া আসলো দাঙ্গারহাট। ওখানে ক্যাম্পে খাওয়াদাওয়া করলাম। এরপর আমরা আবার ফুলবাড়ীর দিকে—আমাদের জানা জায়গায় রওনা হইলাম।

ফুলবাড়ী থেকে সন্ধ্যার সময় বার হইয়া রাত একটার সময় শালখুড়িয়া গিয়া পৌঁছলাম। এটা নবাবগঞ্জ থানায়। ওখানে গিয়া একজনের বাড়িতে সে দিন ছিলাম। পরের দিন সন্ধ্যার সময় চলি গেলাম কাশিয়াডাঙ্গার ওখানে। সেখানে গিয়া আমরা একটা ব্রিজে মাইন লাগাইয়া উড়াই দিলাম, এটা রেলের ২০ নম্বর পুল। ব্রিজটা উড়াই দেওয়ার পর খানসেনারা আমাদের ওপর বৃষ্টির মতন গুলি শুরু করল। আমরা ছত্রভঙ্গ হইয়া যে যেদিকে পারছি চলি গেছি। পরের দিন ভোরে সব এক জায়গায় হইছি।

আমরা শালখুড়িয়ায় যে ঠিকানায় ছিলাম ওই ঠিকানায় আইছি। শালখুড়িয়ায় আমরা দুই দিন থাকলাম। ওখান থাকি আবার চলি আসলাম মরাপাড়ায়। মরাপাড়ায় যখন ঢুকলাম, তখন রাত একটা বাজে। দুই-একটা মানুষ দেখা যায়। তাদের আমরা বললাম, এই ব্রিজটা আমরা উড়াইব। তখন তারা আমাদের হাত ধরে বলল, ব্রিজটা উড়াইলে আমাদের বাড়িঘর থাকবে না। খানসেনারা আসি সব ধ্বংস করবে। তোমরা এই কাম কোরো না। তখন আমরা ওখান থাকে রিটার্ন হইয়া চলি গেলাম। তিন দিন পর আবার মানুরুতপুর গেলাম। ওখানে গিয়া একটা ব্রিজে আমরা মাইন লাগাইলাম। রেললাইনের একটা ব্রিজে। মাইনের তারে ম্যাচ জ্বালায়া আগুন লাগানোর সময় খান আর রাজাকাররা টের পাইল। টের পাইয়াই বৃষ্টির মতো গুলি শুরু করল। ওরা ওখানে কাছেই কোথাও ছিল। আমরা আর আগুন লাগাইতে পারলাম না। ওখান থাকি আমরা চলি আসলাম। আবার শালখুড়িয়া আসলাম। শালখুড়িয়া আমরা কয়দিন থাকলাম। কয় দিন থাকার পর আমাদের কমান্ডার বলল, এইখানে আর কাজ হবে না। তখন আমরা অন্য জায়গায় রওনা দিলাম। যে দিন রওনা হইলাম সে দিন রাইত বাজে ১১টা, টেয়াপুকুইড়া, আমেরডাঙ্গা, বশির মল্লিকের বাড়ির পাশ দিয়া আমরা যখন যাইতেছি, তখন দেখি যে সেখানে এক জায়গায় রাইফেল কাঁধে নিয়া দুইজন রাজাকার খাড়া হইয়া আছে। আমরা দূর থাকি এটা দেখছি। ওরা রাইফেল নিয়া ব্রিজ পাহারা দিতেছে। আমাদের একজন ওদের কাছাকাছি গিয়া দেখল ওরা মোট চারজন। দুইজন ঘুমাইতেছে। আর দুইজন পাহারা দিতেছে। একজন বিহারি আর একজন বাঙালি। আমরা সাতজন বিভিন্ন দিক দিয়া গিয়া ঘেরাও দিয়া ওই দুইজনকে ধরলাম। আর দুইজন চিৎকার দিতে চাইতেই আমরা বললাম, চিৎকার দিলে একদম শেষ করে দিমু। তারপর বাকি দুইজনকেও ধরা হইল। চারজন রাজাকার ধরি আমরা আবার রওনা দিলাম। মহালপুরের ডাঙ্গা পার হইয়া আমরা ধোলাত নামি। তখন আমাদের দলেরই দিনাজপুরের এক ছেলে, ওর নামটা আমার এখন খেয়াল নাই, আমরা সবাই তখন ধোলাত নদীর কাছাকাছি, তখন ওই ছেলেটা হঠাৎ পিছন থাকি তিন রাজাকারকে গুলি করি মারি দিল। ওর গুলিতে তিন রাজাকারই মারা গেল।

ক্যাম্পে দুই দিন রেস্ট নেওয়ার পর আমাদের ১০০ করি টাকা দিল। ওই টাকা নিয়া আমরা চলি গেলাম চরকায়। এটা বিরামপুর থানায়। ওখানে আমরা বেশি দিন টিকতে পারি নাই। তিন দিন ছিলাম ওখানে। তিন দিনে আমরা কোনো কাজ করতে পারি নাই। ওখান থাইকা আমরা ব্যাক করি

চলি গেলাম মোহনপুরে। মোহনপুরে আমাদের আরও ছেলেপেলে ছিল। তারা সব আগে থাকিই পজিশন নিয়া ওখানে গোলাগুলি করতেছে। খানসেনারাও প্রচণ্ড গোলাগুলি করতেছে। দূর থেকে দেখা যায় খানসেনাদের। আমরা যাওয়ার পর যুদ্ধ চলল চার-পাঁচ ঘণ্টা। আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যি থাকি একজন শহীদ হইল। ওই মুক্তিযোদ্ধা আর আমাদের বাড়ি ফুলবাড়ীতেই। প্রিন্সিপালের ভাই, নামটা এখন মনে নাই। গোলাগুলি চলার পর খানসেনারা পিছনে চলি গেল। খানদের আর কোনো খোঁজখবর পাওয়া গেল না। পরবর্তী সময়ে শোনা গেল যে খানসেনাদের তিনজন মারা গেছে।

ক্যাম্পে যাওয়ার পর আবার অর্ডার হইল চেরাডাঙ্গা যাওয়ার। আমরা চেরাডাঙ্গায় চলি গেলাম। ওখানে গিয়া খানসেনাদের সাথে দুই দিন গোলাগুলি চলল। ওখানে গোলাগুলি চলার পর আবার অর্ডার হইল দিনাজপুরের পশ্চিমে যাওয়ার। আমরা আবার ওখানে চলি গেলাম। ওখানে এক দিন থাকলাম। ওখান থাকি আবার চলি গেলাম দিনাজপুরের পশ্চিম পাশে কাঞ্চন এলাকায়। আমরা কাঞ্চনে ঢুকি পড়লাম। ঢুকি পড়ি ওখানে আমরা খানসেনাদের হটাইতে খুব চেষ্টা করলাম। কিন্তু আমরা পারলাম না। আমরা পিছনে হইটা গেলাম। আবার পরের দিনই আমরা প্রস্তুতি নিলাম। কিন্তু আমরা টিকতে পারলাম না। আমরা ছিলাম মোট ৩০ জন। আমরা ওখান থাকি ব্যাক করি চলি গেলাম ইন্ডিয়ায়। ওখানে গিয়া এক ক্যাম্পে থাকলাম ১৩ দিন। তারপর আমাদের পাঠাইল পঞ্চগড়-ঠাকুরগাঁও। আমরা চলি গেলাম ঠাকুরগাঁও ইস্টিশন পর্যন্ত। রেলইস্টিশনে চলি গেলাম। ওখান থেকে আবার চলি গেলাম পঞ্চগড়ের দিকে। পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও—ওই দিক দিয়ে ঘুরলাম। আমরা থাকলাম ২২ দিন। ওখানে থাকার সময় আমরা চারজন একদিন রেকি করতে বার হইছিলাম। একজন গাইবান্ধার। আরেক জন ছিল বগুড়ার। আমি ফুলবাড়ীর, আরেক জন ছিল দিনাজপুরের। আমরা চারজন গেলাম। ওখানে রেকি করতে গিয়া আমরা খানসেনাদের ফান্দে পড়ি গেছিলাম। খানসেনারা আমাগোরে ধরি ফেলছিল। খানসেনা ছিল তিনজন। আর রাজাকার ছিল পাঁচজন। আমরা তিনজন খানসেনাগোর হাতে ধরা পড়ি গেলাম। তখন বেলা বাজে চারটা-সাড়ে চারটা। আমাদের নিয়া যাইতে যাইতে পাঁচটা বাজি গেল। কিছু থাপ্পড়টাপ্পড় মারল। মারার পর ওখানে একটা স্কুল ছিল ছাপড়ার, ওখানে নিয়া গেল।

তখন আপনাদের হাতে কোনো অস্ত্র ছিল না?

● না। খালি গ্রেনেড ছিল। ওরা যখন ঘেরাও করছে তখন আমরা গ্রেনেড

ফেলি দিছি। তারপর তো আমরা ওখানে ঘেরাও হইয়া গেলাম। আমাদের একজন পালাইয়া গেল। আর আমাদের তিনজনকে আটকাইল। ধরি নিয়া স্কুলে তিনজনকে তিন জায়গায় থুইল। দরজা তালা মারি রাখি গেল। তখন আমি মনে মনে বলছি, আমাদের জীবন তো শেষ। আর তো বাঁচার কোনো পথ নাই। তখন আমি দেখি কি স্কুলঘরের জানালার কোনো শিক নাই। ওখানে আমি যে কামরায় আছি ওটার জানালার শিক নাই। পাল্লা এমনি খিল দেওয়া আছে। তখন আমি চিন্তা করছি কখন বেলা ডুববে। এই চিন্তাভাবনা করতি করতি বেলা ডুবি গেল। মাগরিবের আজান হইল। তারা বোধ হয় নামাজ পড়তে গেল। তখন আমি জানলা খুলি তার ওপর দিয়া পার হইয়া স্কুলের পিছনে গেলাম। পিছে দেখি একটা গর্ত, সেই গর্তের ভিতর গেলাম। দেখি কোনো সাড়াশব্দ নাই। তখন আমি ক্রল করি সামনে চলি গেলাম। ক্রল করি কিছুদূর গিয়া উঠি দৌড় মারলাম। আর দুইজন ওখানে থাকল। তারপর আমি ক্যাম্পে গিয়া খবর দিলাম যে এই ব্যাপার। এই ঘটনা। যে আগেই পলাইয়া গেছিল তার আর কোনো খবর নাই। তারপর তো আমাদের দলের সবাই আসল। কিন্তু সবাই আসার আগেই খানসেনারা ছেলে দুইটাকে মারি ফেলছিল। আমরা গোলাগুলি করছিলাম। ওখানে তখন খানসেনারা লোকসংখ্যায় বেশি হইয়া গেল। গোলাগুলি করি আমরা ওদের সাথে আর পারি নাই। তখন আমরা পিছনে চলি গেছি। পরে ওখান থেকে আমরা চলি গেছি রুহিয়ার ওই দিকে। এটা ঠাকুরগাঁওয়ে। ওখানে গিয়া ৮ দিন না ১০ দিন থাকলাম। ওখানে আরও কয়েক দল মুক্তিযোদ্ধা আইলো। ওখানে আস্তে আস্তে আমরা প্রায় ১৫০ জন হইয়া গেলাম। একদিন অর্ডার হইল নীলফামারীর দিকে যাওয়ার। আমরা সবাই মিলে সেই দিকে রওনা হইলাম। পথে তিস্তা নদীর পারে খানসেনাদের সাথে খুব লড়াই হইল। তিন দিন ধরে যুদ্ধ চলল। তাতে আমাদের ২৫ জন ছেলে মারা গেল।

সেখানে খানসেনারা কতজন ছিল?

● ওরা কতজন ছিল সে হিসাব আমরা পাইনি। অনেক ছিল। তারপর ওখান থাকি আমরা পিছনে হটি গেলাম। পিছনে যাওয়ার আগে যারা মারা গেছিল তাদের লাশগুলা আমরা উদ্ধার করছি। তিনজনের লাশ আমরা নিতে পারলাম না। লাশগুলা নিয়া মাটিটাটি দিয়া ওখান থাকি আবার রওনা হইলাম নীলফামারী। নীলফামারী আসি আমরা যেখানে ক্যাম্প করছি সেখান থাকি খানসেনাদের ক্যাম্প প্রায় চার মাইল দূরে। আমরা ক্যাম্প করার কয়েক দিন পর আমাদের ক্যাম্পে এক বুড়া আসি বলছে যে, বাপ,

খানসেনাদের অত্যাচারে আর থাকা যাচ্ছে না। আপনারা আমাদের সহযোগিতা করেন। আমরা বুড়াকে বললাম, কেমন করি আমরা তোমার ওখানে যাব? বলে, বাপ, আমরা আপনাদের আগাইয়া নিয়া যাব। এই কথা শুনে ওই বুড়ার পিছনে আমরা সাতজন রওনা হইলাম। আমাদের কাছে রাইফেল আর বেয়নেট ছিল। তার বাড়িতে যাওয়ার পর বুড়া বলছে যে, বাবা আইছেন, বসেন, খাওয়াদাওয়া করেন। এদিকে ওই বুড়া খবর পাঠাই দিছে খানসেনাদের কাছে। সেটা আমরা জানি না। আমাদের একসাথে খাবার দিছে। কিন্তু আমরা একসাথে খাবার বসি না। আমরা দুইজন দুইজন কইরা দুইবারে খাইলাম। তারপর তিনজনে একসাথে খাতি বসছে আর আমরা বাইরে খাড়া হইয়া আছি। হঠাৎ দেখি কি ১০-১৫ জন খানসেনা আর কয়েকটা রাজাকার আসতেছে ঝান্ডা নিয়া একেবারে হইহল্লা করি। তখন আমরা ওই তিনজনকে বললাম যে, এই খাওয়া বাদ দাও, খান আইছে, পালাও। ওই বুড়ার বাড়ির চারদিকে ছোট পাঁচিল আর পশ্চিম পাশে একটা দিঘি ছিল। আমরা পাঁচিল টপকাইয়া দিঘির ওপারে গিয়া গ্রামের ভিতর দিয়া ভাগি গেলাম। সামনে দৌড়াইতেছি। খানসেনারাও আমাদের পিছনে পিছনে আসতেছে। তখন আমরা ছত্রভঙ্গ হইয়া যে যেদিক পারছি চলি গেছি। খানসেনারা গুলি করছিল। কিন্তু আমরা গুলির রেঞ্জের বাইরে ছিলাম। গুলি লাগে নাই। অনেকক্ষণ দৌড়ানোর পর দেখি পিছনে খানসেনা নাই। দৌড়াদৌড়ি কইরা ক্যাম্পে আসলাম।

দুই দিন পর ওই বুড়ার বাড়িতে আমরা আবার গেলাম। গিয়া দেখি যে গ্রামটায় একটাও জনপ্রাণী নাই। দৈলমারিতে আসি খানসেনাদের সাথে লড়াই লাগল। একজন কমবয়সী খানসেনা আমাদের হাতে ধরা পড়ল। ওখানে যুদ্ধ করি আমরা চলি গেলাম ডিমলায়। ডিমলাতে থাকলাম কয়েক দিন, ওটা নীলফামারী এলাকা। তখন আশপাশ থাকি খানসেনারা চলি গেছে। আমরা আস্তে আস্তে সামনের দিকে আগাইতে লাগলাম। কয়েক দিন পরই দেশ স্বাধীন হইল। খানসেনারা সারেন্ডার করল। আমরা গিয়া ক্যাম্প করলাম নীলফামারী। ওখানে আমাদের হাতিয়ার-টাতিয়ার জমা নিয়া আবার দিনাজপুরে পাঠাইল। আমরা দিনাজপুর ক্যাম্পে গেলাম। ওখানে ক্যাম্পের কমান্ডার ছিল ক্যাপ্টেন শাহরিয়ার। আরেকটা শিখ ছিল। তার নাম ছিল আর পি সিং। দিনাজপুরে মহারাজা স্কুলে আমরা ছিলাম। আমার সাত মাসের ভাতা বাকি ছিল। সেই ভাতাটা ওখানে পাইলাম।

আপনার এলাকায় কখন পাকিস্তানি সৈন্যরা আক্রমণ করল?

● আমাদের এলাকায় পাকিস্তানিরা আক্রমণ করছে আপনার বাংলা বৈশাখ

মাসের ৪ কি ৫ তারিখে।

পাকিস্তানি সৈন্যরা কীভাবে আক্রমণ করল?

- ওরা ভবানীপুর, কানাহার হয়ে আমাদের এলাকায় ঢুকি পড়ছে। বৃষ্টির মতো গুলি করতে করতে ওরা আইছে। যেখানে-সেখানে ওরা আক্রমণ করছে। তখন এই এলাকায় বাঙালি রেজিমেন্টের কিছু সৈন্য ছিল। তাদের সাথে এক পাগলা মেজর ছিল। তার নাম নিজামউদ্দীন। ওই মেজর তখন বলল যে আর থাকা যাবে না। পিছনে হটি যাও। তখন সবাই পিছনে হটি গেলাম। ওই মেজরকে মারা হইছিল চরকা ইউনিয়নে। উনি বাঙালি ছিলেন কিন্তু উনার স্ত্রী খানের মেয়ে ছিল। তাকে ঠিক কী কারণে মারছিল, জানি না।

পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী আপনার এলাকায় আর কী কী করল?

- গোলাগুলি করল। বাড়িঘরে আগুন লাগাইছে। দোকানপাট পোড়াইছে। লুটতরাজ করছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আমি এলাকায় আসি দেখি এইগুলো সব পোড়া।

সেই সময় আপনার পরিবারের কেউ কি শহীদ হয়েছিল?

- না, আমার পরিবারে কেউ শহীদ হয় নাই।

আপনার এলাকায় কখন থেকে মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা শুরু হয়?

- আমাদের এখানে ওটা জ্যৈষ্ঠ মাসের পর থাকি শুরু হয়।

আপনার গ্রাম বা এলাকায় কারা রাজাকার ছিল?

- রাজাকার তো ছিল। তাদের তো আমাদের এখানকার ছেলেরা ধরি নিয়া গেছে। হারুনের ছেলে মজিবর রাজাকার ছিল। মজিবর ১০ জন না কয়জন রাজাকার নিয়া ভিতরে চইল্যা গেছিল। পরে সারেন্ডার করছিল। আরও কয়েকটা ছিল। ওদের নামটা আমার জানা নাই।

শান্তি কমিটিতে কারা ছিল?

- শান্তি কমিটি ছিল। শান্তি কমিটিতে মোহাম্মদ মিয়া, গণি মিয়া আর কিরণ ছিল। আর একজন ছিল, তাকে মুক্তিযোদ্ধারা মারি ফেলাইছে। উনার নামটা তো আমার খেয়াল নাই। আরও বেশ কিছু লোক ছিল।

তারা এখন কোথায়?

- তাদের অনেকেই মারা গেছে। এখন খালি গণি মিয়া আছে।

স্বাধীনতাবিরোধীদের ধরা হইছিল কি?

- হ, অনেকগুলোকে মুক্তিবাহিনী ধরছিল। মুক্তিবাহিনীরা তাদের ধরি মারি ফালাইছিল। আমার জানামতে, আমাদের ফুলবাড়ী থানাতে বোধ হয় ১০-১৫ জন ধরা পড়ছিল। আমি এটা শুনছি, দেখিনি। আর আমরা নিজেরাই তো তিনজন মারছি।

যুদ্ধের শেষে এলাকায় ফিরে এসে এলাকার অবস্থা কী দেখলেন? স্কুল-কলেজ, মসজিদ-মাদ্রাসা এগুলো কী অবস্থায় ছিল?

- এইগুলা তো সব ভাঙা ছিল। বেশির ভাগ বাড়িঘর, দোকানপাট পোড়া। সব পোড়া। রাস্তাঘাট ভাঙা। দুই একটা ভালো ছিল। দুই-একটা দোকান ভালো ছিল। সেগুলা বিহারিদের ছিল। হিন্দুদের কালীমন্দিরটা খানসেনারা উড়িয়ে দিছিল। শিবমন্দিরটাও ধ্বংস করছে। দুইটা মন্দির এখানে ছিল। দুইটাই খানসেনারা ভাঙি দিছিল। ওখানে তারা গরুটরু জবাই করত। মসজিদগুলো ঠিকই ছিল। ব্রিজগুলা তো বেশির ভাগ ভাঙা ছিল। খানসেনারা কিছু ভাঙিছে। আমরাও কিছু যুদ্ধের সময় ভাঙিছি। আমাদের এইখানের বড় ব্রিজটা খানসেনারা উড়িয়ে দিছিল। ফুলবাড়ী শহরের ব্রিজটা যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগে খানসেনারা উড়িয়ে দিছে।

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **আবদুল কাইয়ুম**
অক্টোবর ৩০, ১৯৯৬

মো. আজিজুল হক

গ্রাম : গড়াই, ডাক : পুকুরিহাট, থানা : ফুলবাড়ী, জেলা : দিনাজপুর
শিক্ষাগত যোগ্যতা : দশম শ্রেণী, ১৯৭১ সালে বয়স ১৮-২০ বছর
১৯৭১ সালে ছাত্র ছিলেন, বর্তমানে স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী। পিতার নাম সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। মো. আজিজুল হকের ছবি পাওয়া যায়নি।

১৯৭১ সালে কি আপনি পাকিস্তানি সেনাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন?

- ঠিক আক্রান্ত না, তবে বিপদে পড়েছিলাম। একবার আমি ফুলবাড়ীতে এসে সেখান থেকে পার্বতীপুর গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে শুনি, ফুলবাড়ীতে পাকিস্তানি সেনারা আসছে। তখন আমার মনে হলো যে আমি এখন কোন পথে বাড়ি ফিরে যাব এবং কেমন করে যাব। এ ধরনের একটা বিপদে আমি পড়েছিলাম। তো তখন পার্বতীপুরের ভবানীপুর থেকে পায়ে হেঁটে ফুলবাড়ীর পশ্চিম দিক হয়ে বাড়িতে ফিরে আসি।

আপনি কেন মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেন?

- দেশকে স্বাধীন করার উদ্দেশ্যে। আর সব থেকে বেশি যেটা আমাকে প্রেরণা দিয়েছিল, সেটা হলো নারীদের প্রতি পাকিস্তানি বাহিনীর নির্মম অত্যাচার। এই ইজ্জত লুণ্ঠনের ব্যাপারটা আমাকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল। ছাত্রসমাজের ওপর তারা বেশি আক্রমণ করেছিল। যার জন্য আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম।

আপনার এলাকায় কখন পাকিস্তানিরা আক্রমণ করল?

- আমাদের এলাকায় পাকিস্তানিরা জুন মাসের ১৫-২০ তারিখে ডিফেন্স গড়ে তোলে। এর পর থেকে তারা আক্রমণ শুরু করে।

তারা কীভাবে আক্রমণ করল?

- তারা ক্যাম্প থেকে গ্রামে গ্রামে যেত এবং মানুষদের মারপিট করত। ধরে নিয়ে আসত, আবার হত্যাও করত। অনেক জায়গায় কাউকে কাউকে খোঁজাখুঁজিও করত।

পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী আপনার এলাকায় আর কী কী করল?

- স্বাধীনতাযুদ্ধের ঠিক মাঝখানে তারা নারী-নির্যাতন শুরু করে। গ্রামের মানুষদের যারা ভারতে গিয়েছিল তাদের কেউ কেউ যখন ফিরে এল, তাদেরও পাকিস্তানিরা মারধর করে। আবার কাউকে কাউকে হত্যাও করে।

পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর এই যে অত্যাচারের কথা আপনি বললেন, এটা কি আপনি স্বচক্ষে দেখছেন?

- কিছু স্বচক্ষে দেখেছি, কিছু মানুষের মুখে শুনেছি। আমি একদিন বিরামপুরে যেটা দেখেছি সেটা হলো, সে দিন ছিল শনিবার, হাটের দিন। সে দিন শান্তাহার থেকে অথবা পার্বতীপুর থেকে ট্রেনে একদল পাকিস্তানি সেনাবাহিনী হাটে আসে। আসার পর হঠাৎ তারা মানুষদের মারপিট করতে থাকে। মারপিট করতে করতে খানসেনারা গোহাটির কাছে এসে কয়েকজন মানুষকে গুলি করে হত্যা করে। নিহত মানুষের সংখ্যা ছিল পাঁচ থেকে সাতজন।

আপনার পরিবারের কেউ শহীদ হয়েছেন কি?

- আমার পরিবারের কেউ শহীদ হন নাই।

আপনার আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীর মধ্যে কেউ শহীদ হয়েছেন?

- আত্মীয়স্বজন শহীদ হননি। তবে আমার বন্ধুমহলের মধ্যে একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল, সে ওই যুদ্ধে শহীদ হয়েছে।

আপনার এলাকায় কখন থেকে মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা শুরু হয়?

- আমাদের এলাকায় মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা শুরু হয় জুন মাস থেকে।

আপনার গ্রাম বা এলাকায় রাজাকার কারা ছিল?

- আমাদের গ্রামে কোনো রাজাকার ছিল না। তবে আমাদের পার্শ্ববর্তী তিন মাইল দূরের এক গ্রামে যথেষ্ট রাজাকার ছিল। গ্রামটির নাম খড়মপুর।

রাজাকার যারা ছিল, তারা এখন কোথায়?

- রাজাকার যারা ছিল তাদের কেউ কেউ জীবিত আছে, কেউ কেউ মারা গেছে। কেউ হয়তো অন্যত্র চাকরিবাকরি বা অন্য কিছু করে।

রাজাকার, আলবদর এই সমস্ত স্বাধীনতাবিরোধীকে ধরা হয়েছিল কি?

- মুক্তিযোদ্ধারা তাদের ধরার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তারা তাদেরকে ধরতে পারেনি। স্বাধীনতার পর তারা ভারতে বা অন্য কোথাও আত্মগোপন করে ছিল।

পরবর্তী সময়ে এদের ধরার কোনো চিন্তাভাবনা হয়েছিল?

- এরপরে এদের ধরার আর কোনো চিন্তাভাবনা করা হয় নাই। কারণ পরে মুক্তিযোদ্ধারা অস্ত্র জমা দিয়ে বাড়ি ফিরে গেল। নিরস্ত্র হওয়ার কারণে

মুক্তিযোদ্ধারা আর তৎপরতায় আসেনি। পরে দেশের নিরাপত্তা বিভাগ থেকেও কোনো চেষ্টা করা হয়নি।

আপনি কত নম্বর সেক্টরে ছিলেন এবং কোন কোন এলাকায় আপনি যুদ্ধ করেছেন?

- আমি ৭ নম্বর সেক্টরের অধীনে বাংলা হিলি, কাটরা, ফুলবাড়ী, আমতলির হাট, পার্বতীপুর, আবতাবগঞ্জ, গোদাগাড়ী, ঠাকুরগাঁও—এই সমস্ত অঞ্চলে যুদ্ধ করেছি।

আপনি কি ফ্রিডম ফাইটার হিসেবে যুদ্ধ করেছেন, না গেরিলা হিসেবে?

- ফ্রিডম ফাইটার হিসাবে।

আমরা শুনেছি, হিলিতে খুব সাংঘাতিক ধরনের যুদ্ধ হয়েছে। তো হিলিতে যে আপনি যুদ্ধ করেছেন সে সম্পর্কে আপনি দু-একটি ঘটনার বর্ণনা দেন।

- হ্যাঁ, হিলির যুদ্ধ, এটা একটা সাংঘাতিক ঘটনা। ভারতের সুনামগঞ্জ থানার মোহনায় আমাদের একটা ক্যাম্প ছিল। সেখান থেকে আমরা ছোট ছোট গ্রুপে ভাগ হয়ে বাংলাদেশে যুদ্ধ করতে আসতাম। হিলি যুদ্ধের আগে আমরা বাংলাদেশের ভেতরে শেখপাড়া নামে একটি গ্রামে এসেছিলাম। সেখানে জরুরি খবর পাঠিয়ে আমাদের ক্যাম্পে ফেরত নেওয়া হয়। ক্যাম্পে ফেরার পরদিন বিকাল চারটায় আমাদের বাসে করে বাংলা হিলিতে [১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর হিলি শহরের একাংশ পাকিস্তানের অংশ হয়, যা 'পাক হিলি' নামে পরিচিত ছিল। বর্তমানে এটি 'বাংলা হিলি' নামে পরিচিত।] নিয়ে যাওয়া হলো। বাংলা হিলিতে নিয়ে যাওয়ার পরে সেখানে দেখি ভারতের সেনাবাহিনীও আছে। কোথায় যেতে হবে, কী করতে হবে, এ সম্পর্কে আমরা তখনো কিছু জানতাম না। রাত সাতটা-সাড়ে সাতটার সময় ওই যুদ্ধের কমান্ডার বাংলা হিলি স্টেশনের দক্ষিণ পাশ দিয়ে আমাদের সামনে এগোতে বলল। আমরা রেললাইন পার হয়ে ভিতরে চলে গেলাম। আমাদের সাথে ভারতের কোনো সৈন্য ছিল না। আমরা দুই শ থেকে আড়াই শ মুক্তিযোদ্ধা ছিলাম। আমরা অনেক ভিতরে চলে গেছি, এমন সময় পিছন থেকে খানসেনারা আমাদের ওপর হামলা শুরু করে। তখন আমরা চিন্তা করলাম, কী ব্যাপার, ভারত থেকে কি ভারতীয় সৈন্যরা আমাদের ওপর গুলি করতেছে, নাকি খানসেনারা? হঠাৎ গোলাগুলিতে আমরা সেই দিন ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলাম। পরে ফেরার সময় দেখি রেললাইনের নিচে বাংকার করে পাকিস্তানি বাহিনী ডিফেন্স নিয়ে আছে। সেখান থেকেই তারা আমাদের ওপর হামলা করেছে। আমার মনে হয়, সে দিন ১৫০ থেকে ২০০ জন মুক্তিযোদ্ধা সেখানে সেই অবস্থায় নিহত হয়। আমরা অকৃতকার্য হয়ে ফিরে আসি। দুই দিন পর আবার সেখানে আমাদের নিয়ে যাওয়া হয়। সে দিন আমাদের সাথে ভারতের ট্যাংক, গোলন্দাজ বাহিনী এবং পদাতিক বাহিনীও ছিল। সবাই মিলে আমরা সেখানে যাই। আমরা বাংলা হিলি অতিক্রম করে প্রায় এক মাইল ভিতরে চলে গেলাম। তার পরে ভারতীয় বা বাংলাদেশের উড়োজাহাজ থেকে খানসেনাদের বাংকারে গোলা নিক্ষেপ করা হলো। গোলন্দাজ বাহিনী কামান দিয়ে গোলা নিক্ষেপ করল। আমাদের সাথে ভারতের পদাতিক বাহিনী ছিল, তারাও আমাদের সাহায্য করল। আমাদের সম্মিলিত আক্রমণের পর খানসেনারা বাংকার থেকে বের হয়ে পিছনে চলে যায়। কিন্তু তারা সংখ্যায় ছিল কম। এরপর সেখানে তাদের ডিফেন্সের মধ্যে যত বাংকার ছিল, সেগুলোর মধ্যে পাইপ দিয়ে গরম পানি ঢেলে অনেক খানসেনাকে ধরা হলো। বাংকারের মধ্যে অনেক মেয়েও ছিল। মেয়েগুলোকে ধর্ষণের জন্য হয়তো তারা নিয়ে এসেছিল। তাদের পরনে কাপড়ও ছিল না। প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় তাদের আমরা পাই।

সে দিন আপনারা কতজন খানসেনাকে ধরতে পেরেছিলেন?

- সংখ্যা বলতে পারব না, তবে দুই ট্রাক খানসেনা ধরা পড়েছিল।

সে যুদ্ধে কতজন ভারতীয় ফোর্স মারা গেছিল?

- ভারতীয় ফোর্স সেখানে যথেষ্ট পরিমাণে মারা গেছে। আমার মনে হয়, মুক্তিযোদ্ধাদের থেকেও বেশি পরিমাণে মারা গেছে।

আপনি এ ধরনের ভয়াবহ যুদ্ধ আর কোন এলাকায় করেছেন?

- একবার মোহনপুর ঘাটে হঠাৎ আমাদের পাঠানো হলো খানসেনাদের ওপর আক্রমণ করার জন্য। সেই দিন ভারতের সেনাবাহিনী আমাদের সাথে ছিল না। আমরা এফএফ, শুধু তারাই সেখানে গেলাম। তবে আমাদের যাঁরা পরিচালনায় ছিলেন, তাঁরা এ কথা বললেন যে, তোমরা সেখানে যাও, তোমাদের যুদ্ধের জন্য সাপোর্ট করবে ভারতের অ্যান্টি এয়ার ফোর্স। আমরা সেখানে চলে গেলাম। আমরা যেখানে পজিশন নিলাম, সেখান থেকে ১০০ কি ১৫০ গজ সামনে খানসেনাদের ডিফেন্স। আমরা সেইখানে ক্রল করে আগাইতে থাকলাম। হঠাৎ খানসেনারা গোলাগুলি শুরু করল আমাদের ওপর। দুঃখজনক ঘটনা যে, খানসেনাদের ওপর ভারতের অ্যান্টি এয়ার ফোর্স হামলা করবে কিসের, তারাও আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর ভুলক্রমে হামলা শুরু করে দিল। ফলে আমাদের ফুলবাড়ীর প্রফেসর আজিজুর রহমানের ভাইসহ একটা ছেলেও শহীদ হয়, যার নাম এই মুহূর্তে আমার স্মরণ নাই। অনেকে সেখানে আহত ও নিহত হয়। আমাদের বেশকিছু মুক্তিযোদ্ধা হতাহত হওয়ার পর আমরা অকৃতকার্য হয়ে ফিরে আসি। সে দিন আমরা আমাদের নিজেদের ভুলেই অকৃতকার্য হলাম। আমাদের জন্য এটা একটা দুঃখজনক ঘটনা ছিল। আমার আরেকটা স্মরণীয় ঘটনা, মোহনপুর ঘাটের পশ্চিমে গোদাগাড়ী নামের একটা জায়গা আছে।

আমরা জানতে পারলাম, খানসেনারা সেখান থেকে পিছনে চলে যাচ্ছে। তার মানে শহরে চলে যাচ্ছে। সেই মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিলাম, সামনে গিয়ে তাদের আমরা আক্রমণ করব। সেখানে এসে দেখলাম, তারা চলেই গেছে। তারা চলে গেছে, এমতাবস্থায় তাদের বাংকারের কাছে আমরা গেলাম। এ সময় বাংকারের মধ্যে থেকে কিছু শব্দ শোনা গেল, মনে হলো কান্নার শব্দ। সে মুহূর্তে আমরা চিন্তা করলাম যে, ভিতরে কি লোক মারা গেছে নাকি খানসেনারা এখনো আছে, না মুক্তিযোদ্ধা আছে। এ সময় একজন মহিলা, সে বাংকার থেকে বের হয়ে বলল, ভাই, আমাদের রক্ষা করেন। আমাদের মধ্যে রইসউদ্দীন নামের একজন খুব সাহসী মুক্তিযোদ্ধা ছিল। সে-ই প্রথমে বাংকারের মধ্যে ঢোকে। সে সেখানে গিয়ে দেখে, ভিতরে ১০-১২ জন মহিলা। তারপর পর্যায়ক্রমে আমরা অন্য বাংকারগুলোও দেখলাম। প্রতিটা বাংকারের মধ্যে চারজন-পাঁচজন করে মহিলা। সে এক করুণ অবস্থা, সব যুবতী মেয়ে। তাদের শরীরে শাড়ি নেই, কামিজ-সালোয়ার কোনো কিছু নেই। সমস্ত শরীর উলঙ্গ। তারা এমন অবস্থায় ছিল যে, তাদের দিকে আমরা তাকাতে পারছিলাম না। তখন আমরা কেউ শার্ট, কেউ লুঙ্গি কেটে-ছিঁড়ে তাদের দিলাম। তারা সেগুলো পরে আমাদের সামনে আসে। এরপর আমরা তাদের দিনাজপুরের আনন্দসাগরে নিয়ে যাই এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের হেফাজতে দেই। যুদ্ধ শেষ হওয়ার সাত থেকে আট দিন আগের ঘটনা এটা। আরও একটা খুবই দুঃখজনক স্মরণীয় ঘটনা, যুদ্ধের শেষে আমরা আমাদের রাইফেল জমা দেওয়ার নির্দেশক্রমে দিনাজপুরের আনন্দসাগরে চলে আসি। সেখানে আমরা গোলাবারুদ, আর্মস জমা করলাম। আনন্দসাগরে যে বিরাট জমিদারবাড়ি [প্রকৃতপক্ষে মহারাজা স্কুল], সেখানে আমাদের হাতিয়ার, গোলাবারুদ, গুলি সংরক্ষিত থাকত। ত্রুটিপূর্ণ সংরক্ষণের কারণে অথবা অন্য কোনো কারণে হঠাৎ গোলাবারুদ বার্স্ট হয়ে যায়। গোলা বারুদ বার্স্ট হওয়ায় ওই রাজবাড়িটা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায় এবং সেখানে কয়েক শ মুক্তিযোদ্ধা সঙ্গে সঙ্গে নিহত হয়। এই ঘটনার কথা আমাদের দিনাজপুর জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলেও প্রচার হয়। তখন আমি আনন্দসাগরেই ছিলাম।

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **ভবেন্দ্রনাথ বর্মণ**
অক্টোবর ২০, ১৯৯৬

মো. আবদুর রশীদ

পিতা : কফিল উদ্দীন, গ্রাম : আন্দোল, ডাকঘর ও ইউনিয়ন : পুঁটিমারা
থানা : নবাবগঞ্জ, জেলা : দিনাজপুর, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নবম শ্রেণী
১৯৭১ সালে বয়স ১৬-১৭ বছর, ১৯৭১ সালে ছাত্র ছিলেন
বর্তমানে অবসর জীবন যাপন করছেন।

১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাতে আপনি কি আক্রান্ত হয়েছিলেন?

● মুক্তিযোদ্ধার ট্রেনিং নিয়া যুদ্ধ করতে আসার সময় আমি আক্রান্ত হয়েছিলাম। ট্রেনিংপ্রাপ্ত হইয়া আমরা যখন ভারত থেকে বাংলাদেশের ভিতর ঢোকার চেষ্টা করছিলাম, তখন আমরা আক্রান্ত হই। এটা হিলি বর্ডারে। রেলগেট পার হয়ে আসার সময় ১৫-১৬ জন খানসেনার হাতে আমরা আক্রান্ত হই। আমরা বাংলাদেশে রেকি করার জন্য আসতেছিলাম। আমাদের এই দিকে বড়তলা এবং দাঙ্গাপাড়ার মাঝখানে রেলের একটা ব্রিজ আছে, সেখানে পাকিস্তানিরা পাহারায় ছিল। আমরা ব্রিজের কাছাকাছি আসার পর দেখি, সেখানে দুইজন লোক বসা। আমরা মনে করছি, দুইজন লোক হয়তো রাজাকার। তারা ডিউটি করতেছে। আমরা বাংলাদেশের ভিতরে ঠিকই ঢুকতে পারব। মাত্র দুইজন লোক দেখার পর আমরা আরও আগাইয়া আসি। আগাইয়া আসার পরও দুইজনকেই শুধু দেখা যায়। এরপর আমরা রেললাইন পার হই। কিন্তু রেললাইন পার হইয়াই দেখি খানসেনা। তারা প্রায় ১৫-১৬ জন আমাদের চারদিক দিয়ে ঘিরে ফেলল। তারপর তো আমরা নিরুপায়।

আপনারা কয়জন ছিলেন?

● আমরা ছিলাম ২৪-২৫ জন। আমরা দেখতেছি আমাদের জীবন তো বাঁচে না। আমরা ওদের অ্যামবুশে পড়ে গেছি। তখন আমরা পজিশনে গেলাম। পজিশনে

যাওয়ার পর আমরা কিছুক্ষণ গোলাগুলি করি। গোলাগুলি চলা অবস্থায় দেখলাম, উত্তর পাশ দিয়া রাস্তাটা ক্লিয়ার। পিছু হঠতে হঠতে আমরা উত্তর দিকে চলে যাই। উত্তর দিকে দাঙ্গাপাড়া হয়ে আমরা চলে আসি ভিতরে। আমরা ব্যাক করে পিছনের দিকে আর যাইতে পারিনি। আশ্চর্যের ব্যাপার, এমন বিপদের মাঝেও আমাদের কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয় নাই।

আপনি কেন মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেন?

- দেশের জন্য আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। আমি প্রথম ইন্ডিয়ার মধুপুরে যাই। ওখানে এক দিন থাকার পর আমাদের পাঠানো হলো পতিরাম। ওখানে এক দিন থাকলাম। ওখানে থাকার পরদিন ডাইরেক্ট ট্রেনিংয়ের জন্য চলে গেলাম শিলিগুড়িতে। ওখানে ট্রেনিং নিয়ে আমাদের আবার পাঠানো হলো রাঙেরমার। রাঙেরমার থেকে আবার ২১ জনের পার্টি করে আমাদের বাংলাদেশে অপারেশনের জন্য পাঠানো হলো।

বাংলাদেশের কোথায় কোথায় যুদ্ধ করেছেন?

- বাংলাদেশে আমরা হিলিতেই বেশি যুদ্ধ করেছি। আমরা হিলিতে প্রথম যখন আসি, তখন সেখানে কিন্তু ভয়াবহ অবস্থা ছিল। একদিকে খানসেনা আবার অন্য দিকে ইন্ডিয়ান সোলজার। আমরা হিলিতে আসার পর আমাদের সোজা ডিফেন্সে নিয়ে গেল। আমরা বাংকারে থাকলাম। ওখান থেকে রেকি করার জন্য আমাদের আরেকদিন বাংলাদেশের ভিতরে পাঠানো হলো। খানসেনাদের অবস্থা এবং অবস্থানটা দেখার জন্য আমরা আসছি। ভিতরে আইসে রেকি করে আবার চলে যাই। দুই-তিন দিন রেকি করার পর আমাদের আবার ডিফেন্সে নিয়ে যায়। নির্দেশ দেওয়া হয় টার্গেটে ফায়ার করার জন্য। এক দিন এক রাতের মতো আমরা বাংকারের মধ্যে থেকে ফায়ার করছি। কিন্তু আমরা খানসেনাদের হটাতে পারি নাই। আমরা ওখান থেকে অর্থাৎ হিলি থেকে আবার ব্যাক করে পিছনে চলে যাই। এর কয়েক দিন পর আমাদের আবার পাঠানো হয়। আমরা হিলিতে আবার ডিফেন্স করে বসি। সেখানে প্রায় সাত দিন পাকিস্তানিদের সঙ্গে গোলাগুলি হয়। লাগাতার সাত দিন। রাতেও গোলাগুলি বন্ধ ছিল না। হয়তো এক-আধ ঘণ্টা বন্ধ থাকত। কিন্তু তারপর আবার শুরু হতো। বর্ডারে ইন্ডিয়ান সোলজার যারা ছিল, তারাও শেলিং করত পাকিস্তানিদের বাংকারে। শেলিংয়ে যখন পাকিস্তানি সেনারা নিরুপায় হয়ে গেল, তখন বোধ হয় তারা পিছনের দিকে হটে গেছে। এই সুযোগে আমরা ভিতরে ঢুকে পড়ি। আমরা ভিতরে ঢুকে পড়ায় খানসেনাদের হাতে আবার আমরা আক্রান্ত হই। আমরা মুক্তিযোদ্ধারা ছিলাম সামনে। পিছনে ছিল ইন্ডিয়ান সোলজার। আমরা সামনে চলে গেছি। পিছনে ইন্ডিয়ান সোলজার। আমরা অলরেডি সম্পূর্ণ ঢুকে গেছি। এ সময় পিছন

দিক থেকে কয়েকটা খানসেনা মেশিনগানের গুলিতে অনেক ইন্ডিয়ান সোলজারকে মারি ফেলাইল। আমরা মুক্তিযোদ্ধারা অনেক আগে চলে গেছি, তাই কেউ মারা যাইনি। মুক্তিযোদ্ধা যারা ছিল তারা কিন্তু তখন কেউ মারা যায়নি। পিছনে ইন্ডিয়ান সৈন্য অনেক ছিল, তারা মারা পড়ল। খানসেনাদের প্রকৃত অবস্থান কেউ জানতে পারে নাই। আমরাও রেকি করার সময় আসলে সঠিক সংবাদ সংগ্রহ করতে পারি নাই।

খানসেনারা কোথায় ছিল?

- ওরা পিছনে একটা বাংকারেই ছিল। ইন্ডিয়ান সোলজার অনেক মারা যাওয়াতে আমরা অন্য দিক দিয়া ব্যাক করে চলে গেলাম আবার ইন্ডিয়া। ওখানে যাওয়ার পর ঘটনা সব খুলে বলা হলো। তখন তারা আবার রেকি করতে পাঠাইল কোন কোন বাংকার থেকে গুলি হলো। যখন সেই বাংকার তারা খুঁজে পাইছে, তখন সেই বাংকারে ইন্ডিয়ান সোলজাররা গরম পানি দিল। গরম পানি দিয়া খানসেনা সবাইকে বাইর করছিল তারা। বাংকারে মেয়েও ছিল ১৪ জন। মেয়েগুলোকে পরে ইন্ডিয়াতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ওই মেয়েগুলোর ওপর খানসেনারা নির্যাতন চালাইত।

আপনার এলাকায় কখন পাকিস্তানিরা আক্রমণ করল?

- আমার এলাকায় পাকিস্তানিরা প্রথম আক্রমণ করছে এপ্রিলের দিকে। ওরা প্রথমে ক্যাম্প করল বিরামপুরে। তারপরে বিজুলে। অনেক পরে করল চরারহাটে। খানসেনারা এদিকে আগেই বাড়িঘর সব পুড়িয়ে দিছে। এলাকায় নারী-নির্যাতন করছিল। আমাদের এখানে চরারহাটে খানসেনারা অনেক লোকজন মারছে। সেটা অবশ্য অনেক পরে। ঘটনার এক দিন আগে আমরা ওখানে একটা অপারেশন করছিলাম। সেটা ছিল বিজুলে। ওখানে আমরা সাতজন খানসেনাকে মারি। খানসেনারা বোধ হয় বিরামপুরের দিকে যাচ্ছিল। আমরা হল্ট করেছিলাম কাঞ্চিঘাট নামের একটা গ্রামে। আমার যে ডেপুটি কমান্ডার ছিল তার বাড়িতে আমরা ছিলাম। আমরা ছিলাম পাঁচজন। পাশের গ্রামে আমাদের আরও মুক্তিযোদ্ধা ছিল। ওরা ছিল বোধ হয় সাতজন। আমরা দুপুরে গোসল করার টাইমে বাহির হইয়া দেখি, খানসেনারা যাচ্ছে। আমাদের কাছে এই সময় হাতিয়ার ছিল না। তখন আমরা গোসল করা বাদ দিয়া চলে যাই, যে বাড়িতে আমরা ছিলাম। ওই বাড়িতে আমাদের হাতিয়ার ছিল। হাতিয়ার আনি [এনে] খালি গেঞ্জি আর হাফপ্যান্ট পরে আমরা রাস্তার ওপরে না উঠে পাশে থাকলাম। তখন ওরা রাস্তা দিয়ে যাইতেছিল। পাঁচজন খানসেনা যাচ্ছে গরুর গাড়িতে, আর দুজন হাঁটি। ওরা গরুর গাড়ি নিয়ে যখন যায় তখন আমরা ওই রাস্তার ধারেই অ্যামবুশ পাতি বসি ছিলাম। ওরা যখন আমাদের

রাইফেলের রেঞ্জের ভিতর আইসে গেছে, তখন আমরা ফায়ার করে দিছি। ফায়ার করার সঙ্গে সঙ্গে একটা খানসেনা কিন্তু ওখানেই পড়ে গেল। আর ছয়জন রাস্তার দক্ষিণ পাশে পজিশন নেয়। পাশেই ধানের জমি ছিল। সেই ধানের জমির ভিতর তারা ঢুকে যায়। তারপর তো গোলাগুলি ওখানে করি। তাদের কিন্তু প্রথমে আটকানো যায় নাই। আমরা ওখানে তো পাঁচজন ছেলে। তারপর কাছেই আমাদের যে ছেলেগুলো ছিল তাদের আমরা খবর দিলাম। আরও মুক্তিযোদ্ধা সেখানে আসলো। ওরা আসার পর চারদিক দিয়া আমরা ওদের ঘিরে ফেললাম। প্রায় এক মাইল দূর দিয়ে আমরা ঘিরে ফেললাম। সাধারণ লোকজনও কিছু আইলো। গোলাগুলি করার পর আমরা ঠিক আসরের টাইমে ওদের পাঁচজনকে ধরি। আর একজন পালাইয়া গেল। আমরা তো ওই পাঁচজন খানসেনাকে মারি ফেললাম। আর আগে তো একটা মারা গেছে। তাদের হাতিয়ারগুলো নিলাম। এরপর আমরা ওখানে আর হল্ট না করে চলে গেলাম চার মাইল দূরে। আমরা মনে করলাম যে রাত্রে এখানে থাকাটা নিরাপদ নয়। কারণ, এখানে যখন খানসেনা মারা হলো তখন তারা তো এ খবর পাবেই। আর একজন তো পালাইয়া গেছে। সে বোধ হয় খবর দেবে। তাই আমরা ওখান থেকে চার মাইল পিছনে চলে গেলাম। পিছনে সরে বৈদেহার গ্রামে শেল্টার নিলাম। বইদেহার গ্রামে আমরা তখন আছি। পরদিন বেলা ১১টার দিকে খবর পাইলাম খানসেনারা সেখানে দুইটা গ্রামের লোককে মারি ফেলছে। ওখান থেকে পালিয়ে যাওয়া এক লোক আমাদের এই খবর দিল।

খানসেনারা সেই দিন কতজনকে হত্যা করেছিল?

- খানসেনারা আমাদের গ্রামের সারাইপাড়াতে মারছে প্রায় ৩৪ জন আর প্রাণকৃষ্ণপুরে মারছিল ৬০ জনের মতো। ওই লোকের কাছ থেকে সব খবর শোনার পর আমি বললাম, তুমি এখানে থাকো, এখন তো দিনের বেলা, এখন আমাদের যাওয়া সম্ভব না, আমরা রাত্রে যাব। তারপর ওই লোকটাকে নিয়া আমরা রাত্রিবেলা আবার ওই গ্রামে গেছি। আমরা তখন ২০-২২ জন ছেলে। গ্রামে গিয়া দেখি গ্রামের অবস্থা করুণ। গ্রামে কোনো পুরুষ লোক নাই। যারা বাঁচি ছিল, তারা ভয়ে পাতারে অর্থাৎ দুই গ্রামের মধ্যবর্তী বিরাট ধানের জমিতে চলে গেছে। তখন দেখি যে ছোট বাচ্চাকাচ্চা আর মেয়েছেলে দুই-একটা আছে। তাদের কাছে শুনি যে আমাদের গ্রামে যাকেই পাইছে, তাকেই খানসেনারা মারছে। তারপর ওখান থেকে চলে আসলাম প্রাণকৃষ্ণপুরে। প্রাণকৃষ্ণপুরে আসি দেখি, এই গ্রামেও কোনো লোক নাই। শুধু মেয়েছেলে আছে দু-একজন। তারা কান্নাকাটি করতেছে। তারা আমাদের দেখে বলল, খানসেনারা মাটি কাটার কথা বলে লোকজনকে নিয়া গিয়া এক জায়গায় বসিয়ে ফায়ার করে মারছে। তাদের

লাশগুলো ওখানেই ছিল। খানসেনারা চলে যাওয়ার পর অন্য গ্রামের লোকজন আইসা পরে তাদের মাটি দিছে। আর যারা আহত হইছিল, তাদের সঙ্গে সঙ্গে ইন্ডিয়াতে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হইছিল চিকিৎসার জন্য।

সেই সময় আপনার পরিবারের কেউ কি শহীদ হয়েছে?

- শহীদ হইছে আমার এক দাদা, নিজের না অবশ্য, সম্পর্কের দাদা। তার নাম হচ্ছে আবদুল গফুর। খানসেনারা তাকে গুলি করে মারছে। আর আমার বাড়ির পাশে আমার এক চাচাতো ভাইকেও খানসেনারা মারছে। যুবকদেরই বেশি মারছে। ১৫ বছরের ওপর যারা ছিল, তাদেরই বেশি মারছে।

খানসেনারা আপনাদের এলাকার মহিলাদের ওপর কি অত্যাচার করেছিল?

- হ্যাঁ, মহিলাদের ওপর অত্যাচার তো করছেই। খানসেনারা মহিলাদের ওপর অত্যাচার করছে অনেক।

আপনার এলাকায় কখন থেকে মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা শুরু হয়?

- এটা জুন থেকেই শুরু হয়। আমাদের ওখানে জুন থেকেই শুরু হয়।

আপনার গ্রাম বা এলাকায় কারা রাজাকার ছিল?

- আমাদের গ্রামে কোনো রাজাকার ছিল না। তবে বোয়ালদায় ছিল।

বোয়ালদায় কে কে ছিল, নাম মনে আছে আপনার?

- একটা নাম আমার মনে আছে। তাকে আমরা ধরছিলাম। ওর নাম গোলজার। তাকে ধরে হাতিয়ারপাতি নিয়া ওকে আবার ছাড়ি দেওয়া হইছে।

এখানে শান্তি কমিটি ছিল কি?

- হ্যাঁ, ছিল। শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান ছিল আব্বাস। ওকে আমরা যুদ্ধের সময় মাইরা ফালাইছি।

যুদ্ধের শেষে গ্রামে ফিরে কী অবস্থা দেখলেন?

- আমি যুদ্ধের শেষে তো গ্রামে আসছিলাম। গ্রামের অবস্থা তো তখন করুণ। বাড়িঘর কারও ছিল না। সব তো পুড়ে শেষ। গ্রামে আসি দেখি কারও হয়তো ছেলে নাই, কারও হয়তো বাবা নাই, কারও হয়তো স্বামী নাই, সে এক করুণ অবস্থা। রাস্তাঘাট নাই, স্কুল নাই। সব ভাঙাচোরা।

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **আবদুল কাইয়ুম**
নভেম্বর ১২, ১৯৯৬

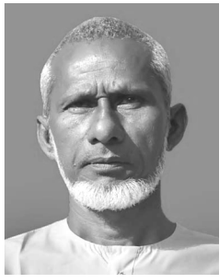

মো. আবদুল খালেক

পিতা : মৃত তোফার উদ্দীন মণ্ডল, গ্রাম : কুশলপুর, ডাকঘর ও ইউনিয়ন : হাবড়া, থানা : পার্বতীপুর, জেলা : দিনাজপুর, শিক্ষাগত যোগ্যতা : এইচএসসি, ১৯৭১ সালে বয়স ১৭ বছর, ১৯৭১ সালে ছাত্র ছিলেন বর্তমানে কৃষিজীবী।

১৯৭১ সালে আপনি কীভাবে মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে জড়িত হলেন?

- ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চে কালরাত্রি নামি আসল। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এ দেশের শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী, ছাত্র সবাইকে হত্যা করা আরম্ভ করল। বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ করতে থাকল। পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর এই অন্যায়-অত্যাচার দেখে আমি তখন নীরব ভূমিকা পালন করতে পারলাম না। ভারতে চলে গেলাম। সেখানে গিয়ে মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে যোগদান করলাম। ওখান থেকে হায়ার ট্রেনিংয়ে চলে গেলাম।

১৯৭১ সালে যুদ্ধ শুরুর পর আপনার এলাকায় কী ঘটল?

- আমার এলাকা হাবড়ায় খানসেনাদের সাথে প্রচণ্ড লড়াই হয়। দুই পক্ষের লড়াই চলে দীর্ঘক্ষণ। হাবড়ায় বহুত লোক মানে বাঙালি আর্মি, ইপিআর, পুলিশ মারা যায়। তারপর অত্র এলাকার লোক পার্বতীপুরে পাকিস্তানি সৈন্যদের ঘেরাও করে। আমরাও তাতে যোগদান করি। পাকিস্তানি সৈন্য আর বিহারিরা আমাদের ওপর গোলাগুলি করে পার্বতীপুর রেলজংশনের ওভারব্রিজের ওপর থেকে। তখন আমরা আর পার্বতীপুর ভিড়তে পারিনি। বাধ্য হয়ে আমরা চলে গেলাম। তারপর পার্বতীপুর থাকি বিহারিরা গ্রামে আইসা অগ্নিসংযোগ আরম্ভ করল। গ্রাম থেকে মেয়েমানুষ ধরে নিয়ে আসা আরম্ভ করল। গরু, বকরি, ছাগল, মহিষ যেখানে যা পালো, তা নিয়ে আসি জবাই করি খাইল। তখন আমি পাকিস্তানি সেনা আর বিহারিদের কাজ-কারবার লক্ষ করে ভাবলাম যে যদি এদের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া না যায়, তা হলে আমরা ভবিষ্যতে এ দেশে টিকতে পারব না। আমাদের কোনো অস্তিত্ব থাকবে না।

সে সময় আপনার এলাকায় পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী কীভাবে আক্রমণ চালাল?

- আমাদের ভবানীপুরে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী একটা ক্যাম্প করছিল। সেই ক্যাম্পে আনাগোনা করত এই দেশের স্বাধীনতাবিরোধী অর্থাৎ দালাল কতকগুলো লোক। তাদের মাধ্যমে পাকিস্তানি সৈন্যরা তথ্য সংগ্রহ করত। এই এলাকায় স্বাধীনতাসংগ্রামী কারা কারা, মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক বা কে পাকিস্তানবিরোধী—এসব খবর নিয়ে পাকিস্তানি সৈন্যরা ওই সমস্ত গ্রামে গিয়ে তল্লাশি করত, বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করত। কারও বাপ-মাকে ধরে নিয়ে আসত। এভাবে নানান অন্যায়-অবিচার তারা করে চলেছিল। পাকিস্তানি সৈন্যদের এই সমস্ত অন্যায় কাজ লক্ষ করে আমি মনে করছিলাম যে, এদের গোলাম হয়ে থাকা যাবে না এবং গোলাম হয়ে আমরা থাকতে পারব না। আর এদের তোয়াজ করেও চলতে পারব না। কাজেই আমাদের সক্রিয় হতে হবে এবং এদের তাড়ানোর ব্যবস্থা নিতে হবে।

১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সেনাদের হাতে কি আপনি ব্যক্তিগতভাবে আক্রান্ত হয়েছিলেন?

- না, আক্রান্ত হইনি।

আপনি কেন মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেন?

- মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার কারণ আমরা বাঙালি। আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরেরা এই দেশে যাতে স্বাধীনভাবে বসবাস করতে পারে, সে জন্য আমাদের সক্রিয় ভূমিকা রাখতে হবে। আমরা নীরব থাকতে পারি না। তা ছাড়া পাকিস্তানিদের অত্যাচারেও আমরা দিশাহারা ছিলাম। এসব কারণে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম।

আপনার এলাকায় কখন থেকে পাকিস্তানিরা আক্রমণ করল?

- এপ্রিল মাস থেকে পাকিস্তানিরা আক্রমণ শুরু করছে।

তারা কীভাবে আক্রমণ শুরু করল?

- ভবানীপুরে তারা ক্যাম্প করেছিল। পার্বতীপুর থেকে ট্রেনযোগে তারা ভবানীপুর আসে। এর পর থেকে ভবানীপুরের আশপাশে হঠাৎ হঠাৎ কোনো গ্রামে গিয়ে গ্রামটা ঘেরাও করত। ঘেরাও করে সেই গ্রামের যুবক ছেলেদের ধরে নিয়ে এসে মারপিট করত। অনেককে জ্বলন্ত বয়লারে ফেলে দিত। এভাবে তারা আমার এলাকার অনেক ছেলেকে নির্যাতন করে নির্মমভাবে হত্যা করেছে।

এই সব নির্যাতন কি আপনি নিজের চোখে দেখেছেন?

- হ্যাঁ, কিছু আমি স্বচক্ষে দেখেছি।

কী দেখেছেন?

- গরুকে যেমন গলায় দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে যাওয়া হয়, সেভাবে বাঙালি যুবক ছেলেদের ধরে দড়ি লাগাইয়ে গরুর মতো তাদেরকে তারা তাঁবুতে নিয়া আসত। তারপর নানা ধরনের নির্যাতন করে তাদেরকে মেরে ফেলত। পাকিস্তানিরা অনেক মেয়েকেও ধরে এনে মারছে।

আপনার কি মনে পড়ে পাকিস্তানি সৈন্যরা আপনার গ্রামের কাদের দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে গিয়েছিল?

- আমার পাশের গ্রামে এক হিন্দু এলাকা ছিল। সেটা চণ্ডীপুর গ্রাম। আমি দেখেছি, সেই হিন্দু এলাকা থেকে কয়েকজন মেয়ে এবং কয়েকজন পুরুষকে তারা গরুর মতো বান্ধি রাস্তা দিয়ে পিডাইতে পিডাইতে নিয়া যাইতেছে। আমি স্বচক্ষে এটা দেখছি। তাদের পার্বতীপুর নিয়ে গেছিল। কিন্তু তারা আর কোনো দিন ফেরত আসে নাই।

পাকিস্তানি সৈন্যরা কতজন লোককে এভাবে নিয়ে গিয়েছিল?

- ৭ থেকে ১০ জন।

পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী আপনার এলাকায় আর কী কী করল?

- আমার বাড়ি থেকে মাইল দুয়েক পশ্চিমে মনোহরপুর গ্রামে তারা একটা অপারেশন করেছিল। খানসেনা আর বিহারিরা সম্মিলিতভাবে অপারেশনটা করেছিল। সেই অপারেশনে তারা দুইজন লোককে জবাই করে হত্যা করেছিল। আর এক স্ত্রীলোকের স্তন তারা কেটে ফেলে। কয়েকজন মেয়েকে তারা অত্যাচার করেছিল। আমার নিজের চোখে আমি এসব দেখেছি।

আপনার পরিবারের কেউ কি শহীদ হয়েছেন?

- না।

আপনার এলাকায় কখন থেকে মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা শুরু হয়?

- মে মাস থেকেই মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা শুরু হয়।

আপনি কখন থেকে মুক্তিবাহিনীতে তৎপরতা শুরু করেন?

- আমি জুলাই মাসে মুক্তিবাহিনীতে যোগদান করি। তারপর ট্রেনিং শেষ করে আবার ব্যাক করি।

আপনার গ্রামে রাজাকার কারা ছিল?

- আমার পার্শ্ববর্তী গ্রাম রসুলপুরে রাজাকার ছিল। আমার গ্রামের বেশির ভাগ যুবক ইন্ডিয়াতে আশ্রয় নিয়েছিল।

স্বাধীনতাবিরোধীদের ধরা হয়েছিল কি?

- হয়েছিল। স্বাধীনতার পর আমরাই ধরেছিলাম। তবে এলাকার লোক হিসেবে আমরা তাদের অনেককে মাফ করে দিয়েছি। আর অনেককে জেলে পাঠিয়েছিলাম।

আপনি কোন এলাকায় যুদ্ধ করেছেন?

- দিনাজপুরের রামসাগর এলাকায় যুদ্ধ করেছি। তা ছাড়া কান্দিরপুর, চকেরদিঘি এলাকায়ও আমরা অপারেশন করেছি। ৭ নম্বর সেক্টরের অধীনে হামজাপুরে আমাদের ক্যাম্প ছিল।

সবচেয়ে ভয়াবহ যুদ্ধ আপনারা কোথায় করেছেন?

- ভয়াবহ যুদ্ধ করেছি রামসাগর ডিফেন্সে। আমরা হায়ার ট্রেনিং শেষ করে ১৩৩ জন সেখানে আসি। তরঙ্গপুর থেকে আমাদের শিফট করা হলো হামজাপুর অপারেশন ক্যাম্পে। সেখানে এক রাতে হল্ট করার পর আমাদের বলা হলো যে রামসাগর ডিফেন্সে টাইগার নামে একটা পার্টি পাকিস্তানিদের সঙ্গে লড়াই করতেছে অনেক দিন যাবৎ, তাদের জায়গায় তোমরা যাও। আমাদের পার্টিটার নাম ছিল স্টুডেন্টস পার্টি। আমরা সব কলেজের ছাত্র ছিলাম। হাইকমান্ড থেকে নির্দেশ এল স্টুডেন্টস পার্টিকে সেখানে পাঠাবার জন্য। আর টাইগার পার্টিকে শিফট বা ক্লোজ করার কথা বলা হলো। প্রধানত পাকিস্তানিদের হয়রানি করার কথা বলা হলো আমাদের। কিন্তু আমরা খানদের খুব একটা হয়রানি করতে পারি নাই। পাকিস্তানি সৈন্যদের ডিফেন্স খুব হেভি ছিল। তারা সবাই বাংকারে ছিল। তাদের কিছু বাংকার ছিল উঁচু মাটির ঢিবির ওপর। বাংকারগুলো পাকা করা। তারপর চারদিকে বালুর বস্তা দিয়ে ঢাকা। সুড়ঙ্গ দিয়ে ওরা বাংকারে ঢুকত। বাংকারের মধ্যে চেয়ার-টেবিল, চৌকি সব ছিল। আমাদের গোলা-বারুদ কোনো কাজ করে নাই। সুড়ঙ্গ দিয়ে ওখানে ঢোকাও যায় না, ওদের মারাও যায় না। তো আমাদেরকে সেখানেই দেওয়া হলো। দেওয়ার দুই দিন পর অর্থাৎ ৪৮ ঘণ্টা পর সেখানে একটা ভয়াবহ ঘটনা ঘটল। সে ঘটনা হলো, আমাদের বেশ পিছনে ২০-২৫টা সাঁজোয়া গাড়ি নিয়ে পাকিস্তানিরা রাতের অন্ধকারে আমাদের ঘেরাও করে ফেলল। তাদের লক্ষ্য ছিল আমাদের পাকড়াও করা। আমরা প্রতি ট্রেঞ্চে চারজন করে ছিলাম। দুজন গুলি চালায় আর দুজন রেস্টে থাকি। এইভাবে গুলি অব্যাহত রাখি। ভোরের সময় দেখি যে কয়েকটা সাঁজোয়া গাড়ি আমাদের পিছনে। আমরা মনে করছিলাম যে এসব ইন্ডিয়ান আর্মির গাড়ি হবে। তারপর ধীরে ধীরে সকাল হলো। সকালে দেখি যে, 'ইয়া আলি' রব তুলে সাঁজোয়া গাড়ি থেকে পাকিস্তানি সৈন্যরা ব্যাঙের মতো লাফিয়ে নেমে আমাদের দিকে ছুটে আসছে। তখন আমরা বুঝলাম যে, এরা সব খানসেনা। কেননা 'ইয়া আলি' রব খানসেনাদের। এটা ইন্ডিয়ান আর্মিদের নয়।

  আমাদের ডিফেন্স ছিল রামসাগরের ৩০০ গজ পশ্চিমে। পাকিস্তানিদের ভাবসাব আমাদের কিছুটা জানা ছিল। তখন আমাদের মধ্যে একটু আতঙ্কের সৃষ্টি হলো। ইন্ডিয়ান আর্মির এক রেজিমেন্টের ২৫-৩০ জন আমাদের পিছনে

ছিল। তারা আমাদের সিকিউরিটি দিচ্ছিল। ওরাই ছিল আমাদের সিকিউরিটি ব্রাঞ্চ। দেখি, ইন্ডিয়ান আর্মির ওই সব সৈন্যকে ধরে পাকিস্তানিরা কারও চোখ বাঁধতেছে, কারও পিছনে হাত বাঁধতেছে। আমরা সব স্পষ্ট দেখতেছি। তখন আমরা মনে করলাম যে ইন্ডিয়ান আর্মিকে যখন এরা পাকড়াও করতেছে, তাহলে এরা সব খানসেনা এবং এরা আমাদেরকেও ধরবে। সুতরাং আমাদের এখন আত্মরক্ষা করতে হবে।

আপনাদের অবস্থান থেকে ভারতীয় ফোর্স কত দূরে ছিল।

- তারা আমাদের কাছ থেকে তিন-চার শ গজ দূরে ছিল। আমরা ভারতীয় ফোর্সসহ পৌনে দুই শয়ের মতো ছিলাম।

সাঁজোয়া যান নিয়ে কতজন পাকিস্তানি সৈন্য আসছিল?

- সাঁজোয়া যান নিয়ে তারা ২০০-র ওপরে আসছিল। যা-ই হোক, পাকিস্তানিরা ভারতীয় সৈন্যদের আত্মসমর্পণ করাল। আমরা যেখানে ছিলাম সেটা ধানের খেত ছিল। তখন আমরা দুইটা গ্রুপে বিভক্ত হয়ে দুই দিকে সরে যাওয়া শুরু করলাম। আমরা ক্রল করে অন্তত ৫০০ গজ চলে গেলাম, দুই দিকে দুই পার্টি। ৫০০ গজ যাওয়ার পর আমরা দৌড় দিলাম। আমরা দুই সাইড দিয়ে ওদের অ্যাভয়েড করে, সাঁজোয়া গাড়িগুলোকে অ্যাভয়েড করে হামজাপুরের দিকে চলে গেলাম।

আপনারা তাদের অ্যাটাক করলেন না?

- তাদেরকে অ্যাটাক করার ক্যাপাসিটি বা হিম্মত তখন আমাদের আর ছিল না।

আপনারা পালিয়ে গেলেন?

- হ্যাঁ, আমরা চলে যেতে বাধ্য হলাম। নইলে সবাই মারা পড়তাম। আমাদের হাতিয়ার-টাতিয়ার সবকিছু ট্রেঞ্চে ফেলে রেখে আমরা চলে গেলাম। এ রকম ভয়াবহ একটা ঘটনা আমার জীবনে রামসাগর ডিফেন্সে ঘটেছে।

এরপর আপনি আর কোথায় যুদ্ধ করেছেন?

- এরপর আমরা ক্যাপ্টেন ইদ্রিসের সাথে চকেরদীঘিতে একটা অপারেশন করি। সেটা খুব বড় ধরনের অপারেশন ছিল।

সেখানে কীভাবে আপনারা যুদ্ধ করেন?

- সেখানে ক্যাপ্টেন ইদ্রিস আমাদের কমান্ডিং অফিসার ছিলেন। উনি ছিলেন আমাদের থেকে ১০০ গজ দূরে। আমরা সংখ্যায় ছিলাম দেড়শোর মতো। আমরা পজিশনে চলে গেলাম। তো কমান্ডিং অফিসার কমান্ড করছেন। ওখানে পাকিস্তানি সৈন্যদের সাথে আমাদের প্রচণ্ড গুলিবিনিময় হয়। ২৪ ঘণ্টা ধরে আমাদের সঙ্গে ফাইট হয়। যুদ্ধে হঠাৎ ক্যাপ্টেন ইদ্রিস গুরুতর আহত হন। ওখান থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা নিজেদের উইথড্র করে আবার হামজাপুরে চলে যাই।

দেশ স্বাধীন হওয়ার সময় আপনি কোথায় ছিলেন?

- দেশ স্বাধীন হওয়ার সময় আমি ছিলাম হামজাপুর ক্যাম্পে। আমি রেস্টে ছিলাম।

মুক্তিযুদ্ধের সময় আপনার সঙ্গীরা কতজন আহত বা শহীদ হয়েছিল?

- বহুত আহত হয়েছিল, বহু শহীদ হয়েছে। তাদের আমরা দাফন-কাফনও করেছি। কিন্তু সংখ্যা বলতে পারব না।

যুদ্ধের শেষে আপনার অস্ত্র কী করলেন?

- যুদ্ধের শেষে আমরা হামজাপুর অপারেশন ক্যাম্প থেকে দিনাজপুরের উদ্দেশে পাড়ি জমাই। ডিসেম্বরের ১৭-১৮ তারিখে আমাদের মাল-সামানা হামজাপুর ক্যাম্প থেকে নিয়া আসছিলাম। আসার পথে অ্যান্টি পারসোনাল মাইনে আমাদের দলের একজনের একটা পা এবং মোটরের একটা চাকা উড়ে গেল। কোনোরকমে আল্লাহ পাক আমাদের বাঁচায়ে রাখলেন। তখন আমরা সেখানে হল্ট করলাম। কারণ, অ্যাডভান্স করা নিরাপদ ছিল না। অর্থাৎ রাস্তা চেক না করা পর্যন্ত আমাদের অ্যাডভান্স করা বিপজ্জনক বলে মনে করলাম। সেখানে তিন দিন হল্ট করে আমরা রাস্তা চেক করি। মানে হামজাপুর থেকে দিনাজপুর পর্যন্ত আমরা রাস্তা চেক করি। বহু অ্যান্টি পারসোনাল মাইন এবং অ্যান্টি-ট্যাংক মাইন আমরা উদ্ধার করি। আমাদের এ বিষয়ে ট্রেনিং নেওয়া ছিল। সেই ট্রেনিং কাজে লাগিয়ে মাইন উত্তোলন করার পর আবার আমরা দিনাজপুর রওনা হই। সেখানে এসে দেখি, প্রতিটা স্কুল-কলেজে আমাদের লোকে ভরে গেছে। কোনোখানে আমরা জায়গা পাইলাম না। তখন আমরা স্টেডিয়ামে ক্যাম্প করলাম। ক্যাম্প ইনচার্জ আমাদের সাথে ছিলেন। আমরা ইনচার্জের কাছে হাতিয়ার জমা দিলাম।

যুদ্ধের শেষে আপনি বাড়ি ফিরলেন কবে?

- দেশ স্বাধীন হওয়ার ১৩ দিন পর। সে সময় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ছিল। দিনাজপুর থেকে আসার ট্রেন ছিল না। বাস ছিল না। রোডের সব ব্রিজ ভাঙা, রেললাইনের ব্রিজও ভাঙা। ফুলবাড়ী এবং ভবানীপুর এলাকার আমরা ১৪-১৫ জন ছেলে ১৫ দিন পর মার্চ করে অন ফুট বাড়িতে আসি।

গ্রামে এসে আপনার গ্রামের অবস্থা কী দেখলেন?

- দেখলাম, অনেক বাড়িঘর ভাঙি গেছে। খানসেনারা অনেক বাড়ি পুড়িয়ে দিছিল। গ্রাম একদম নিশ্চিহ্নের মতো। যুদ্ধে এলাকার বহু লোক হারিয়ে গেছে, মারা গেছে। কারও চোখে পানি, কারও মুখে হাসি।

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **ভবেন্দ্রনাথ বর্মণ**
নভেম্বর ৩০, ১৯৯৬

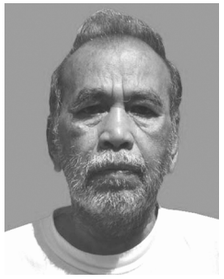

মো. আবদুস সাত্তার

পিতা : আনিতুল্লাহ বেপারী, গ্রাম : রঘুনাথপুর, ডাক : নূরুল মজিদ
ইউনিয়ন : রামপুর, থানা : পার্বতীপুর, জেলা : দিনাজপুর
শিক্ষাগত যোগ্যতা : দশম শ্রেণী, ১৯৭১ সালে বয়স ২২ বছর
১৯৭১ সালে বেকার ছিলেন, বর্তমানে অবসর জীবন যাপন করছেন।

১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে আপনি আক্রান্ত হয়েছিলেন কি?

● না, আমি আক্রান্ত হই নাই। তবে যুদ্ধের সময় বিপদে পড়েছিলাম।

আপনি কীভাবে বিপদে পড়েছিলেন?

● মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার প্রথম অপারেশন ছিল জলপাইতলি পাকিস্তানি সৈন্যদের ক্যাম্প আক্রমণ। সেই অপারেশনে আমাদের দলের প্রায় তিন থেকে চারজন মুক্তিযোদ্ধা মারা যায়। আহত হয় তিন-চারজন। আমি আল্লার রহমতে বেঁচে যাই।

মুক্তিযোদ্ধারা কীভাবে মারা গেলেন?

● শেলের আঘাতে। আমাদেরই শেলিংয়ে। আমাদের পাকিস্তানিদের ক্যাম্প থাকি ৫০০ গজ পিছনে থাকতে বলছিল। আমরা ভুলক্রমে পাকিস্তানি ক্যাম্পের ৫০ গজের মধ্যে চলে গেছি। মানে খানসেনা আর আমাদের মধ্যে ৫০ গজ ডিফারেন্স। রাতের অন্ধকারে আমরা এত কাছাকাছি চলে গেছিলাম যে আমাদের তরফ থেকে ছোড়া শেল আমাদের ওপরই পড়া শুরু হয়।

সেই দিন কি পাকিস্তানি সৈন্য মারা গিয়েছিল?

● ওটা আমরা বলতে পারব না। শেলিংটা তো আমাদের ওপরই পড়েছে। ফলে, আমরা ভ্যাবাচেকা খেয়ে নিজেরাই ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছিলাম। আমরা আর যুদ্ধ করতে পারি নাই।

আপনার এলাকায় পাকিস্তানিরা কখন থেকে আক্রমণ শুরু করে?

● ওটা বোধ হয় মার্চ মাসের শেষের দিকে, তখন থাকেই [থেকেই] আরম্ভ হইছে।

তারা কীভাবে আপনার এলাকায় আক্রমণ শুরু করে?

● পাকিস্তানি সৈন্যরা ট্রেনে করে আইসা যেখানে-সেখানে ট্রেন থামাইয়া মার্চ করে বিভিন্ন গ্রামে যাইত। গ্রামে যাইয়া ঘরবাড়ি জ্বালাই দিত। লোকজন যাকে যেখানে পাইত, গুলি করি মারি থুইয়ে চলে যাইত।

পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে আপনার পরিবারের কেউ শহীদ হয়েছেন কি?

● না, আমার পরিবারে কেউ শহীদ হয় নাই।

আপনার গ্রামের কে কে শহীদ হয়েছেন?

● আবদুর রহীম, নরেন, ফজলুর রহমান, আমার মুক্তিযোদ্ধা ভাই আনোয়ারুল হকসহ আরও কয়েকজন শহীদ হয়েছেন। পাকিস্তানি সৈন্যরা গ্রামে আইসা তাদের গুলি করে মেরে চলে গেছে। আর আনোয়ারুল শহীদ হইছে যুদ্ধে।

আপনার এলাকায় কখন থেকে মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা শুরু হয়?

● পঁচিশে মার্চের পরই এখানকার অল্প কিছু ছেলে ভারত থেকে ট্রেনিং করে আসছিল—সম্ভবত এপ্রিলে। তারপর তারা গেরিলা তৎপরতা শুরু করছিল। তার কিছুদিন পর থেকে পুরো তৎপরতা শুরু হয়।

আপনি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে কখন থেকে তৎপরতা শুরু করেন?

● ওটা এপ্রিল মাসের শেষ থেকে বোধ হয়।

স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় আপনাদের বিরোধিতা করেছিল কারা?

● বিরোধিতা করেছিল রাজাকার আর তাদের দালালরা। তারা হয়তো আমাদের সম্পর্কে পাকিস্তানি সৈন্যদের সংবাদ দিত। রাজাকার-দালালরা সংবাদ দেওয়ার পর খানসেনারা আইসা আমাদের এলাকা ঘিরে ফেলত এবং আরও বেশি অন্যায়-অত্যাচার করত।

আপনার এলাকায় রাজাকার, আলবদর কারা ছিল?

● পাকিস্তানিরা জোর করে রাজাকার বানাইছিল। কেউ কেউ স্ব-ইচ্ছায় হইছিল। তার মধ্যে এখানে ছিল একজন, তার নাম মুসলিম। আর একজনের নাম মনে নাই। খোলাহাটিতে তার বাড়ি ছিল। এদের মেরে ফেলা হইছে।

যুদ্ধের শেষে স্বাধীনতাবিরোধীদের ধরা হইছিল কি?

● হ্যাঁ, ধরা হইছিল।

আপনি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে কোন কোন এলাকায় যুদ্ধ করেছেন?

● পার্বতীপুর থানা এবং বদরগঞ্জ থানায়।

আপনি সবচেয়ে ভয়াবহ যুদ্ধ কোথায় করেছেন?

● আমার ভয়াবহ যুদ্ধ ওই যে বললাম, জলপাইতলি পাকিস্তানি সৈন্যদের ক্যাম্পে। সেটা ফুলবাড়ী থানার মধ্যে। তারপর বদরগঞ্জ থানার সর্দারপাড়া গ্রামে। কে যেন আমাদের খবর জানাইল যে পাকিস্তানি সৈন্য আর রাজাকার আইছে। তখন বিকালবেলা। সত্যি সত্যি তারা আমাদের ঘিরে ফেলে। তাদের সঙ্গে আমাদের

চার-পাঁচ ঘণ্টা লড়াই হয়। একপর্যায়ে তারা পিছু হটে যায়।

আপনারা কতজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন?

● ১৫ থেকে ১৬ জন।

আর কোথায় এ রকম ভয়াবহ যুদ্ধ করেছেন?

● হইছে তো অনেক জায়গায়। খোলাহাটি ব্রিজে একবার হইছিল। খোলাহাটির পূর্ব পাশে একটা ব্রিজ আছিল। সেই ব্রিজে এক রাতের বেলা যুদ্ধ হইছিল। তারপর এইখানে কাশাহার নামে এক জায়গা আছে, সেখানেও যুদ্ধ হইছিল।

দেশ যখন স্বাধীন হয় তখন আপনি কোথায় যুদ্ধ করেছেন?

● সে দিন আমি ফুলবাড়ীতে ছিলাম।

ফুলবাড়ীতে এসে আপনি কী দেখলেন?

● ফুলবাড়ীতে আমরা যখন ঢুকি তখন দেখি খানসেনারা ওই যে ব্রিজ আছে না, সেদিক দিয়ে পিছু হঠতেছে। আমরা মিত্রবাহিনীর সাঁজোয়া গাড়ি এবং ট্যাংকের সঙ্গে আসতেছিলাম। দেখি ফুলবাড়ী স্টেশনে ট্রেন। আমরা অ্যাডভান্স করতেছি। ওই সময় মনে হলো ব্রিজে একটা অ্যান্টি এয়ার ক্র্যাফট গান ফিট করা। সেখান থেকে ভারতীয়রা দুই ভাগ হয়ে স্টেশনের দিকে গেল। আমরাও তখন দুভাগ হইয়া দুই সাইড দিয়া ওই অ্যান্টি এয়ার ক্র্যাফট গানের দিকে ফায়ার করতে করতে গেলাম। গিয়ে দেখি যে, ওটা আসল অ্যান্টি এয়ার ক্র্যাফট গান না। পাকিস্তানি সৈন্যরা একটা ঢেঁকিকে ত্রিপল দিয়া জড়াইয়া অ্যান্টি এয়ার ক্র্যাফট গানের মতো করে রাখছে। ধোঁকা দেওয়ার জন্যই তারা এটা করছে। ফলে আমরা ওখানে অনেক সময় লস করি। এই সময়টুকু আমাদের ওখানে লস হওয়াতে ওরা গিয়ে ট্রেনে ওঠে এবং ট্রেনে করে খানসেনা ও রাজাকার যারা ছিল, তারা চলে যায়। আমরা টাউনে ঢুকে দেখি দোকানপাট সব খোলা; কিন্তু দোকানে লোক নাই। কারও বাড়িতে ঢুকি [ঢুকে] দেখি গোসলখানায় লুঙ্গি আছে, শাড়ি আছে কিন্তু কোনো লোকজন নাই। তারা কে কোথায় গেছে, কারও কোনো পাত্তা নাই। দোকানের মালপত্র ছড়ানো-ছিটানো। সেসব নিচে পড়ে আছে।

যুদ্ধের শেষে আপনি গ্রামে ফিরে আপনার এলাকার অবস্থা কী দেখলেন?

● আমাদের এলাকার বাড়িঘর তো তখন একটাও ছিল না। খানসেনারা সব জ্বালাইয়া-পোড়াইয়া দিছে। জ্বালানোর আগে ঘরের টিনটুন যা পাইছে, সব নিয়া গেছে। বর্ষাতে বাড়ির মাটির দেয়াল সব নষ্ট হইয়া গেছে। মনে হয় কত বছর এখানে কোনো লোক বাস করে নাই! চারদিক ধ্বংসস্তূপের মতো।

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **ভবেন্দ্রনাথ বর্মণ**
ডিসেম্বর ০৫, ১৯৯৬

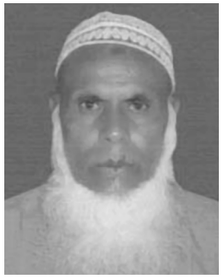

মো. আবদুস সামাদ

পিতা : আলহাজ শফাত আলী মণ্ডল, গ্রাম ডাকঘর ও ইউনিয়ন : খয়েরবাড়ী, থানা : ফুলবাড়ী, জেলা : দিনাজপুর, শিক্ষাগত যোগ্যতা : এইচএসসি, ১৯৭১ সালে বয়স ১৮ বছর, ১৯৭১ সালে ছাত্র ছিলেন বর্তমানে উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক।

১৯৭১ সালে আপনি পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে আক্রান্ত হয়েছিলেন কি?

● না, আমি নিজে আক্রান্ত হইনি। তবে পাশেই তো আমাদের ফুলবাড়ী থানা। ওখানে অহরহ আক্রমণ চলতেছিল। যার জন্য আমরা দেখলাম যে আমরা তো থানার খুব কাছেই আছি। আক্রমণ আমাদের ওপরও হতে পারে। সে জন্য আমরা ভারতে চলে যাই।

আপনি কেন মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেন?

● আমি ইন্ডিয়াতে যাওয়ার পর বহু চিন্তাভাবনা করলাম যে আমাদের দেশ আক্রান্ত হয়েছে। আমরা তো যুবক। দেশের জন্য আমাদের তো কিছু করতে হবে। দেশকে স্বাধীন করতে হবে এবং দেশকে স্বাধীন করতে গিয়ে যদি আমরা মারাও যাই, তবু আমাদের যুদ্ধে যেতে হবে। মৃত্যুকে ভ্রুক্ষেপ না করে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, আমাকে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে হবে এবং দেশ স্বাধীন করতে হবে। তাই মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করলাম।

আপনার এলাকায় পাকিস্তানিরা কখন আক্রমণ করল?

● আমাদের এলাকায় পাকিস্তানিরা আক্রমণ করে এপ্রিলের ৩-৪ তারিখের দিকে। তারা হঠাৎ রাত্রে এসে ফুলবাড়ী আক্রমণ করে। সে সময় পুলিশ-ইপিআর ফুলবাড়ীতে ছিল। তখন তারা (পাকিস্তানিরা) বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং একজন পাকিস্তানি সৈন্য নিহত হয়। সে ধরা পড়েছিল এবং তাকে আমরা মাঠে নিয়া হত্যা করি।

পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী আপনার এলাকায় আর কী কী করল?

- এখানে স্থানীয় যে বিহারিরা ছিল, যাদের জোলা বা ঝোলা বিহারি বলা হতো, তাদের সহায়তায় তারা বিভিন্ন গ্রামে যাইত। লোকজনকে গুলি করে মারত। লুটপাট করত—গরু-ছাগল, বিভিন্ন মাল, টাকাপয়সা। নারী-নির্যাতন আমাদের এই এলাকায় বহু হয়েছে। ঘরবাড়ি তারা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে।

আপনার পরিবারের কেউ শহীদ হয়েছেন কি?

- না, যুদ্ধের সময়ে আমার পরিবারে কেউ শহীদ হয়নি।

আপনার এলাকায় কখন থেকে মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা শুরু হয়?

- আমাদের এলাকায় মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা অগাস্টের প্রথম দিক থেকে শুরু হয়।

আপনার গ্রাম বা এলাকায় রাজাকার কারা ছিল?

- আমাদের এলাকায় রাজাকার ছিল আফাজউদ্দীন মণ্ডল। সে ছিল রাজাকার কমান্ডার। আর কয়েকজন সদস্য ছিল কমান্ডারের সঙ্গে।

শান্তি কমিটিতে কারা ছিল?

- শান্তি কমিটিতে ছিল আমাদের খয়েরবাড়ীর ছবের উদ্দীন মণ্ডল। শান্তি কমিটির যে সদস্য ছিল ফুলবাড়ী থানার, তাঁকে মুক্তিযোদ্ধারা মুক্তিযুদ্ধের সময়ই গুলি করে মেরে ফেলছে।

স্বাধীনতাবিরোধীদের ধরা হয়েছিল কি?

- না। আমাদের এলাকায় যারা রাজাকার ছিল তাদের স্বাধীনতার পর ধরপাকড় করা হয়নি।

মুক্তিযুদ্ধের সময় এখানকার রাজাকাররা কি আপনাদের তেমন ক্ষতি সাধন করেনি?

- আমরা যখন জানতে পারলাম, আমাদের এলাকায় রাজাকার বাহিনী এবং শান্তি কমিটি গঠন করা হয়েছে, তখন আমি নিজেই এলাকায় আসছিলাম। আমার ওপর নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে, রাজাকার কমান্ডারকে মারি ফেলতে হবে। তবে আমাকে এটাও বলা হলো, এলাকায় যাওয়ার পর আপনি বয়স্ক লোকদের কাছ থেকে তার সম্পর্কে খোঁজখবর নিবেন। তার দ্বারা যদি এলাকার মানুষের কোনো ক্ষতি না হয়ে থাকে, তাহলে না মারাটা ভালো। আর যদি দেখেন যে, জনগণের ক্ষতি হচ্ছে, জনগণের ওপর অত্যাচার করতেছে, অসুবিধা সৃষ্টি করছে, তাহলে আপনি অবশ্যই তাঁকে হত্যা করবেন। আমি এখানে আসি [এসে] তার সম্পর্কে খোঁজখবর করে দেখলাম, ভালো ভালো লোকের কাছে, বৃদ্ধ লোকদের কাছে জিজ্ঞাসা করলাম। তারা বলল, এই মুহূর্তে যদি আপনি বা আপনার দল এই কমান্ডারকে মারি ফেলান, তাহলে আমরা আর এখানে বসবাস করতে পারব না। আমাদের এলাকায় অন্যান্য এলাকা থেকেও হাজার পাঁচেক লোক আশ্রয় নিয়েছে। আমাদের তো পালাতে হবেই, ওদেরও চলে যেতে হবে। ওকে মারলে খানসেনারা এসে বাড়িঘর জ্বালি দিবে। এটা না করে বরং রাজাকার কমান্ডারের আশ্রয়ে থাকা

ভালো। কমান্ডার আমাদের সাহায্য করতেছে। আমাদের এলাকায় যাতে পাকিস্তানি বাহিনী বা বিহারিরা না আসতে পারে, সে জন্য কমান্ডারও সজাগ। গ্রামের স্থানীয় মানুষদের সে জন্য সুবিধাই হচ্ছিল। তাই আর তাকে মারা হয়নি।

কোন কোন এলাকায় আপনি যুদ্ধ করেছেন?

- ভারতে ট্রেনিং শেষ হওয়ার পর আমাদের ফুলবাড়ী থানায় পাঠানো হয়। আমাদের বলা হয়, আপনারা ভিতরে কাজ করবেন, ছোটখাটো কাজ করবেন। ব্রিজ-কালভার্ট উড়িয়ে দিবেন। আর মাঝেমধ্যে পাকিস্তানিদের ভীতসন্ত্রস্ত করার জন্য তাদের ক্যাম্পের আশপাশে যাইয়া গোলাগুলি চালাবেন।

পাকিস্তানি সেনাদের সঙ্গে আপনারা কি মুখোমুখি যুদ্ধ করেননি?

- হ্যাঁ, যুদ্ধ করেছি। যে দিন আমরা ইন্ডিয়া থেকে আসলাম, তার আগের দিন আমরা ইন্ডিয়ার ভিতরেই তুলটে ছিলাম। পরদিন আমরা বাংলাদেশের ভিতরে কাজীহালে আসি। সেখানে মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্প ছিল। সে ক্যাম্পে আসার সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানি সেনাদের সাথে আমাদের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এটা আটপুকুরহাটের ওখানে। আটপুকুরহাট খানসেনারা দখল করার জন্য আসে। তখন আমরা তাদের সঙ্গে সকাল নয়টা থেকে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত মুখোমুখি যুদ্ধ করছি। সেই যুদ্ধে বেশ কিছু খানসেনা মারা যায়। আমাদের পক্ষে কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।

সেই যুদ্ধের পর খানসেনারা কি পিছু হটে গিয়েছিল?

- না, তারপর তো রাত হয়ে গেল। তখন ইন্ডিয়ান ক্যাম্প থেকে আমাদের ওপর অর্ডার হলো, তোমরা সব মাল-সামানা নিয়ে ক্যাম্পে চলে আসো। তখন আমরা বাধ্য হয়ে ব্যাক করে ইন্ডিয়ায় চলে যাই। তারপর ওই রাতেই পাকিস্তানি সেনারা আটপুকুরহাট দখল করে এবং পুরো এলাকা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়।

আটপুকুরহাটের পাকিস্তানি ক্যাম্পে পরবর্তী সময়ে আপনারা কি আর আক্রমণ করেননি?

- আমরা যখন ফেরত গেলাম, তখন আমাদের বলা হলো, আপনাদের এই এলাকায় আর থাকা লাগবে না। আপনাদের রেললাইন পার হতে হবে না। তখন আমরা রেললাইনের অপর পারে থাকি। তার আগে আমাদের জলেশ্বরী এলাকায় রাখা হইছিল, যাতে খানসেনারা বর্ডারে না আসতে পারে। খানসেনারা বর্ডার থেকে তিন মাইল দূরে আটপুকুরে ক্যাম্প করে ছিল। ওরা ওই এলাকায় ঢুকতে পারেনি। আমরা সবাই সজাগ ছিলাম। ওখানেও একদিন যুদ্ধ হয়েছিল। সেটা মিরপুরে। সে দিনও বেশ কিছু খানসেনা মারা যায়। তারপর তারা হটে যায়। এরপর তারা আর বর্ডারে আসেনি।

রেললাইন পার হয়ে আপনারা কোথায় ছিলেন?

- রেললাইন পার হয়ে আমরা চলে গেছিলাম চিলাপাড়া। সেখান থেকে পাতলাপাড়া। এই এলাকাতেই আমরা ছিলাম। ক্যাম্প ঠিক না, বাড়ি বাড়ি

ছিলাম। ভাগাভাগি করে। আমরা অনেক মুক্তিযোদ্ধা ছিলাম। ১৪৪ জনের মতো।

এখানে থেকে আপনারা কী করতেন?

- আমরা মাঝে মাঝে রেললাইনে আসতাম, লাইন উড়িয়ে দেওয়ার জন্য। রেললাইনের ব্রিজ উড়িয়ে দিয়েছি। এভাবে তাদের (পাকিস্তানিদের) আমরা তাড়া করতাম। আমরা তো ফ্রন্ট ফাইটার ছিলাম না। তাই সরাসরি যুদ্ধ করতে পারিনি। আমাদের বলা হয়েছিল গেরিলা হিসেবেই যুদ্ধ করার জন্য। আমাদের ওপর সে রকম নির্দেশই ছিল। বলা হয়েছিল, আপনারা খানসেনাদের ওপর অতর্কিত হামলা করবেন, যাতে তারা অসুবিধার মধ্যে থাকে। আমরা কয়েকবার ব্রিজও উড়িয়ে দিছি, রেললাইনও কয়েকবার উড়িয়ে দিছি।

রেললাইন উড়িয়ে দেওয়ার সময় আপনারা বাধাগ্রস্ত হননি?

- না। আমরা তো রাতের বেলা রেললাইন উড়িয়ে দিয়ে চলে আসতাম।

রেললাইন বা ব্রিজে পাহারা থাকত না?

- সব ব্রিজে থাকত না। তারা প্যাট্রোল দিত। এ ব্রিজ থেকে ও ব্রিজে আসা-যাওয়া করত। এই ফাঁকে আমরা কাজ করছি।

সবচেয়ে ভয়াবহ যুদ্ধ কোথায় করেছেন?

- আমরা ভয়াবহ যুদ্ধ ওই দিন করেছি, যে দিন আমরা আটপুকুরহাটে আসি। খানসেনাদের সঙ্গে সামনাসামনি যুদ্ধ করছি। সে দিনটিই আমাদের জন্য কঠিন দিন ছিল। আমরা তাদের সঙ্গে পারব, নাকি মারা যাব, আর ফেরত যেতে পারব কি না, সেটা মনে হয়েছিল।

সে দিন কতজন পাকিস্তানি সেনা মারা গিয়েছিল বা ধরা পড়েছিল?

- যুদ্ধ করার সময় আমরা তেমন বুঝতে পারিনি। তবে আমরা পরে লোকমুখে শুনেছি, সে দিন নাকি তাদের (পাকিস্তানিদের) ২৯ জন হতাহত হয়।

আপনাদের দলের কেউ মারা যায়নি?

- না, আমাদের কেউ মারা যায়নি। আহতও হয়নি। কেননা আমরা গ্রামের ভিতর ধানখেতে ভালো পজিশনে ছিলাম।

কোনো খানসেনাকে ধরতে পেরেছিলেন?

- না, কাউকে ধরতে পারিনি।

খানসেনাদের লাশ?

- না, লাশ আমরা পাইনি। লাশ খুঁজব কেমন করে? পরে তো আমাদের ওপর অর্ডার হলো উইথড্রো হয়ে চলে যাওয়ার জন্য। মালামাল নিয়ে চলে আসার জন্য। এ জন্যই সে সুযোগটা আমরা পাইনি।

আপনারা যে এলাকায় ছিলেন সেখানে আর কী দেখেছেন?

- ওই সময় মানুষের মুখে শুনেছি। মানুষ তো আর বেশি ছিল না। কোনো গ্রামে ছিল, কোনো গ্রামে ছিল না, অল্প কিছু লোক ছিল। তো তারা ভয়ভীতির মধ্যেই

সব সময় থাকত। মাঝে মাঝে পাকিস্তানিরা আক্রমণ করত। লোকজন পালাউড়া করে (পালিয়ে) এদিক-সেদিক চলে যেত। খানসেনারা চলে গেলে আবার আসত। তারা সব সময় ভীতসন্ত্রস্ত থাকত যে, কোন সময় খানসেনারা আসবে! আমরা যখন ওই এলাকায় গেলাম তখন মানুষের ভীতি কিছুটা কমল। তাদের মধ্যে সাহসের সঞ্চার হয়েছে।

এই এলাকায় থাকাকালে আপনারা পাকিস্তানি সেনাদের হাতে আক্রান্ত হননি?

- না, আমরা লাইনের ওপারে যখন ছিলাম তখন আক্রান্ত হইনি। তারা আমাদের সংবাদ পেয়েছে, কিন্তু লাইন অতিক্রম করে আক্রমণ করার সাহস পায়নি। আর অক্টোবরের শেষের দিকে তো খানসেনারাই ভয়ে সন্ত্রস্ত। তাদের মধ্যেই ভয় ছিল যে কখন কোথায় মুক্তিযোদ্ধারা তাদের ওপর আক্রমণ করে বসে। এই ভয়ে তারা ক্যাম্পের ভিতরেই থাকত।

দেশ যখন শত্রুমুক্ত হয় তখন আপনি কোথায় ছিলেন?

- তখন ফুলবাড়ী এবং তার আশপাশের এলাকায় আমরা খানসেনাদের উৎখাতের চেষ্টায় ছিলাম।

তখন কীভাবে যুদ্ধ করেছেন?

- যে দিন খানসেনারা ফুলবাড়ী থেকে উৎখাত হয়, সে দিন আমরা লাইনের ওপারেই ছিলাম। তারপর আমরা তো বুঝতেই পারতেছি মিত্র বাহিনী আমাদের ফুলবাড়ী দখল করতেছে। এটা যখন আমরা জানতে পারলাম, তখন আমরাও ফুলবাড়ীর দিকে এগিয়ে আসলাম। ওই সময় খানসেনারা বিভিন্ন দিক দিয়ে পালাচ্ছিল। আমরা খানসেনাদের এক দলকে আক্রমণ করেছিলাম। তাদের ভারী অস্ত্রশস্ত্র, মেশিনগান ছিল সঙ্গে। এই জন্য আমরা মোকাবিলা করতে সাহস পাইনি। আমাদের তো শুধু রাইফেল ছাড়া আর কিছু ছিল না। তারপর রাতের বেলা তারা বিভিন্ন দিক দিয়ে পালাইয়া যায়। কিছু রাজাকার এবং বিহারিকে আমরা ধরে তাদের গুলি করে মারি।

যুদ্ধের শেষে গ্রামে ফিরে আপনি কী দেখেছেন?

- যুদ্ধের শেষে গ্রামে এসে দেখলাম মানুষের মধ্যে আনন্দের জোয়ার। মানুষ যেন আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেছে। তখন এলাকায় কোনো খানসেনা ছিল না। যারা ইন্ডিয়ায় গেছিল তারা তখনো আসেনি। যারা ছিল তারাই খুব আনন্দ করতেছিল।

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **ভবেন্দ্রনাথ বর্মণ**
অক্টোবর ২৭, ১৯৯৬

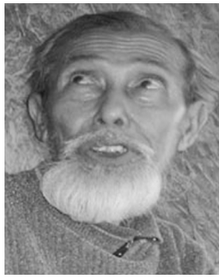

মো. এহিয়া মণ্ডল

পিতা : মৃত ডা. মো. ইব্রাহিম আলী মণ্ডল, গ্রাম : প্রাণকৃষ্ণপুর-চরারহাট
ডাক : পুঁটিমারা, থানা : নবাবগঞ্জ, জেলা : দিনাজপুর
শিক্ষাগত যোগ্যতা : এসএসসি পাস, ১৯৭১ সালে বয়স ৩৫ বছর
১৯৭১ সাল থেকে পল্লিচিকিৎসক।

আপনি কি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন?

● না।

কেন?

● পারিবারিক ঝামেলা ছিল, ছেলেমেয়ে নিয়ে আমার সংসার করতে হয়। আমি সংসারে মূল গার্জিয়ান। আমি যদি মুক্তি হইয়া যাই, আমার সংসারটা দেখে কে?

১৯৭১ সালে আপনি কি খানসেনাদের হাতে আক্রান্ত হয়েছিলেন?

● জি।

কীভাবে আক্রান্ত হয়েছিলেন?

● খানসেনারা হঠাৎ রাত তিনটার সময় আমাদের গ্রাম ঘেরাও করল। ফজরের ওয়াক্তে গ্রামের লোক সবাইকে সমবেত করে বলল যে মাটি কাটতে হবে। এক ব্রিজ ভাইঙ্গে গেছে, ওখানে মাটি কাটতে হবে। আমরা সরল মনে এক জায়গায় জড়ো হলাম। তারপর ওদের ক্যাপ্টেন গ্রামে সার্চটার্চ করল। নারী-নির্যাতন করল, গ্রামে আগুন লাগিয়ে দিল।

এই ক্যাপ্টেনের নাম কি আপনি জানেন?

● জি না। তারপর ওরা গ্রাম সার্চটার্চ কইরা আমরা যেখানে সমবেত হয়েছি সেখানে আইসা বলল, বুড্ডা লোক ভাগ যাও। তো বুড়া লোক কয়েকজন ওখান থেকে উইঠা গেল। তখন ক্যাপ্টেন ফায়ারের অর্ডার দিল। আর বলল, তোমরা কলমা পড়ো। তখন আমরা সবাই জোরে জোরে কলমা পড়তে লাগলাম।

আপনারা মোট কতজন ছিলেন?

● অন্তত ৭০-৮০ জন।

আপনিও ছিলেন ওই দলের মধ্যে?

● হ্যাঁ, আমিও ছিলাম। আমি লাইনের প্রথমেই ছিলাম।

তারপর কী হলো?

● ওরা গুলি করল আমাদের ওপর। এলএমজির গুলি পানির মতন বর্ষণ হতে লাগল। একটা গুলি আমার উরুতে লাগল। আমি সঙ্গে সঙ্গে চিত হইয়া পড়ে গেলাম। আমি ছিলাম আমাশার রোগী। সেই দিনই আমি ভাত খাব, আমার স্ত্রী ভাত রাঁধবে। সেই ভাতটাও আমার খাওয়া হয়নি। আমি পইড়ে গেলাম। তখনো জ্ঞান আছে। আমি উপুড় হইয়া পইড়া গেলাম। পইড়ে যাইয়ে আমার গায়ে চাদর ছিল, তো সেই চাদর মুড়ি দিয়ে চুপচাপ মরার ভান করে থাকলাম। আমার পুরাপুরি জ্ঞান ছিল। আমি মনে করলাম, আমাকে যদি এরা আবার গুলি না করে, তাহলে আমি বাঁইচে যাব। কারণ, আমার শরীরের উল্লেখযোগ্য কোনো জায়গাতে গুলির আঘাত লাগেনি। বেশির ভাগ লোক সঙ্গে সঙ্গে মারা গেছিল। আর যারা গুরুতর আহত হয়েছিল, তাদের কেউ কেউ উঠে দৌড়াদৌড়ি করছিল। মনে হচ্ছিল এটা যেন কোরবানির মাঠ। যারা ছোটাছুটি করছিল তাদের খানসেনারা আবার গুলি করে। সে এক বীভৎস ঘটনা। আহত সবাই বিকট স্বরে আহাজারি আর বাঁচার আকুতি করছিল। সব শুনেছি। আমার জ্ঞান ছিল।

কিন্তু তারা মরে গেল। তারপর ১৫-২০ মিনিট পর, ওরা আবার আমাদের গুনল, মুক্তিফৌজ বলে গুনল। কিন্তু মুক্তিফৌজ আমরা একজনও ছিলাম না। আমরা সব পাবলিক। গুনেটুনে হুইসেল দিয়ে চলে গেল। খানসেনাদের গোলাগুলির পরও আমার মতো কিছু লোক বাঁইচা ছিল। তারাও অন্য লাশের মধ্যে মরার ভান করে পড়ে ছিল। কেউ ভয়ে জ্ঞান হারিয়েছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের গ্রামের আত্মীয়স্বজন দূর গ্রামের লোকজন ছুটে আইলো, আইসা যার যার আত্মীয় বা পরিচিতদের নিয়ে গেল। যারা ওখানে মরে গেল, তাদেরও নিয়ে গেল। তখন তারা কাফনের কাপড় কোথায় পাবেন, কেউ মশারি দিয়ে, কেউ লেপের ওয়ার দিয়ে...।

আপনাকে তখন কে নিয়ে গেল?

● আমার বড় ভাই ও ভাবি। আমাকে পাঞ্জাকোলা করে বাড়ি নিয়ে যায়। নিয়ে যাইয়ে বারান্দায় শোয়ালো। যারা মরে গেছিল, তাদের দাফন করাও ছিল বড় সমস্যা। তহন কাপড় পাওয়া যায় না, খুব দুর্দিন। তখন লেপের ওয়ার, মশারি ইত্যাদি দিয়ে এক এক কবরে চার-পাঁচজন, পাঁচ-সাতজন করে শোয়ায়ে মাটি দেওয়া হইল। সে এক করুণ কাহিনি। এই কাহিনি বলা যায় না।

তারপর আপনার অবস্থা কী হলো?

- আমি তো আহত। আমার ভাই-ভাবি আমাকে নিয়ে যাইয়া উনাদের বারান্দায় শোয়াল। তখন আমি মনে করি, আমি বাঁচব কি বাঁচব না। অনেক আত্মীয়স্বজন আসলো। তারা আমাকে দেখে কান্দাকাটি করতে লাগল। তারপর আমি তিন মাস বেডে ছিলাম।

আপনি কোথায় ছিলেন, বাড়িতেই না কোনো হসপিটালে?

- বাড়িতেই ছিলাম। হসপিটালে যেতে আমার ভয় লাগে। চাঙ্গিত করে নিয়ে যাওয়ার সময় আবার যদি পাঞ্জাবিরা আমাকে গুলি করে। বাড়িতে ডাক্তার ডেকে আমাকে কম্বাইটিং ইনজেকশন করা হইল। প্রায় ২৩টা। তা-ও সারে না। এক ডাক্তার কইল, তোমাকে ইন্ডিয়ার বালুঘর যাইতে হবে। এ কথা শুনে আমার ভয় লাগে। তখন এই এলাকায় এক ডাক্তার ছিল, বদর আলী, উনি আইসে বলল যে কম্বাইটিং দিয়ে সারবে না। একটা ইনজেকশন আছে, জার্মানির, অমনামাইসিন, সেটা দিয়ে দেখা যাক, কেমন হয়। তো অমনামাইসিন ইনজেকশন দেওয়ায় ঘা একটু কমে গেল। তখন আমার একটু আশা জাগল। কয়েকটা অমনামাইসিন ইনজেকশন নিয়ে আমি ভালো হইয়া গেলাম। তবু আমি পুরাপুরি ভালো না। এখনো আমার পা-টা কিছুটা অসাড়, আমি জোর পাই না। সাইকেল রানটান করলে পা-টা আমার অসাড় হইয়া যায়।

সেই দিন কতজন পাকিস্তানি সৈন্য এসেছিল?

- অন্তত ৬০-৭০ জন।

এরা কোথা থেকে এসেছিল?

- ওরা আসছিল মশপুর ঘাট নামে এক ক্যাম্প থেকে।

আপনাদের এই দিকে বা আশপাশে খানসেনাদের কোনো ক্যাম্প ছিল না?

- ছিল, বিরামপুরে। মহেশপুরে ছিল। চৌহার হাটে ছিল।

তারপর আপনি আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে গেলেন?

- সুস্থ হয়ে গেলাম। কিন্তু আমি এখনো শরীরে পূর্ণ বল পাই না। আমার শরীর থেইকা প্রচুর রক্ত পইড়ে গেছে।

সুস্থ হওয়ার পর আপনি কি এখানেই থেকে গেলেন?

- গ্রামেই থাইকা গেলাম। তারপর কিছুদিনের মধ্যেই তো দেশ স্বাধীন হইয়া গেল।

আপনাদের এখানে যে দিন গণহত্যা হয়, সে তারিখটা কি আপনার মনে আছে?

- তারিখ ছিল বাংলা ২৩ আশ্বিন, রোজ রোববার, বেলা ৮ ঘটিকা।

পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী আপনার এলাকায় আর কী কী করল?

- বাড়িঘর জ্বালাইয়া দিল।

আর কী করল?

- নারী-নির্যাতন করল।

আপনাদের এখানে নারী-নির্যাতনও করেছে?

- হ্যাঁ, নারী-নির্যাতন হয়েছে।

কোনো যুবতী মহিলাকে কি এখান থেকে খানসেনারা তুলে নিয়ে গিয়েছিল, সেই দিন বা সেই সময়?

- না।

আপনার পরিবারের আর কেউ কি শহীদ হয়েছেন?

- হ্যাঁ, আমার জেঠাতো ভাই শহীদ হইছে, দুইজন।

কীভাবে শহীদ হয়েছেন?

- ওই দলের ভিতরে, আমি যেখানে ছিলাম তারাও সেখানে ছিল।

সেই দিন আপনার গ্রামের কতজন শহীদ হয়েছিলেন?

- অন্তত ৬০-৭০ জন হবে।

তাদের মধ্যে অন্য গ্রামের কেউ ছিল?

- হ্যাঁ, তারা কয়েকজন ইন্ডিয়াতে যাচ্ছিল মুক্তিফৌজ হওয়ার জন্য। কোনো কারণবশত তারা যাইতে পারে নাই। তারা সেই রাত্রে আইসা তাদের আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে রাতে ছিল। একটা ডিগ্রি পাস ছেলে ছিল। তার বাড়ি বেড়ামালিয়া, বেলাল উদ্দীন তার নাম। সেই ছেলেটার শ্বশুরবাড়ি এখানেই ছিল। তাঁকেও আনি [এনে] মারা হলো। ওয়াহেদ নামের একটা ছেলে ছিল। তাঁর বাড়ি আন্দল গ্রামে। তারপর তোজাম্মেল নামের একটা নয়াপাড়ার ছেলে ছিল। আহমদনগরের সৈয়দ নামে একটা ছেলে ছিল। রেললাইনে কাজ করবে, সেই হিসাবে আসছিল। আইসা তারা আটকা পড়ে গেছিল। তারাও এখানে আইসা মারা পইড়া গেছে।

এখানে যে গণহত্যা হয়, সেখানে মহিলা কয়জন মারা যায় এবং পুরুষ কতজন মারা যায়?

- মহিলা সে দিন একজন মারা যায়।

আর পুরুষ?

- ৭০ জন।

আপনার পার্শ্ববর্তী গ্রামেও কি পাকিস্তানিরা আক্রমণ করেছিল?

- হ্যাঁ, পার্শ্ববর্তী গ্রামেও হামলা করেছিল।

সেইখানে তারা কী করল?

- সেইখানেও তারা ৪০-৫০ জনকে হত্যা করল। যাকে যেখানে পেল সেখানে গুলি করে হত্যা করল মুক্তিফৌজ বলে। আসলে তারা কেউ মুক্তিফৌজ ছিল না। তারা সাধারণ মানুষ ছিল।

আপনার এলাকায় মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা কখন থেকে শুরু হয়?

- ছেলেরা দলে দলে মুক্তিফৌজে যেতে আরম্ভ করল। তারপর জুন-জুলাই মাসে মুক্তিফৌজের তৎপরতা আরম্ভ হয়।

পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী আপনার এলাকায় কখন থেকে আক্রমণ চালায়?

- জুন-জুলাই থেকেই আক্রমণ আরম্ভ করে, বাড়িঘর জ্বালাও-পোড়াও এবং লুটতরাজ শুরু করে।

এখানে যে গণহত্যা হয় তাতে কি রাজাকারদের সহযোগিতা ছিল?

- অবশ্যই ছিল।

তো আপনার এলাকায় বা গ্রামে রাজাকার কারা ছিল?

- আমাদের গ্রামে ছিল না। বাইরের লোকজন রাজাকার ছিল। আফজাল মৌলভি নামে এক লোক রাজাকার ছিল। সে খানসেনাদের ডাকি নিয়ে আসছিল। তার অবশ্য জেলও হয়েছিল। যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।

আপনার এলাকায় রাজাকার, আলবদর, আলশামস কারা ছিল?

- আমাদের এলাকায় ছিল না। দূরে, বহু দূরের গ্রামের ছিল।

এই সব স্বাধীনতাবিরোধীকে যুদ্ধের শেষে ধরা হয়েছিল কি?

- মুক্তিফৌজেরা ধরি মাইরা দিছে তাদের।

যারা বেঁচে গেছে তাদের ধরা হয়েছিল কি?

- তাদের ধরা হয়েছিল। কেস হয়েছিল। আফজাল মৌলভিকে গ্রামের এক লোক ধরেছিল।

তারপর তার কী হলো?

- সে ছাড়া পাইয়া গেছে। শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুর পর তাকে ছাইড়ে দেওয়া হইছে।

আপনি আহত অবস্থায় বাড়িতে থাকলেন, তার কত দিন পর দেশ স্বাধীন হলো?

- তিন মাস পর।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আপনার গ্রামের বা এলাকার অবস্থা আপনি কী দেখলেন?

- করুণ অবস্থা দেখলাম গ্রামে।

কী দেখলেন?

- গ্রামে লোকজন নাই। শুধু ছয়-সাত বছরের ছেলেমেয়ে। বিধবাদের ক্রন্দন। গোটা গ্রামে একটা করুণ অবস্থা। থমথমে ভাব। প্রতি বাড়িতে কান্নার রোল।

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **ভবেন্দ্রনাথ বর্মণ**
নভেম্বর ০৪, ১৯৯৬

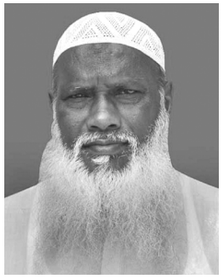

মো. জহুরুল হক সরকার

পিতা : মৃত আলহাজ রফিকউদ্দীন সরকার, গ্রাম : উত্তর সালন্দার
ডাক : সরদারপাড়া, ইউনিয়ন : চণ্ডীপুর, থানা : পার্বতীপুর, জেলা : দিনাজপুর
শিক্ষাগত যোগ্যতা : এইচএসসি, ১৯৭১ সালে বয়স ১৭ বছর
১৯৭১ সালে ছাত্র ছিলেন, বর্তমানে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্তানিদের আক্রমণ সম্পর্কে আপনি কী জানেন?

- ২৫ মার্চ ঢাকায় লোকদের পাকিস্তানিরা অত্যাচার শুরু করে। ছাত্র, সৈনিক, পুলিশ, সাধারণ মানুষ—সবাইকে হত্যা করতে শুরু করে। ঢাকা এবং বিভিন্ন এলাকা থেকে আমাদের এখানে লোকজন আসতেছিল, তখন আমরা তাদের কাছ থেকে শুনতে পেলাম এসব কথা। তারপর তো আমাদের এই এলাকায়ও পাকিস্তানি সৈন্যরা গণহত্যা শুরু করল। তখন আমরা কেউ কেউ ইন্ডিয়া চলি গেলাম। কেউ এখানে থাকলাম। আমাদের এখানে খানসেনা ও বিহারিরা সম্মিলিতভাবে গ্রামগঞ্জে গিয়ে বাড়িঘর পুড়িয়ে দিল এবং গণহত্যা শুরু করল। আমাদের ওপর নিপীড়ন শুরু করে ব্যাপকভাবে।

আপনার এলাকায় পাকিস্তানি সৈন্য এবং বিহারিরা যখন আক্রমণ করে তখন আপনার ভূমিকা কী ছিল?

- সেই সময় আমরা তো তাদের প্রতিহত করার চেষ্টা করছি। আমাদের বন্দুক ছিল। অন্যদের যার যা ছিল তা-ই নিয়ে আমরা শত্রুকে প্রতিহত করার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু আমরা টিকতে পারি নাই।

১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর হাতে আপনি কি আক্রান্ত হয়েছিলেন?

- হ্যাঁ, একবার আমরা তাদের হাতে আক্রান্ত হইছিলাম। তাদের হাতে একদম আটকা পড়ি গেছিলাম। আল্লাহর ইচ্ছা ছিল বলে আমরা হয়তো বেঁচে গেছি।

সেটা কীভাবে?

- মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার পর এই পার্বতীপুর থানাতেই ধবরবাড়ী নামে একটা গ্রাম আছে, সেখানে আমরা খানসেনাদের ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়ি। খানসেনারা চারদিক দিয়া আমাদের ঘিরে ফেলছিল। তার আগের দিন রাত একটা-দেড়টা হবে, আমরা ওইখানে গিয়ে উপস্থিত হই। আমরা দেড়-দুই শ মুক্তিযোদ্ধা ওই গ্রামে রাত কাটানোর জন্য থেকে যাই। সেখানে যাওয়ার পর খানসেনাদের দালালেরা আমাদের হয়তো দেখি ফেলছে। দেখার পরে ওরা রাতারাতি খানসেনাদের খবর দিছে। পরের দিন সকালে উঠি দেখি, আমরা তাদের ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়ি গেছি। ওইখানে তাদের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ করতে হয়। যুদ্ধে আমাদের তিনজন মুক্তিযোদ্ধা মারা যায়। তাদের একজনার নাম আবদুল হামিদ, আরেকজনের নাম আবদুল লতিফ আর তৃতীয়জনের নাম খায়ের। আমরা অবশ্য রাজাকার দুইজনকে ধরছিলাম। ওই রাজাকার দুজনকে মারা হইছে।

আপনি সেখান থেকে কীভাবে রক্ষা পেলেন?

- আমি কোনোমতে ধানখেতের মধ্য দিয়া ক্রল করি, একটা নদী ছিল, সেখানে গেছি। তারপর নদী সাঁতরে পার হয়ে সাধারণ মানুষদের সাথে মিশে গেছি। ওদের সঙ্গে মিশে কোনোমতে জীবন রক্ষা করছি।

আপনি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেন কেন?

- এইটার অনেক কারণ আছে। আমার বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়, পাকিস্তানি সৈন্যরা আমার চাচা, এক ভাই এবং আমার বড় চাচিকে হত্যা করে নির্মমভাবে। ছুরি দিয়ে গলা কেটে হত্যা করে। চাচার নাম ওসিউদ্দীন প্রামাণিক, ভাইয়ের নাম আবদুস সামাদ এবং আমার বড় চাচির নাম শরিফুন্নেসা। তাঁদের সঙ্গে আরও ১৯ জন গ্রামের লোককে একই দিনে পাকিস্তানি সৈন্যরা হত্যা করে।

কীভাবে হত্যা করে?

- তারা ছুরি দিয়ে শুধু গলাটা কেটে দিছে। আমি নিজে চোখে দেখেছি। আমি তখন তো পালিয়ে গেছিলাম। পরে আইসে দেখছি। যাদের মারছে তারা পালাতে পারেনি। তাদেরকে ওরা ধরে ফেলছিল। তাদের ধরে জবাই করে হত্যা করছে।

বাড়িতে, না অন্য কোথাও?

- না, বাড়িতে না। তারা পাটখেতে যাইয়া লুকাইছিল। ওইখানে পাকিস্তানি সৈন্য আর বিহারিরা তাদের ধরে জবাই করছে। এভাবে ১৯ জনকে জবাই করে এক দিনে। তখন আমার মনে হলো, এভাবে এরা নরহত্যা করছে। এভাবে ওরা যদি গণহত্যা করতেই থাকে, তাহলে আইজ বাদে কাইল আমাদেরও মারবে। এভাবে আমরাও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব। কাজেই ওদের হাতে মরার চেয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করি।

আপনার এলাকায় পাকিস্তানি সৈন্যরা কখন আক্রমণ করল?

- পঁচিশে মার্চের পর থেকে। তারা দল বেঁধে গ্রামে গ্রামে যায়। গ্রামে গিয়া রাইফেল দিয়ে গুলি করে। গুলি করে, বোম ফুটাইয়া ওরা আগাইয়া যায় এবং যাওয়ার সময় বাড়িঘরে আগুন দেয়।

পাকিস্তানি সেনারা আপনার এলাকায় আর কী কী করল?

- তারা মানুষ মারল। নারী-নির্যাতন করল। নারী-নির্যাতন বহু করিছে।

নারী-নির্যাতনের ঘটনা কি আপনি দেখেছেন?

- হ্যাঁ। ওই দিন আমাদের এলাকায় পাটখেতে বহু মেয়ের ইজ্জত তারা নষ্ট করিছে। ওরা ধর্ষণ করিছে। ধর্ষণ করার পর তারা কয়েকজনকে মারি ফেলছে।

আপনার গ্রামের কতজন লোক সে দিন শহীদ হয়েছিল?

- আমার গ্রামের ১৯ জন এক দিনেই নিহত হয়েছে। তারপরে আরেক দিন...।

তার মধ্যে আপনার পরিবারের কতজন ছিল?

- আমার পরিবারের তিনজন।

আপনার এলাকায় মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা কখন থেকে শুরু হয়?

- আমরা মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার আগে এখানে বেঙ্গল রেজিমেন্টের কিছু সৈনিক আইছিল। তারা খানসেনাদের সঙ্গে প্রথম লড়াই করে। তারাই প্রথম যুদ্ধ করে। হাবড়ায় করে, আমাদের এখানেও করে। পার্বতীপুরেও করে। তখন আমরা লাঠিসোঁটা, বন্দুক যা আছিল, তাই নিয়া তাদের সঙ্গে ছিলাম। তাদের আমরা হেল্প করছিলাম। কিন্তু পাকিস্তানিদের অস্ত্রের মুখে আমরা তো টিকতে পারি নাই। তখন আমরা পিছিয়ে গেলাম। তারপর ভারতে গেলাম। ভারতে গিয়ে ট্রেনিং নিয়ে আবার আসলাম।

আপনি কখন থেকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তৎপরতা শুরু করেন?

- এখানে গণহত্যা শুরু হওয়ার ১৫-২০ দিন পর আমি ভারতে চলি যাই। ওখানে আমি মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে ভর্তি হই। তারপর ট্রেনিং নিলাম।

ভিতরে প্রথম যুদ্ধ আপনি কোথায় করেন?

- প্রথম যুদ্ধ আমরা করি জলপাইতলি। আমাদের ওপর অর্ডার ছিল ওখানকার পাকিস্তানি ক্যাম্পটা উড়িয়ে দেওয়ার। আমরা যে দিন ট্রেনিং শেষ করে আসি, তার পরের দিন আমাদের বলা হলো যে জলপাইতলিতে আজ অপারেশন হবে। বলাহার থেকে আমরা দুই-আড়াই শ মুক্তিযোদ্ধা একসঙ্গে রওনা দিলাম। রাত প্রায় ১২টা কি সাড়ে ১২টায় আমরা জলপাইতলি পৌঁছলাম। সেখানে আমরা প্রথম ফায়ারিং শুরু করি।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে কোনো রাজাকার, আলবদরকে আপনারা ধরেছিলেন কি?

- হ্যাঁ, যুদ্ধের সময় কয়েক জনকে ধরা হইছিল। ধরার পর গুলি করে মারি দিছি অনেকগুলোকে।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এদের ধরা হয়েছিল কি?

- হ্যাঁ, দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও এদের কয়েকটাকে ধরা হইছে। ধরার পর আমরা প্রথম দিকে দুই-চাইরটাকে মারি দিছি। পরে কয়েকজনকে জেলে পাঠানো হইছে।

আপনি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে কোন কোন এলাকায় যুদ্ধ করেছেন?

- আমাদের এরিয়া ছিল পার্বতীপুর, মন্মথপুর, সৈয়দপুর এবং চিরিরবন্দর—এই চারটা এলাকা।

সবচেয়ে ভয়াবহ যুদ্ধ আপনি কোথায় করেছেন?

- আমরা ভয়াবহ যুদ্ধ করছি দুই জায়গায়। একটা হচ্ছে ওই ধবরবাড়ী। ওখানে আমরা খানসেনাদের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলাম। খানসেনারা আমাদের অ্যাটাক করছিল। ওই টাইমে আমাদের জীবন-মরণের প্রশ্ন দাঁড়াইছিল। সেখানে বড় যুদ্ধ হয়। দ্বিতীয় যুদ্ধ হয় আমাদের মন্মথপুর রেলস্টেশনে। আমরা সেখানে খানসেনাদের অ্যাটাক করি। অ্যাটাক করার আগে সম্পূর্ণ স্টেশন এবং তার আশপাশ আমরা ব্লক করে দিই। তারপর স্টেশন দখল করে ওখান থেকে লাইনটাইন সব তুলে তাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করি দিই। ওই যুদ্ধে কোনো পাকিস্তানি সৈন্য আমরা ধরতে বা মারতে পারি নাই। রাজাকার ধরা পড়ছিল দুইজন। তাদের আমরা ওখানেই গুলি করি মারি দেই। মন্মথপুরের যুদ্ধে কোনো মুক্তিযোদ্ধা মারা যায় নাই। তখন আমরা বহুত শক্তিশালী ছিলাম।

মন্মথপুর স্টেশন আক্রমণ করার সময় আপনাদের মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে কী কী অস্ত্র ছিল?

- আমাদের কাছে টু ইঞ্চ মর্টার ছিল। তারপর এলএমজি, এসএলআর, থ্রি নট থ্রি রাইফেল, স্টেনগান এবং গ্রেনেড ছিল।

আপনারা কতজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন?

- প্রায় দেড় শ।

যুদ্ধের শেষে গ্রামে ফিরে আপনার গ্রামের এবং এলাকার অবস্থা কী দেখলেন?

- এলাকায় দেখলাম মানুষের বাড়িঘর নাই বললেই চলে। তখন গ্রাম বলতে কোনো জিনিস ছিল না। শুধু মাটি। চারদিকে শুধু মাঠ।

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **ভবেন্দ্রনাথ বর্মণ**
নভেম্বর ৩০, ১৯৯৬

মো. জারজিশ আলী

পিতা : মো. আ. রহমান মোল্লা, গ্রাম : রহমতপুর, ডাক : বাদিলাহাট
ইউনিয়ন : বেতদীঘি, থানা : ফুলবাড়ী, জেলা : দিনাজপুর, শিক্ষাগত
যোগ্যতা : অষ্টম শ্রেণী, ১৯৭১ সালে বয়স ৩০-৩২ বছর
১৯৭১ সালে কৃষিজীবী ছিলেন, বর্তমানে চাকরি করেন।

১৯৭১ সালে কি আপনি আক্রান্ত হয়েছিলেন?

- হ্যাঁ, হয়েছিলাম। খানসেনারা জুলুম, অত্যাচার, নারী-নির্যাতন শুরু করল। ফলে তখন আমরা এ দেশে আর টিকতে পারি না। বাংলাদেশ থেকে বহু লোক, বহু নারী-পুরুষ ভারতে অবস্থান নেই। ভারত সরকার এবং বাংলাদেশ সরকার যৌথভাবে বাংলাদেশের যত যুবক ছেলেপেলে আছে, তাদের নিয়ে একটা মুক্তিযোদ্ধা সংগঠন তৈরি করে। তখন বিভিন্ন জায়গা থেকে ছেলে-জোয়ান সকলেই আমরা একত্রিতভাবে রুখে দাঁড়ালাম যে, হ্যাঁ, মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছে। আমরা এখন এই দেশের জন্য জানপ্রাণ দিয়ে খানসেনাদের সঙ্গে লড়াই করব।

আপনি কেন মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেন?

- কারণ আমি, আমার পিতামাতা, ভাইবোন, পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন—সকলেই পাকিস্তানি খানসেনাদের রাইফেলের গুলিতে বিভিন্ন জায়গায় অসহায়ভাবে কুকুর-শৃগালের মতো মারা যাচ্ছি, মারা যাব। আমরা এইটা কোনোক্রমেই সহ্য করতে পারি না। তাই বাংলাদেশকে আমাদের মুক্ত করতেই হবে। রক্ত দিয়ে হোক, জান দিয়ে হোক, ক্ষমতায় গিয়ে হোক, যেকোনো প্রকারে আমাদের দেশকে বাঁচাতেই হবে। যার জন্য আমরা খানসেনাদের সঙ্গে লড়াই শুরু করে দিলাম।

আপনার এলাকায় কখন থেকে পাকিস্তানিরা আক্রমণ শুরু করল?

- ১ এপ্রিল নতুবা এপ্রিলের ২-৩ তারিখ, এই রকমই হবে, খানসেনারা আমাদের এলাকার সম্পূর্ণরূপে দখল করে নেয়।

এরা আপনাদের এলাকায় কীভাবে আক্রমণ করল?

- তারা গাড়ি, মেশিনগান, কামান, বিভিন্ন ধরনের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। দিনাজপুর ডিস্ট্রিক্টের ফুলবাড়ী থানার রহমতপুর গ্রামে আমার বাড়ি। আমার বাড়ির সঙ্গে লাগানো একটি ডাকবাংলা আছে, সরকারি। সে ডাক বাংলাতে এসে তারা অবস্থান নেয়। আমরা বাড়িঘর ছেড়ে আশপাশে চলে যাই। খানসেনারা বিভিন্ন জায়গা থেকে আমাদের গ্রামের মানুষদের ধরে আনার চেষ্টা করে, কিন্তু আমাদের গ্রামের কোনো লোক গ্রামে আর থাকার জন্য আগ্রহ দেখায় না। পাকিস্তানি বাহিনী আমাদের এলাকায় আক্রমণ এমনিভাবে করে যে গ্রামের লোক ছোটাছুটি করে সরে যায়। তখন খানসেনারা বিভিন্ন গ্রাম থেকে লোকজন ধরে নিয়ে আসে। তারপর বিভিন্ন প্রকারে গোলাগুলি চালায় এবং ধরে নিয়ে আসা মানুষদের গাছে লটকিয়ে মারে। বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়, জোয়ান জোয়ান ছেলেদের ধরে নিয়ে এসে রাতের অন্ধকারে গুলি চালায়। আমরা দেখছি যে বহু ছেলে, বহু জোয়ান, বহু নারী এভাবে মৃত্যুবরণ করেছে।

আপনার এলাকায় কি পাকিস্তানি সেনারা নারী-নির্যাতন করেছে?

- পাকিস্তানি সেনাদের দ্বারা আমাদের এখানে নারী-নির্যাতন হয়েছিল।

আপনার পরিবারের কেউ কি শহীদ হয়েছেন?

- আমাদের কেউই শহীদ হয়নি। কারণ, আমাদের বাড়ির পাশেই তাদের অবস্থান ছিল। আমরা বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাই।

আপনার গ্রামের বা এলাকার কোনো প্রতিবেশী তাদের হাতে শহীদ হয়েছেন কি?

- আমাদের গ্রামে মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক ছিল। সে লোকদের খানসেনারা পালাতে দেয়নি। ওরা ২৪ ঘণ্টা তাদের নজরবন্দী করে রাখত। আমাদের গ্রামের কোনো ছেলে মারা যায়নি।

আপনার এলাকায় কখন থেকে মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা শুরু হয়?

- খানসেনাদের বিরুদ্ধে আমাদের যে যুদ্ধ-তৎপরতা শুরু হয়, সেটা এপ্রিলের ১২ থেকে ১৪ তারিখের মধ্যেই হবে। আমার সঠিক খেয়াল নাই। তবে এরই মধ্যে মুক্তিযোদ্ধারা তৎপরতা শুরু করে।

আপনি কখন থেকে তৎপরতা শুরু করেন?

- আমি এপ্রিলের ১১ থেকে ১২-এর মধ্যেই শুরু করেছি।

আপনি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে কীভাবে পাকিস্তানিদের সঙ্গে যুদ্ধ করতেন?

- আমরা তখন হঠাৎ মুক্তিযোদ্ধা হয়েছিলাম। আমরা আগে কোনো যুদ্ধ করিনি বা কোনো ট্রেনিং বা কোনো হাতিয়ার আমাদের ছিল না। কিন্তু খানসেনাদের বিরুদ্ধে যখন প্রতিরোধ-যুদ্ধ শুরু হলো, শুরু হওয়ার পর আমরা মুক্তিফৌজে নাম দিলাম।

পাকিস্তানি সেনাদের সঙ্গে আপনারা কীভাবে যুদ্ধ করতেন?

- আমরা গেরিলাযুদ্ধ করতাম। যেমন, রাতের বেলা অন্ধকারে আসি আমরা তালাশ নিতাম যে খানসেনারা কোথায় আছে, কীভাবে আছে, কেমন করে তাদের মারা যাবে।

আপনি কোন কোন এলাকায় যুদ্ধ করেছেন?

- মোহনপুর ব্রিজ এবং নবাবগঞ্জ, ঘোড়াঘাট—এই এলাকায় ওদের সঙ্গে রাতের অন্ধকারে আমরা লড়িছি। রাতের অন্ধকারে আমরা ঘুরে বেড়াইতাম। আমাদের শুধু একটাই তাল্লাশ হলো যে, তাদের আমরা মারব কীভাবে। আমরা এভাবে গেরিলা পদ্ধতি নিয়ে বেড়াইতাম, যাতে আমাদের ওরা চিনতে না পারে।

আপনি বড় যুদ্ধ কোথায় করেছেন?

- সেইটা হলো এক নম্বরে পাক হিলি।

আপনি হিলিতে কীভাবে যুদ্ধ করেছেন?

- হিলিতে আমরা যুদ্ধ করি রাতের অন্ধকারে। রাত ১০টা থেকে ১১টার দিকে আমরা প্রায় এক ব্যাটালিয়ন মুক্তিযোদ্ধা পাক হিলিতে খানসেনাদের ওপর অপারেশন চালাই। আমরা ৪০০ থেকে ৫০০ ছেলে ছিলাম। আর আমাদের সঙ্গে ছিল ৫০০ থেকে ৮০০-র মতো ইন্ডিয়ান শিখ সৈন্য। যৌথভাবে আমরা পাক হিলিতে অপারেশন করতে যাই। অপারেশন করতে গিয়ে শিখ সেনারা আমাদের প্রথমে বাংলার দিকে পাঠিয়ে দেয় যে খানসেনারা কীভাবে, কী অবস্থায়, কোথায় অবস্থান করে আছে, এইগুলা দেখার জন্য। এইগুলা দেখার জন্য আমরা পাক হিলিতে ঢোকার পরে দেখি, চারদিক স্তব্ধ, কোনো সাউন্ড, কোনো সাড়া-সাবুদ কিছু নাই, না থাকায় আমরা আবার ফিরে গেলাম।

আপনি নিজে ছিলেন সেইখানে?

- হ্যাঁ, আমি নিজে ছিলাম। আমরা আবার ব্যাক করে আসি ভারতের ভিতরে। ভারতের ভিতরে আসার পর আবার যৌথভাবে আমাদের নিয়ে শিখ সেনারা ভারত থেকে বাংলাদেশের দিকে অগ্রসর হয়, সঙ্গে সঙ্গে খানসেনারা তুমুলভাবে গোলাগুলি করতে করতে আমাদের সঙ্গে লড়াই শুরু করল। লড়াইয়ে বেশ কিছু শিখ সেনা মারা যায়। ফলে আমরা ওখান থেকে ব্যাক করে, ওদের সঙ্গে না পারায়, আবার ব্যাক করে ভারতে ঢুকি।

আপনাদের মুক্তিযোদ্ধা কতজন মারা যায়?

- মুক্তিযোদ্ধা সে সময় মারা যায়নি। এই জন্যই মারা যায়নি যে আমরা ছিলাম তাদের পিছে, আর উনারা ছিলেন আমাদের আগে।

আপনাদের কাছে কী কী অস্ত্র ছিল?

- আমাদের কাছে সে সময় ছোট ছোট হাতিয়ার ছিল। যেমন রাইফেল, স্টেনগান, গ্রেনেড।

ভারতীয় ফোর্সদের কাছে কী কী অস্ত্র ছিল?

- ওদের কাছে বড় বড় হাতিয়ার ছিল। মেশিনগান, এলএমজি, এসএমজি, স্টেনগান, বোমা এবং বিভিন্ন ধরনের বড় বড় অস্ত্র ছিল।

সেই দিন ভারতীয় ফোর্স কতজন মারা যায়?

- ভারতের ফোর্স মোটামুটি ভালোই মারা গিয়েছিল।

তারপর আপনারা কী করলেন?

- যখন ভারতীয় সৈন্য মারা যায়, আমরা আবার ভারতে ব্যাক কইরা আসি। ব্যাক করে আসার পরে আমরা চিন্তাভাবনা করলাম যে আমরা আগে যখন গিয়েছিলাম, তখন কোনো সাড়া-সাবুদ হলো না। এখন আবার পাল্টা অ্যাকশন! এটা হলো কেমন করে? কী করে হলো? কী করে পাকিস্তানি সৈন্যরা বুঝল যে আমরা আবার পাল্টা অ্যাকশন নিয়ে বাংলাতে ঢুকছি। যা-ই হোক, পরে আবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো যে হিলিতে চরমভাবে হামলা চালাইতে হবে। চার-পাঁচ দিন পর আমরা ৭০০ মুক্তিযোদ্ধা এবং শিখ সেনাও ছিল ওই রকম হাজার থেকে বারো শ, একত্রিতভাবে আবার সেই পাক হিলিতে ঢুকি, আবার আমরা পাল্টা অ্যাকশন নেই। পাল্টা অ্যাকশনে আমরা ইনশাল্লাহ্ ওখানে জয়ী হয়েছি। জয়ী হয়ে আমরা আবার ব্যাক করে ভারতে ঢুকি।

মোহনপুর এলাকায় আপনি কীভাবে যুদ্ধ করেছেন?

- আমরা ছিলাম ইন্ডিয়ার জাকেরপুর নামে একটা গ্রামে। ওখানে আমাদের একটা ক্যাম্প ছিল। সেটাকে মণ্ডলপাড়া বলত। সেই মণ্ডলপাড়ায় আমরা অবস্থান করতাম বহু মুক্তিযোদ্ধা। ওখানে হঠাৎ একদিন প্রোগ্রাম হলো যে আমরা আজকে দিনাজপুরের বুকে মোহনপুর ব্রিজে অপারেশন চালাব।

কীভাবে অপারেশন চালালেন?

- অপারেশন চালাইলাম, আমরা বেশ কিছু ছেলে ছিলাম। আমাদের সঙ্গে একজন বড় ধরনের অফিসার ছিলেন। আমরা জানতাম যে খানসেনারা এখানে খুব উপদ্রব করে এবং প্রতিটা গ্রামে আগুন লাগায় এবং নারী-নির্যাতন করে। রাত ১২টা-১টার দিকে মোহনপুর ব্রিজের দিকে অগ্রসর হয়ে আমরা আক্রমণ করি।

আচ্ছা, সে দিন আপনাদের কতজন মুক্তিযোদ্ধা নিহত হয়েছিলেন?

- মুক্তিযোদ্ধা একজনও নিহত হয়নি। আমাদের যে বড় অফিসার ছিলেন, শুধু তিনিই মারা যান। উনি কমান্ড করতেন। তাঁর কমান্ড অনুযায়ী আমরা চলাফেরা করতাম। তিনি সামনে ছিলেন। বিভিন্ন সাইড থেকে খানসেনাদের গুলি আসছিল। হঠাৎ একটি গুলি তাঁর শরীরে লাগে।

সেই যুদ্ধে আপনারা কি পাকিস্তানি সেনাদের হটাতে পেরেছিলেন?

- বহুক্ষণ ধরে তাদের সঙ্গে আমরা লড়াই করেছি। লড়াই করার পরে ওরা পালিয়ে যায়। আমরা বহুক্ষণ যাবৎ ওখানে হল্ট করে দেখলাম যে তাদের আর কোনো সাড়া-সাবুত নাই, তারা কোনো গোলাবারুদ ছোড়ে না এবং কোনো গুলিও করে না। আমরা জানতে পারলাম যে তারা এই এলাকা ছেড়ে পালিয়ে গেছে।

সেই যুদ্ধে কোনো পাকিস্তানি সেনাকে আপনারা আহত বা মারতে পেরেছিলেন কি?

- যত দূর আমার ধারণা, নিহত না হলেও দুই, চার কি পাঁচজন তারা আহত হয়েছিল।

মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে কোনো রাজাকার, আলবদর দ্বারা কখনো বাধাগ্রস্ত হয়েছিলেন কি?

- বিভিন্ন জায়গায় রাজাকার, আলবদরদের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছে। জানি না, তারা কে কোন জায়গায় কী করেছে না-করেছে। আমাদের সঙ্গে যেসব রাজাকার, আলবদরের দেখা হয়েছে, তারা সুন্দরভাবে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছে। যেমন ফুলবাড়ীতে আমলঙ্গি নামে একটা নদী আছে, সেই নদীর আশপাশে বহু ছেলের সঙ্গে দেখা হয়, জানতে পারলাম যে, তারা রাজাকার। তারা বলল যে, আপনারা নির্ভয়ে পার হয়ে যান। আমরা তখন নদী পার হয়ে পার্বতীপুরের দিকে অগ্রসর হই। তারা নদীর মধ্যে খাড়া হয়ে এক এক করে প্রতিটা ছেলেকে, আমাদেরকে নদী পার করিয়ে দেয় এবং সুন্দর সহযোগিতা করেছে, এইটুকু আমার জানা আছে। কোনো প্রতিবন্ধকতা তারা সৃষ্টি করেনি।

আপনার এলাকায় রাজাকার, আলবদর, আলশামস কারা ছিল?

- আমাদের এলাকায় যারা রাজাকার ছিল, তারা মোটামুটি ভালোই ছিল। তারা আমাদেরই গ্রামের ছেলে। এরা পালাইতে পারেনি এবং পরে পাকিস্তানিরা তাদের যাইতেও দেয় নাই। সব সময় নজরবন্দীর মধ্যে রাখত। পরে তাদের কেউ কেউ রাজাকার হইছে।

যুদ্ধের শেষে গ্রামে ফিরে আপনার এলাকার অবস্থা কী দেখলেন?

- যুদ্ধের শেষে যখন আমরা গ্রামে ফিরে আসি, তখন দেখি বাড়িঘর কিছুই নাই, শুধু ফাঁকা গ্রাম আর গ্রাম। মুষ্টিমেয় দুই-একটা বাড়ি আছে এবং অল্প কিছু লোক সেখানে বসবাস করতেছে।

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **ভবেন্দ্রনাথ বর্মণ**
নভেম্বর ০৭, ১৯৯৬

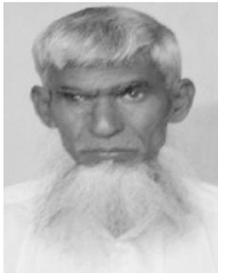

মো. নজরুল ইসলাম

পিতা : মৃত আবদুল কাদের আলী বিশ্বাস, গ্রাম : চৌধুরিয়া
ডাক : কাটলাহাট, থানা : বিরামপুর, জেলা : দিনাজপুর
শিক্ষাগত যোগ্যতা : অষ্টম শ্রেণী, ১৯৭১ সালে বয়স ১৮ বছর
১৯৭১ সালে কৃষিজীবী ছিলেন। বর্তমানে অবসর জীবন যাপন করছেন।

১৯৭১ সালে কি আপনি আক্রান্ত হয়েছিলেন?

● জি, হয়েছিলাম।

কীভাবে আক্রান্ত হলেন?

● যে দিন আক্রান্ত হই সে তারিখটার কথা আমার সঠিক খেয়াল নাই। আমরা তখন মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে বাংলাদেশের ভেতরেই ক্যাম্পে ছিলাম। আমাদের এক গ্রুপ মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্প থেকে নবাবগঞ্জ থানার চরারহাট যায়। সেখানে খানসেনাদের সঙ্গে সংঘর্ষ শুরু হয়। সে স্থান ছিল ডাঙ্গাপাড়া রেলস্টেশন থেকে দুই-তিন কিলোমিটার পূর্বে। আমরা ক্যাম্পে আছি, এমন সময় আমাদের একজন সংবাদদাতা খবর দিল যে চরারহাটে খানসেনাদের সঙ্গে আমাদের মুক্তিযোদ্ধা ভাইয়েরা যুদ্ধ করছে এবং মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দেওয়ার অপরাধে পাকিস্তানি খানসেনারা সেই গ্রামের কয়েক শ নারী-পুরুষকে লাইন করে গুলি করে হত্যা করেছে। সংবাদদাতার কথামতো আমরা ৮-১০ জনের একটি দল সেখানে রওনা দেই। চরারহাট যাওয়ার পথে ডাঙ্গাপাড়া রেলস্টেশনের এক কিলোমিটার দূরে দেখি, কয়েকজন খানসেনা একটি ব্রিজের ওপর টহল দিচ্ছে। আমরা তখন পার্শ্ববর্তী গ্রামে ঢুকি। এ সময় সেখানকার খানসেনাদের সাথে আমাদের সংঘর্ষ শুরু হয়। আমরা দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে খানসেনাদের মোকাবিলা করতে থাকি। এদিকে অন্য স্থান থেকে আরও কিছু খানসেনা এসে ওখানকার খানসেনাদের সাথে যোগ দেওয়ায় তাদের শক্তি বৃদ্ধি পায়। এ সময় আমাদের কমান্ডার মোস্তফা খান বললেন, আমরা যদি খানসেনাদের সঙ্গে ফাইট করতে থাকি, তাহলে পরে আমাদের অসুবিধা হতে পারে। আমাদের গোলাবারুদ এবং অস্ত্রশস্ত্র কম ছিল। তিনি আমাদের নির্দেশ দিলেন, পিছনে হটে আপনারা নিজের নিজের জীবন বাঁচান। তাঁর নির্দেশমতো আমরা ক্রল করে পিছনে হটে আসছিলাম। এ সময় আমরা খানসেনাদের ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়ে যাই। এদিকে আমরা পিছনে মুক্তিযোদ্ধাদের যে পার্টি রেখে গেছিলাম, তারাও শত্রু ভেবে আমাদের ওপর গুলি করছিল। তখন আমরা বিপদে পড়ে গেলাম। আমি কোনোরকমে নিজের জীবন বাঁচাই। দূরে সরে এসে আমার সঙ্গীসাথিদের খোঁজ করতে থাকি। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। সঙ্গীসাথিদের কোনো খোঁজ পেলাম না। পার্শ্ববর্তী মুক্তিযোদ্ধা শিবিরে খবর দেওয়ার পর রাতে অনেক মুক্তিযোদ্ধা সেখানে এল। পরদিন সকাল আট-নয়টার দিকে আমরা তিনজন মুক্তিযোদ্ধার লাশ উদ্ধার করি। শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে আমাদের কমান্ডার গোলাম মোস্তফা খানও ছিলেন। তাঁদের উদ্ধার করে ১০-১১টার দিকে জানাজা পড়ে কবর দিয়ে ওখান থেকে আমরা ক্যাম্পে ফিরে গেলাম।

তিনটা লাশ পাওয়া গেল?

● জি।

আপনারা দুজন বাঁচলেন?

● জি।

আর যারা ছিলেন, তারা?

● যাদের রেখে গেছিলাম পিছনে, তারা তো আগেই ক্যাম্পে চলে গেছিল।

খানসেনাদের হাতে কেউ ধরা পড়েনি?

● ধরা পড়েছিল। যে তিনজন মুক্তিযোদ্ধার লাশ আমরা উদ্ধার করি, তারাই খানসেনাদের হাতে ধরা পড়েছিল। ধরা পড়ার পর খানসেনারা তাদের হত্যা করে। আমাদের কমান্ডার সাহেবও ধরা পড়েছিলেন।

চরারহাটে খানসেনারা কতজন লোককে হত্যা করেছিল?

● আমার ধারণা, ওই দিন না পাঁচ-সাত শ হবে। একটা গ্রামের সব মানুষকেই খানসেনারা হত্যা করেছে।

সেখানে কি কেউ বাঁচেনি?

● বাঁচছে হয়তো। সেটা আমার জানা নেই। তবে বাঁচতে পারে দুই-চারজন।

আপনি কেন মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেন?

● পাকিস্তানিরা আমাদের দেশে সন্ত্রাস দৃষ্টি করে মানুষ হত্যা করছিল, নারীদের ওপর ব্যাপক নির্যাতন করছিল। এই সন্ত্রাসী এবং দুশমনদের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য এবং জাতিকে বাঁচানোর জন্য আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করি।

আপনার এলাকায় পাকিস্তানিরা কখন আক্রমণ করল?

● ১৯৭১ সালের এপ্রিলের দিকে।

তারা কীভাবে আক্রমণ করল?

● খানসেনারা দল বেঁধে আমাদের গ্রাম এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় আসে। ব্যাডারা আগুন ধরাইয়া দিছে বাড়িতে। পেট্রল ঢাইলে আগুন ধরায় দিছে এবং গুলি করে মানুষ মারছে। নানা ধরনের অত্যাচার করেছে।

পাকিস্তানি সামরিক সেনারা আপনার এলাকায় আর কী কী করল?

● নারী-নির্যাতন করেছে এবং লুটপাট করে বাড়িঘরে আগুন দিছে।

পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর অত্যাচারে আপনার পরিবারের কেউ কি শহীদ হয়েছে?

● পাকিস্তানি সেনাদের হাতে আমার এবং আমাদের পরিবারের কেউ শহীদ হয়নি।

আপনার আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী কেউ কি শহীদ হয়েছে?

● প্রতিবেশী একজন শহীদ হয়েছে।

তিনি কীভাবে শহীদ হলেন?

● তারিখটার কথা আমার খেয়াল নাই, এপ্রিল-মে মাসের দিকে হবে। তাঁর নাম ছিল ছাবদের আলী। উনি আমার গ্রাম-সম্পর্কের ভাই হতেন। তিনি একটি স্কুলের শিক্ষক এবং গ্রামের মসজিদের ইমাম ছিলেন। খানসেনারা বিরামপুরে ধরে নিয়ে তাঁকে গুলি করে হত্যা করে।

আপনার এলাকায় কখন থেকে মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা শুরু হয়?

● জুন থেকে।

আপনার এলাকায় রাজাকার, আলবদর, আলশামস কারা ছিল?

● আমার এলাকায় রাজাকার, আলবদর বাহিনী হিসাবে কারা ছিল আমি জানি না। তারা সবাই আমার অপরিচিত ছিল। পরিচিতদের মধ্যে কেউ রাজাকার ছিল না।

আপনি কোন কোন এলাকায় যুদ্ধ করেছেন?

● আমি যুদ্ধ করেছি হাকিমপুর ও বিরামপুর থানা এলাকায়।

হাকিমপুর ও বিরামপুর থানায় কোন কোন এলাকায় যুদ্ধ করেছেন?

● খাট্টা, মাধবপাড়া, দেবখণ্ডা, হরিকৃষ্ণপুর, সাতপুরী, কাটলা, অভিরামপুর, হরিয়ারপুর—এই সব এলাকায় যুদ্ধ করেছি।

এই সমস্ত এলাকার মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ যুদ্ধ আপনি কোথায় করেছেন?

● সবচেয়ে ভয়াবহ যুদ্ধ, যেটা ইতিপূর্বে বলেছি, অভিরামপুর, হরিয়ারপুর এলাকায়।

সেখানে কীভাবে যুদ্ধ করলেন?

● বিরামপুর, অভিরামপুর এলাকায় তৎকালে রাজাকারের নেতা ছিল ফজলের রহমান। আমরা সংবাদ পেলাম, সে তার দলবল নিয়ে কাটলা বাজারে আসবে। আমরা মুক্তিযোদ্ধাদের পুরো দল তাদের মোকাবিলা করার জন্য সেখানে

গেলাম। বাজারের কাছাকাছি যেতেই ওদের সাথে গোলাগুলি শুরু হলো। আমাদের সাথে টিকতে না পেরে রাজাকাররা সেখান থেকে পালিয়ে বিরামপুর চলে যায়। যুদ্ধে আমাদের একজন শহীদ হয়। তার নাম আবদুল খালেক। ঘোড়াঘাটের কটিপাড়ায় তার গ্রামের বাড়ি। কয়েকজন রাজাকারও যুদ্ধে হতাহত হয়। আর একটা বড় যুদ্ধ আমরা করেছিলাম সাতকুড়ি গ্রামে। সেখানে যে রেললাইন ছিল, সেখানে খানসেনারা টহল দিচ্ছিল। আমরা ওদের ওপর ফায়ার শুরু করি। দেড়-দুই ঘণ্টা গুলিবিনিময় হয়। তাদের কী ক্ষতি হয়েছে, সেটা আমরা জানতে পারিনি।

হিলিতে বড় ধরনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। ওই যুদ্ধে কি আপনি ছিলেন?

● জি। ওই যুদ্ধে আমি ছিলাম।

ওই যুদ্ধে আপনি কী দেখেছেন আর কী করেছেন?

● ওই যুদ্ধে আমরা শ তিনেক মুক্তিযোদ্ধা ছিলাম।

আপনারা কীভাবে যুদ্ধ করলেন?

● ভারতের সেনারা আমাদের অর্থাৎ মুক্তিযোদ্ধাদের বলল যে, তোম লোক আগে বাড়ো, যো জোয়ান এফএফ হোতা হ্যায়, উসকো সামনে বাড়াও, হাম লোক পিছে রহে গা। আমরা তাদের নির্দেশমতো আগে বাড়ি। সামনে এগোনোর সময় ফায়ারিং করছি, আর যাচ্ছি। ফায়ারিং হচ্ছে, ফায়ারিংয়ের মধ্যে কে কোথায় যে মরতেছে সঙ্গে সঙ্গে তা উপলব্ধি করা যায় না। আমরা প্রায় ৩০০ মুক্তিযোদ্ধা ছিলাম। তার মধ্যে আমরা এক-দেড় শ জীবিত ছিলাম। আর বাকিগুলান শহীদ হয়।

তাঁরা কীভাবে শহীদ হলেন?

● খানসেনাদের গুলিতে। তারা গুলি করছে, আমরাও গুলি করছি। দুই পক্ষেই ফায়ারিং হচ্ছে। আমরা রেললাইনের পশ্চিম পাশে আর ওরা পূর্ব দিকে। খানসেনারা বাংকারে ছিল। ওদের বাংকার খুব হেভি। আমরা ওপেন ফিল্ডে ছিলাম। এই অবস্থায় যুদ্ধে দুই-আড়াই শ মুক্তিযোদ্ধা মারা গিয়েছিল।

মুক্তিযোদ্ধাদের লাশগুলো কি আপনারা উদ্ধার করতে পেরেছিলেন?

● হ্যাঁ। এই লাশগুলোর বেশির ভাগই আমরা উদ্ধার করেছি এবং ইসলামি শরিয়ত অনুযায়ী যা করণীয়, আমরা তা করেছি।

আপনারা কি সেখানে থেকে পাকিস্তানি সৈনিকদের হটাতে পেরেছিলেন?

● ওখান থেকে আমরা খানসেনাদের ওই দিনই হটাতে পারি নাই। পরে হটানো সম্ভব হয়েছিল।

যুদ্ধ চলাকালে আপনার জীবনে কোনো স্মরণীয় ঘটনা থাকলে বলুন?

● যুদ্ধের শেষ দিকে, সম্ভবত ডিসেম্বর মাসের ৩-৪ তারিখে একদিন আমাদের মুক্তিযোদ্ধা শিবিরের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা নির্দেশ দিলেন যে, তোমার

শ্বশুরবাড়ি খাট্টা হোসনা এলাকার পাশে খানসেনাদের একটা ক্যাম্প আছে। সে ক্যাম্প সম্পর্কে তুমি গোপনে তথ্য সংগ্রহ করে নিয়ে আসো। এটা হাকিমপুর থানার ভিতরে। খানসেনারা আমার শ্বশুরবাড়ির পাশেই ছাটনিতে ক্যাম্প করেছিল। একজন মুক্তিযোদ্ধাকে সঙ্গে নিয়ে আমি আমার শ্বশুরবাড়িতে গেলাম। আমাদের দেখেই আমার শ্বশুরবাড়ির লোকজন খুব ভয় পেল। তখন আমি তাদের বললাম, আপনাদের কোনো ভয় নাই। আমি আপনাদের মারতে আসি নাই। আপনারা আমাকে সহযোগিতা করেন। তারা বলল, কী সহযোগিতা আমরা করতে পারি। তখন আমি তাদের বললাম, ছাটনি গ্রামে খানসেনারা যে ক্যাম্প করেছে, সে সম্পর্কে আমাকে তথ্য এনে দেন। আমার শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়রা তখন বলল, ঠিক আছে, আপনি কয়েক দিন এখানে থাকেন, আমরা তথ্য সংগ্রহ করছি। তিন-চার দিন আমরা ওখানে ছিলাম। শেষ দিন আমরা দুজনও খানসেনাদের ক্যাম্পের কাছে যাই। তখন খানসেনারা কীভাবে যেন জেনে গেল, সেখানে আমরা গিয়েছি। ওরা তখন গুলি করতে থাকে। আমরা দুজনও পাল্টা গুলি করতে থাকি। আমাদের কাছে স্টেনগান, গ্রেনেড ছিল। ওদের সাথে যুদ্ধে টিকতে না পেরে আমরা দুজন কখনো ক্রল করে, কখনো দৌড়ে পিছনে হটে আসছিলাম। এমন সময় মাইনের আঘাতে আমি আহত হই। খানসেনারা এই মাইন পুঁতে রেখেছিল। আমার ডান হাতে, বুকে এবং চোখে আঘাত লাগে। সঙ্গী মুক্তিযোদ্ধাদের কিছু হয়নি। সে আমাকে শ্বশুরবাড়িতে নিয়ে আসে। শ্বশুরবাড়ির লোকেরা স্থানীয় ডাক্তার ডেকে নিয়ে এসে আমাকে দেখায়। কয়েক ঘণ্টা পর আমি মনে করলাম, এখানে আমার থাকা সম্ভব নয়। আমি পাকিস্তানি বাহিনীর আয়ত্তের মধ্যে আছি। তখন আমি বললাম যে, আমাকে মুক্তিযোদ্ধা শিবিরে পৌঁছে দেওয়া হোক। তারাই আমার ব্যবস্থা করবে। তারপর আমাকে মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে যাওয়ার সময় আমি জ্ঞান হারাই। পরে শুনেছি, এরপর আমাকে চিকিৎসার জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছে হস্তান্তর করা হয়। তারা তাদের হাসপাতালে চার-পাঁচ দিন চিকিৎসা করে এবং সেখানে আমার ডান হাত কেটে ফেলে। এরপর আরও উন্নত চিকিৎসার জন্য আমাকে ভারতের উত্তর প্রদেশে পাঠানো হয়। সম্পূর্ণ সুস্থ হতে আমার আরও কয়েক মাস সময় লেগেছিল।

আপনি কখন বাংলাদেশে ফিরে আসেন?

- '৭২ সালের অক্টোবরের দিকে ঢাকায় আসি।

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **ভবেন্দ্রনাথ বর্মণ**
অক্টোবর ২২, ১৯৯৬

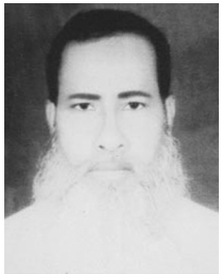

মো. মকবুল হোসেন সরকার

পিতা : মৃত খেজামুদ্দীন সরকার, গ্রাম : ভাটপাইল, ডাক : নন্দীগ্রাম হাইস্কুল
ইউনিয়ন : বেতদীঘি, থানা : ফুলবাড়ী, জেলা : দিনাজপুর, শিক্ষাগত
যোগ্যতা : এইচএসসি, ১৯৭১ সালে বয়স ১৯ বছর
১৯৭১ সাল থেকে শিক্ষকতা করছেন।

আপনি মুক্তিযুদ্ধে কেন অংশগ্রহণ করলেন?

- পাকিস্তানি সেনাদের বর্বরতা দেখে আমার মনে খুব ঘৃণা জন্মে এবং আমি শরণার্থী শিবিরে পালিয়ে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে দেশে আসার পর খানসেনারা আমাকে ধাওয়া করে। তখন থেকে আমার মনের ভিতর ঘৃণা জন্মেছিল যে আমি ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবই এবং নিজের জীবনের বিনিময়ে হলেও আমি আমার দেশকে মুক্ত করব। এই জন্যই আমি মুক্তিবাহিনীতে নাম দিয়েছিলাম।

১৯৭১ সালে আপনি কি পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে আক্রান্ত হয়েছিলেন?

- হ্যাঁ, যুদ্ধের সময় হয়েছিলাম।

আপনি কীভাবে আক্রান্ত হয়েছিলেন?

- আমি রসুলপুর থেকে আমার দল নিয়ে ফুলবাড়ী থানার পূর্ব দিকে তেঁতুলিয়া-মহেশপুর গ্রামে আসছিলাম, পথে আক্রান্ত হই।

তখন আপনি মুক্তিযোদ্ধা হয়ে গেছেন?

- হ্যাঁ, মুক্তিযোদ্ধা হয়ে গেছি। বাংলাদেশের ভিতরে তেঁতুলিয়া-মহেশপুর এলাকায় ক্যাম্প করার জন্য আমার ওপর নির্দেশ ছিল। ক্যাম্প করে ওখান থেকে আমরা বিভিন্ন জায়গায় অপারেশন করব। আসার পথে মাঝপথে মাদুলি হাটের পশ্চিম-উত্তর দিকে রাজাকাররা আমাদের ধাওয়া করে। দুইজন

মুক্তিযোদ্ধা ও একজন ভলান্টিয়ারকে রাজাকাররা ধরে ফেলে। আমি ও তাহের উদ্দীন, আমরা দুইজন পালিয়ে যাই।

সেই সময় আপনাদের কাছে কোনো অস্ত্র ছিল না?

- আমাদের কাছে অস্ত্র ছিল। কমান্ডার হিসেবে আমার কাছে একটা স্টেনগান ছিল। আর সকলের কাছে গ্রেনেড ছিল। যা বলছিলাম, আমরা তখন পালিয়ে গেলাম এবং দূর থেকে আমরা সন্ধান নিতে শুরু করলাম যে আমাদের সহযোদ্ধাদের রাজাকাররা কী করে! কিন্তু বহু চেষ্টা করেও তাদের আমরা আর উদ্ধার করতে পারি নাই।

আপনি তখন শত্রুর মোকাবিলা করলেন না কেন?

- তখন সম্ভব হয় নাই। যেহেতু তাদের কাছে বহু আগ্নেয়াস্ত্র ছিল। আমার কাছে ছিল শুধু একটা স্টেনগান। সে জন্য কিছু করা সম্ভব ছিল না।

আপনার যে তিনজন সহযোদ্ধা ধরা পড়ল, তাদেরকে তারা কোথায় নিয়ে গেল?

- আমরা জেনেছি যে তাদেরকে চিন্তামনে খানসেনাদের ক্যাম্পে নিয়ে যায়। তারপর আমরা রাত্রে চলে গেলাম আমাদের গন্তব্যস্থলে। পরের দিন সেখান থেকে আমরা দুইজন ভারতের বরাহার যাই। সেখানে আমাদের ক্যাম্প ছিল। ভারতীয় ক্যাপ্টেন এসএস বাথ ক্যাম্প কমান্ডার ছিলেন। তাঁর কাছে আমি রিপোর্ট দেই।

রিপোর্ট দেওয়ার পর কী হলো?

- তারপর ওখান থেকে ঘুরে আসার পর শুনি, শফিউদ্দীনকে খানসেনারা হত্যা করেছে। সে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা ছিল না। সে আমাদের ভলান্টিয়ার ছিল। আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করত, গাইডের কাজ করত। আমরা লোক মারফত জানতে পারলাম, তাকে খুবই টর্চার করেছে এবং তার নিজের হাত দিয়েই তার কবর খুঁড়িয়ে নিয়েছে। তারপর তার চোখ দুটো উপড়ে নিয়ে তাকে জীবিত অবস্থায় খানসেনারা কবর দিছে। এভাবে অত্যাচার করে তারা তাকে নির্মমভাবে হত্যা করে।

একজনকে জীবন্ত অবস্থায় পাকিস্তানি সৈন্যরা কবর দিল আর দুইজনের কী হলো?

- আর দুইজন মুক্তিযোদ্ধাকে পায়ে দড়ি লাগায়ে ওই দামারপারার এক পুকুরের পাড়ে একটা নিমগাছে লটকায়ে গুলি করে হত্যা করে। তাদের একজনের নাম গণেশ আর একজনের নাম মংলা।

মংলা ও গণেশের বাড়ি কোথায় ছিল?

- গণেশের বাড়ি ছিল জিয়োত গ্রামে আর মংলার বাড়ি শাবাজপুরে।

আপনার এলাকায় পাকিস্তানিরা কখন আক্রমণ করে?

- আমার এলাকায় পাকিস্তানিরা আক্রমণ করেছিল মে-জুনের দিকে। তখন থেকে

আমাদের এলাকায় খানসেনাদের ক্যাম্প তৈরি হয়।

তারা কীভাবে আক্রমণ করল?

- তারা এসে অগ্নিসংযোগ করত এবং যাকে যেখানে নাগালের মধ্যে পাইত, তাকেই গুলি করত।

পাকিস্তানি সৈন্যরা আর কী করল?

- নারী-নির্যাতন করছে, গুলি করে অনেক মানুষ মাইরে ফেলছে। এমনকি আমি মুক্তিযোদ্ধা হওয়াতে এবং আমার বাড়ির সকলে শরণার্থী হওয়ায় আমার বাড়ি সম্পূর্ণরূপে তারা ধ্বংস করে ফেলে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আমি বাড়িতে আইসে সমস্ত বাড়ি নতুন করে করেছি। এখনো পর্যন্ত আমি সেই বাড়ি সমাপ্ত করতে পারিনি।

যুদ্ধকালে আপনার পরিবারের কেউ কি শহীদ হয়েছেন?

- আমার পরিবারের কেউ শহীদ হয় নাই।

আপনার গ্রামের কেউ কি শহীদ হয়েছে?

- আমার পার্শ্ববর্তী পাড়ার একজন শহীদ হয়েছে। সে মুক্তিযোদ্ধা ছিল।

তার নাম কী?

- তার নাম ছিল আবদুল জব্বার।

সে কোথায় যুদ্ধ করতে গিয়ে মারা যায়?

- ত্রিশূলাতে, দিনাজপুরের কাছে।

আপনার এলাকায় মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা কখন থেকে শুরু হয়?

- আমরা শিলিগুড়ি থেকে ট্রেনিং নিয়ে ফিরে আসার পর মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা জোরদার হয়।

সেটা কোন মাস থেকে?

- সেইটা সেপ্টেম্বর মাস থেকে।

আপনার এলাকায় রাজাকার কারা ছিল?

- আমাদের এখানে ছিল না। রাজাকার মাদুলিহাট এবং চিন্তামনে অনেকেই ছিল। সকলের নাম জানি না। সেই সময় অবশ্য সবার নাম জানা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তবে যে গণেশ আর মংলাকে ধরেছিল, তার নাম ছিল মনসের। সে রাজাকারের লিডার ছিল।

আপনার এলাকায় আলবদর, আলশামস কারা ছিল?

- গঙ্গাপুরের আইজউদ্দীন চেয়ারম্যান ছিল, নজিবর চেয়ারম্যান ছিল। এরা খানসেনাদের সব সময় সহযোগিতা করত।

শান্তি কমিটিতে কারা ছিল?

- শান্তি কমিটিতে যে ছিল সে তো মারাই গেছে। যেমন আবদুল ডাক্তার ছিল নন্দীগ্রামের।

স্বাধীনতাবিরোধী রাজাকার-আলবদর যারা বেঁচে ছিল তাদের ধরা হয়েছিল কি?

- তাদেক ধরা হয় নাই।

আপনি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে কোন কোন এলাকায় যুদ্ধ করেছেন?

- আমি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রথমে তেঁতুলিয়া এবং মহেশপুরে কাজ করেছি। তারপরে দুই মুক্তিযোদ্ধা এবং এক ভলান্টিয়ার ধরা পড়ার পর আমাকে ফ্রন্ট ফাইটে দেয়। ত্রিশূলা, বড়শিদীঘি, এসব এলাকায় আমি যুদ্ধ করি।

এটা কোন থানার অধীন?

- মনে হয় চিরিরবন্দরের ওই দিকে।

ত্রিশূলা, বড়শিদীঘি দিনাজপুর ডিস্ট্রিক্টের চিরিরবন্দর থানার মধ্যে?

- হ্যাঁ, দিনাজপুর ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে। তারপরে আবার খোলাহাটিতেও আমাকে পাঠায় আরকি। ওখানেও ছিলাম আমরা।

সবচেয়ে ভয়াবহ যুদ্ধ আপনি কোথায় করেছেন?

- আমি তো প্রথম গেরিলা ছিলাম। ভয়াবহ যুদ্ধ অনেক জায়গায় হয়েছে। তার মধ্যে যেমন বড়শিদীঘিতে হয়েছে, ত্রিশূলাতে হয়েছে, খোলাহাটিতে হয়েছে এবং লালপুর মাঠে হয়েছে।

আপনি লালপুর মাঠে কীভাবে যুদ্ধ করেছেন?

- এক বর্ষার দিন রাত্রিতে আমরা তেঁতুলিয়া-মহেশপুরে আসব। আমরা রাত্রিতে চলাফেরা বেশি করতাম। তো আমরা খয়েরবাড়ীতে নদী পার হওয়ার পর সামনে যাচ্ছি, সে সময় ওই একই রাস্তা দিয়ে খানসেনারা আসতেছিল। আমরা তাদের সাড়া পেয়ে পজিশন নেই এবং ওরা যখন আমাদের রেঞ্জের মধ্যে আসে, তখন আমরা তাদের ওপর ফায়ার শুরু করি। সেখানে নয়জন খানসেনা মারা যায় বলে জেনেছি। এরপর পাকিস্তানি সৈন্যরা তল্লাশি শুরু করে। তখনই আমরা পাশে নিচু ধানখেতের মধ্যে ঢুকে পানির মধ্যে নাকটা শুধু বাইর করে দিয়ে থাকি নিঃশ্বাসটা নেওয়ার জন্য, যাতে তারা আমাদের দেখতে না পারে। ধানখেতে বেশ পানি ছিল। ফলে তারা আমাদের ধরতে পারেনি।

তারা কি সংখ্যায় বেশি ছিল?

- হ্যাঁ, সংখ্যায় বেশি ছিল। আমরা মাত্র ১০-১২ জন ছিলাম। তাই তাদের সঙ্গে আর মোকাবিলা করা সম্ভব হয় নাই।

আপনি আর কোথায় এ রকম অপারেশন করেছেন?

- তারপর তিলবাড়ী থেকে বেতদীঘির মাঝপথে, সেখানেও আমাদের যুদ্ধ হইছে। সেখানেও আমরা কয়েকজন খানসেনাকে মাইরে ফেলছি। তারপরে রশিদপুরে যুদ্ধ হইছে। সেখানেও কয়েকজন খানসেনাকে মাইরে ফেলছিলাম কাউন্টার অ্যাটাকে।

আপনাদের এই ফুলবাড়ী এলাকা যখন শত্রুমুক্ত হয় সে সময় আপনি কোন এলাকায় ছিলেন?

- যখন ফুলবাড়ী মুক্ত হয় তখন আমি ছিলাম খোলাহাটিতে। আমাদের কাছে রেডিও ছিল, আমরা জয় বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে শুনতে পাই যে আজ ফুলবাড়ী মুক্ত হইছে; তখন আমরা ওখানে আনন্দ-উল্লাস করি।

আপনি খোলাহাটি থেকে ফুলবাড়ী কবে এলেন?

- ফুলবাড়ী আসছি সেই দিন, যে দিন পার্বতীপুর মুক্ত হয়। পার্বতীপুর মুক্ত হওয়ার পরে যখন পার্বতীপুর থেকে ভবানীপুর পর্যন্ত সম্পূর্ণ এলাকা মুক্ত হয়, তখন আমরা পার্বতীপুর হয়ে ফুলবাড়ীতে আসি।

পার্বতীপুরে গিয়ে আপনি কী দেখলেন?

- পার্বতীপুরে গিয়ে দেখি, বিভিন্ন প্রকার জিনিসপত্র রাস্তার চতুর্দিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে। তখন আমি মুক্তিযোদ্ধাদের এক কাতারে লাইন করাই। লাইন করার পর আমি ফার্স্ট লিডার হিসেবে সবার পিছনে ছিলাম। সেকেন্ড লিডার ছিল সামনে। মাঝখানে ছিল থার্ড লিডার। এদের এক লাইন করে রাস্তা দিয়ে আনি। সকলকে আমি নির্দেশ দিয়েছিলাম যে, হেলাদুলা করবে না বা কোনো জিনিস নিবে না। যারা এ কথা মানবে না তাদের আমি গুলি করব। এইভাবে আমি তাদের এক লাইনে নিয়ে আসছিলাম মহেশপুরে গফুর প্রফেসরের বাসায়।

তারপর?

- আমরা ওখানেই শুনতে পাইলাম যে বাংলাদেশ স্বাধীন হইছে এবং জয় বাংলার পতাকা উড়ছে। খানসেনারা আত্মসমর্পণ করছে। আমি তখন পার্টি ক্লোজ করে দিয়ে বলাহার ক্যাম্পে আসি।

ফুলবাড়ীতে আপনি ঢোকেন নাই?

- ফুলবাড়ী ঢুকছি।

ফুলবাড়ী ঢুকে কী দেখলেন?

- ফুলবাড়ী ঢুকে দেখলাম, সেখানেও বিভিন্ন প্রকার জিনিসপত্র এলোমেলোভাবে রাস্তায় পড়ে আছে। ফুলবাড়ীর সব বাসা ভাঙচুর অবস্থায়। কিছু বাসায় অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। আওয়ামী লীগের কর্মীরা আমাদের সহযোগিতা করল। মুজাফফর ডাক্তার ছিলেন। তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করলাম। কাইয়ুম ডাক্তার ছিলেন। তাঁর সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করলাম। এরপর আমরা চলে গেলাম।

কোথায় গেলেন?

- গেলাম আমরা বলাহার।

বলাহার ক্যাম্পে গিয়ে আপনি কী করলেন?

- বলাহার ক্যাম্পে গিয়ে ক্যাম্প ইনচার্জের সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি

আমাদের ছুটি দিলেন। তারপর অস্ত্র জমা দেওয়ার নির্দেশ হলো। আমরা অস্ত্র জমা দিলাম।

তারপর সেখান থেকে আপনি কি গ্রামের বাড়িতে ফিরে এলেন?

● হ্যাঁ, গ্রামের বাড়িতে ফিরে আসলাম।

বাড়ি ফিরে এসে আপনার গ্রামের অবস্থা কী দেখলেন?

● গ্রামের অবস্থা খুবই দুঃখজনক। কারও ছেলে মারা গেছে, কারও বাবা মারা গেছে, কারও মা মারা গেছে, কারও স্ত্রী মারা গেছে, কারও স্বামী মারা গেছে। অসুখ-বিসুখ, ডায়রিয়া, কলেরা বিভিন্নভাবেও অনেক লোক মারা গেছে। একদিকে দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণা, অন্যদিকে দেশ স্বাধীন হওয়ার আনন্দ।

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **ভবেন্দ্রনাথ বর্মণ**
ডিসেম্বর ১২, ১৯৯৬

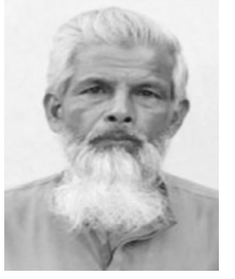

মো. মতিউর রহমান

পিতা : মৃত শরিফউদ্দীন মণ্ডল, গ্রাম : রতনপুর, ডাক : বিরামপুর
ইউনিয়ন : খানপুর, থানা : বিরামপুর, জেলা : দিনাজপুর, শিক্ষাগত যোগ্যতা : এইচএসসি, ১৯৭১ সালে বয়স ১৬ বছর
১৯৭১ সালে ছাত্র ছিলেন, বর্তমানে কৃষিজীবী।

আপনাদের এলাকাতে কী ঘটেছিল?

● ফুলবাড়ী থেকে বিহারি এবং কিছু পাকিস্তানি সেনা আমাদের এলাকায় একদিন দিনের বেলা আসে। তারা এমনভাবে আক্রমণ করল যে, ওই দিন আমাদের এলাকা রতনপুরের পূর্ব পাশে একটা বন ছিল, সেই বনে আশ্রয় গ্রহণকারী প্রায় ৫০-৬০ জন লোক মারা গেল। আমি এ ঘটনার সময় দৌড়াদৌড়ি করে বেঁচে গেছিলাম। নওয়াবগঞ্জ থানার দিকে আমার এক আত্মীয়ের বাড়ি ছিল, সেই আত্মীয়ের বাড়িতে আমি পালিয়ে জীবন বাঁচাইছিলাম। পরে আইসা এসব দেখছি।

এই ৫০-৬০ জন লোক কি সবাই আপনার এলাকার?

● তারা মূলত আমাদের এলাকার। তবে অন্য এলাকা থেকেও লোকজন আসছিল। কিন্তু তাদের সংখ্যা আমার জানা নেই। এ ভয়াবহ দৃশ্য দেখে আমার খুবই খারাপ লাগছিল। ভয়ও পাইছি খুব। তার পরও আমি কিছুদিন আমাদের গ্রামেই ছিলাম। ওরা শুধু লোক মারেনি, পরবর্তী সময়ে আমাদের গ্রামটাকে সম্পূর্ণরূপে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে একবারে ছারখার করে দিছিল। ভিটাবাড়ি ধ্বংস করে দিছিল। খানসেনা এবং জোলা বিহারিরা আমার এক বড় ভাই, তার নাম ছিল আবদুস সামাদ এবং আমার চাচা কায়েমউদ্দীনকে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে যায়। তাদের নিয়ে যাওয়ার পর আজ পর্যন্ত তাদের

আর কোনো খোঁজখবর আমরা পাইলাম না। তাদের কোনো হদিসই নাই। কিছুদিন পর আমিও তাদের হাত থেকে বাঁচি গেছি। সামান্যের জন্য তারা আমাকে ধরতে পারেনি। তখন আমার মনে হলো যে যদি মরতেই হয় তবে এভাবে আমি মরতে রাজি নই। বড় ভাইকে ধরে নিয়ে গেল। চাচাকে নিয়ে গেল। আমার নিজের পরিবারের বেশ কিছু আত্মীয়স্বজনকে তারা গুলি করে মারল। হয়তো আমাকেও ধরে নিয়ে যেত। মরলে ঠিক মরার মতো মরব। তখনই আমি প্রতিজ্ঞা করলাম যে মুক্তিযুদ্ধে আমি যোগ দেব এবং এলাকাতে আসি যেন তাদের ওপর প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারি। এই নিয়তে আমি মুক্তিযোদ্ধা হলাম।

মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আপনি কি কখনো আক্রান্ত হয়েছিলেন?

● হ্যাঁ, আক্রান্ত হইছিলাম।

কোথায় কীভাবে আক্রান্ত হইছিলেন?

● আমি মুজিব ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ নিছিলাম। তারপর ওখান থেকে দেওয়ানগঞ্জ হয়ে আমরা ডোমারে আসি। এটা নীলফামারীতে। পথিমধ্যে গোমনাতী নামক এক স্থানে আমাদের গোটা দলটা, যে দলে প্রায় ১৫০ জনের মতো ছিলাম, তারা সবাই গোমনাতীতে অবস্থান করি। আমাদের সঙ্গে ছিল সামান্য কিছু গোলাবারুদ—রাইফেল আর মাত্র ১০-১২ রাউন্ড করে গুলি আরকি! যুদ্ধ করার মতো কোনো প্রস্তুতি আমাদের ছিল না। গেরিলা হিসেবে কাজ করব—এমন ধারণা ছিল। এদিকে আমাদের এই অবস্থানের সংবাদ কোনো এক লোক হয়তো নীলফামারীর পাকিস্তানি সেনাদের ক্যাম্পে কিংবা অন্য কোনো ক্যাম্পে পৌঁছে দেয়। তখন নীলফামারী থেকে খানসেনারা আইসে আমাদের ওপর আক্রমণ করে। তাদের সঙ্গে মোকাবিলা করার মতো কোনো গোলাবারুদ আমাদের ছিল না। আমাদের কোম্পানি কমান্ডার ছিলেন সম্ভবত মেজর চৌহান। তিনি বললেন যে, আমরা যদি তাদের সঙ্গে এখন মোকাবিলা করতে যাই, তা হলে স্বল্প গোলাবারুদে সেটা হবে না। তাদের সঙ্গে মোকাবিলা করার শক্তি আমাদের নাই। আমাদের পিছনে সরে যাওয়াই হয়তো ভালো হবে। তখন আমরা সেখান থেকে পিছনে হটে একদম ভারতের হলদিবাড়ীতে চলে গেলাম। আমাদের জিনিসপত্র অন্য এক জায়গায় ছিল। নয়জন মুক্তিযোদ্ধা সেগুলো পাহারা দিচ্ছিল। তাদের বলারও সুযোগ আমরা পাইনি। আমরা সরে যাওয়ার পর নীলফামারী থেকে আসা খানসেনা, বিশেষ করে যারা রাজাকার হইছিল, তারা 'বাংলাদেশ' স্লোগান দিয়া আমাদের ওই নয়জন ছেলেকে বিভ্রান্ত করে কৌশলে ধরে নিয়া যায়। তারা আমাদের জিনিসপত্রগুলো নিয়া গেছিল। পাকিস্তানি সেনারা সেসব

মালপত্র বিহারিদের মধ্যে ভাগাভাগি করে দিছিল। আর ওই নয়জন মুক্তিযোদ্ধাকে নির্মম নির্যাতন করে পরে গুলি করে হত্যা করে। তাদের এমনভাবে পিটানো হইছিল যে, তাদের গোটা শরীর একেবারে রক্তাক্ত হইয়া গেছিল। আমরা পরে এই সংবাদ পাই। এরপর রাত্রে আমরা পুনরায় একত্র হয়ে খানসেনাদের অ্যাটাক করি। খানসেনারা সমস্ত রাত আমাদের সঙ্গে মোকাবিলা করার পর ভোরের দিকে ভেগে যায়। খানসেনারা ওখান থেকে সরে যাওয়ার পর আমরা তাদের ডিফেন্সে ঢুকে দেখি যে, আমাদের ছেলে নয়জনকে নির্মম নির্যাতন করে মারা হয়েছে।

আপনার এলাকায় পাকিস্তানিরা কখন আক্রমণ করে?

● আমাদের এখানে এক ধনী হিন্দু ভদ্রলোক ছিলেন। উনার বাড়িতে বিহারি এবং তাদের কিছু বাঙালি সহযোগী লুটতরাজ করতে আসছিল। আমাদের গ্রাম থেকে কিছু লোক ওই লুটতরাজে বাধা দেওয়ার জন্য গেছিলেন। এই বাধা দেওয়াটাই হইছিল আমাদের জন্য অপরাধ। ওই বাধার কারণে লুটতরাজ করতে না পেরে তারা ফুলবাড়ীতে ফিরে যায়। পরে সেখান থেকে পাকিস্তানি সেনা এবং আরও বেশি বিহারি সঙ্গে করে নিয়ে এসে তারা আমাদের গ্রামের ওপর আক্রমণ চালায়। সেটা সম্ভবত এপ্রিল মাসের শেষের দিকে। ওই দিন তারা আমাদের গ্রামে ব্যাপক আক্রমণ করে। তাদের সে দিনের সেই আক্রমণে আমাদের গ্রামের ৫০-৬০ জন লোক মারা যায়। ওই আক্রমণের পরের দিন আবার আমাদের এলাকায় জমিদার হিসেবে পরিচিত রুক্মিণীকান্ত সরকারের বাড়িতে হামলা চালানো হয়। তিনি অনেক আগেই ভারতে চলে গেছিলেন। তার বাড়ি লুটতরাজ করার জন্য বিভিন্ন এলাকা থেকে কিছু লোকজন আসছিল। সে সময় আমরাও ছিলাম না। ওই মুহূর্তে ফুলবাড়ী থেকে কিছু খানসেনা ও বিহারি আবার আমাদের গ্রামের ধান, চাল এবং বিভিন্ন মালামাল লুট করার জন্য আসছিল। আসার সময় তারা দেখে যে রুক্মিণী জমিদারবাড়ি লুট হচ্ছে। পাকিস্তানি সেনা ও তাদের দোসররা ঘেরাও করে ওই সব লুটেরাকে ধরছিল। এই সব লোককে দিয়েই পাকিস্তানিরা আমাদের গ্রামের বিভিন্ন বাড়ি থেকে বহু দামি জিনিসপত্র লুটতরাজ করে গরু এবং মোষের গাড়িতে বোঝাই করে নিয়ে যায়। পাকিস্তানিরা যাওয়ার আগে লুটেরাগুলোকে আমার চাচা মোহাম্মদ আফাজউদ্দীন মণ্ডল সাহেবের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে নির্মমভাবে জবাই করে। মোট নয়জন লুটেরা ছিল। আমরা রাতে আত্মীয়স্বজনের বাড়ি থেকে নিজেদের বাড়ি দেখার জন্য ফিরে আসি। আসি দেখি যে এই লোকগুলোর সবাই জবাই করা অবস্থায় পড়ে আছে। এদের মধ্যে একজন লোক তখনো

জীবিত ছিল। পরবর্তী সময়ে লোকটাকে চিকিৎসা করাবার জন্য গ্রামের লোকজন ধামজুড়ি মিশন হসপিটালে নিয়ে যায়। কিন্তু সে লুটেরাদের দলের লোক হওয়ায় হসপিটাল কর্তৃপক্ষ তাকে ভর্তি করেনি। তারা বলে যে, একে বালুরঘাটে নিয়ে যাও। বালুরঘাটে নিয়ে যাওয়ার পথে ওই লোকটাও মারা যায়। লোকটা ছিল আমাদের পাশের তেঁতুলডাঙ্গা গ্রামের।

এরা লুট করার জন্য আসছিল?

- হ্যাঁ, এরা সবাই লুট করার জন্য আসছিল।

আবার এদেরই পাঞ্জাবিরা হত্যা করেছে?

- হ্যাঁ, ওই নয়জন লুটেরা বাঙালিকে বিহারি এবং খানসেনারা আমার চাচার বাড়িতেই জবাই করেছিল।

আপনাদের এলাকায় মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা কখন থেকে শুরু হয়?

- জুন-জুলাইয়ের দিকে।

মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আপনি কখন থেকে তৎপরতা শুরু করেন?

- আমার এলাকায় খানসেনা আর বিহারিরা বাড়িঘর সব জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দিল। লোকজন মারল। এর পূর্বে অবশ্য আমরা মুক্তিযোদ্ধা হওয়ার জন্য ততটা তৎপর হইনি। এই ঘটনাগুলো স্বচক্ষে আমরা দেখি। খানসেনা আর জোলা বিহারিদের দাপটে এলাকায় থাকা যেত না। তারা মাঝে মাঝেই আসত। জানের ভয়ে আমরা দৌড়াদৌড়ি করে বিভিন্ন জায়গাতে গিয়ে লুকিয়ে থাকতাম। পরবর্তী সময়ে আমি নিজেও তাদের শিকার হইছিলাম। তাদের হাতে আমি একদিন আক্রান্ত হয়েছিলাম। কীভাবে যেন আল্লাহ আমাকে বাঁচাইছেন। তার পরই আমি প্রতিজ্ঞা করলাম যে আমাকে মুক্তিযোদ্ধা হতেই হবে। যে দিন খানসেনা আর বিহারিদের হাত থেকে দৈবক্রমে বেঁচে যাই, সে দিন থেকে পুরাপুরি আমি নিয়ত করলাম যে এভাবে আর এখানে থাকা যাবে না। তাদের হাতে যদি মরতেই হয় তো প্রতিশোধ নিয়েই মরব। তার পরই আমি ট্রেনিং নিতে ভারতে চলে যাই। ট্রেনিং শেষ হওয়ার পরই তৎপরতা শুরু করি। সঠিক মাসটার কথা মনে পড়ছে না।

আপনার গ্রাম বা এলাকায় রাজাকার-আলবদর কারা ছিল?

- আমার জানামতে, পাকিস্তানি সেনাদের বা বিহারিদের সাহায্যকারী হিসেবে এই গ্রামের কোনো লোক সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেনি।

আপনি যে এলাকায় ছিলেন সেই এলাকার স্বাধীনতাবিরোধীদের ধরা হয়েছিল কি?

- হ্যাঁ, ধরা হয়েছিল এবং আমি নিজ হাতেও অনেককে শাস্তি দিছি। আমি প্লাটুন কমান্ডার ছিলাম। স্বাধীনতার পরও ডিমলা থানাতে আমাকে রাখা হইছিল। সেখানে কয়েকজনকে আমি ধরছিলাম এবং তাদের অনেককে গুলি

কইরে মারা হইছে। গণি নামের এক চৌকিদারকে সেখানে গুলি করে মারা হইছিল। সে পাকিস্তানিদের খুবই সহযোগিতা করেছিল। তার পরও দেখা গেছে যে, অনেক রাজাকার, আলবদর বিভিন্ন জায়গায় আত্মগোপন অবস্থায় আছে। আমরা কয়েকবার তাদের বাড়িতে এবং তাদের আস্তানায় হামলা করার পরও তাদের ধরতে পারিনি।

আপনি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে কোন কোন এলাকায় যুদ্ধ করেছেন?

- আমাদের প্রথম দেওয়ানগঞ্জ হয়ে বাংলাদেশের ভেতর ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। তার পর থেকে ডোমার, গোমনাতী, নীলফামারী, ডিমলা, জলঢাকা, কিশোরগঞ্জ—এসব এলাকাতেই আমি বেশি ছিলাম এবং শেষে সৈয়দপুরের আশপাশে। সৈয়দপুরের দিকে আসার সময় দেশ স্বাধীন হয়ে যায়। তারপর সেখান থেকে আমাদের আবার পিছু হটে নীলফামারী হসপিটালে ক্যাম্প করে রাখা হয়।

আপনি সবচেয়ে ভয়াবহ যুদ্ধ কোথায় করেছেন?

- সবচেয়ে ভয়াবহ যুদ্ধ করেছি ডোমারে।

কীভাবে যুদ্ধ হয়েছিল?

- সেখানে আমরা খানসেনাদের সঙ্গে মুখোমুখি যুদ্ধ করেছিলাম এবং ওই যুদ্ধে আমাদের বহু ছেলে শহীদ হয়।

সেই যুদ্ধে কতজন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হয়েছিলেন?

- আমরা কয়েক শ মুক্তিযোদ্ধা ছিলাম। বেশ কিছুসংখ্যক মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হয়েছিলেন ওই যুদ্ধে। সঠিক সংখ্যা জানা নেই।

ওই যুদ্ধে কতজন খানসেনা নিহত হয়?

- ওই যুদ্ধে আমরা কিছু পাকিস্তানি সেনা মারছিলাম মনে হয়। তারা আমাদের আক্রমণে পর্যুদস্ত হয়ে যখন টিকতে পারেনি, তখন তারা ডোমার থেকে নীলফামারীতে হটে আসছিল।

যুদ্ধ শেষ হওয়ার কত দিন পর আপনি গ্রামে ফিরেছিলেন?

- যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে সৈয়দপুর থেকে আমাদের ব্যাক করে নীলফামারীতে নিয়ে যাওয়া হয়। নীলফামারী হসপিটালে ক্যাম্প করে আমাদের রাখা হয়। ওখান থেকে পরে আমার প্লাটুন নিয়ে আমি ডিমলা থানাতে যাই। ডিমলা থানার বাবুর হাটের ওখানে। ডিমলা থানাকে কন্ট্রোল করার জন্য আমার প্লাটুনটাকে ওখানে পাঠানো হইছিল। ওখানে আমি বেশ কয়েকজন রাজাকার এবং খানসেনাদের যারা সহযোগিতা করছিল, তাদের ধরছিলাম। ওখানে আমি মাস খানেক ছিলাম। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও আমি বাড়িতে না আসায় আমার বাবা-মা এবং আত্মীয়স্বজন যারা ছিল, তারা অত্যন্ত চিন্তিত

ছিল। তারা ভাবছিল যে আমি হয়তো যুদ্ধে মারা গেছি। প্রায় দেড় মাস পর আমি বাড়িতে আসছিলাম আরকি।

আপনি বাড়ি এসে আপনার গ্রামের অবস্থা কী দেখলেন?

- এসে দেখি যে বাড়ি নাই বললেই চলে। খানসেনা আর বিহারিরা আমাদের গ্রামটা তো জ্বালিয়েই দিছিল। দু-একটা বাড়ি কোনো রকমে টিকে ছিল। লোকজন বিভিন্নভাবে, মানে বেড়াটেড়া দিয়ে কোনো রকমে মাথা গুঁজে অবস্থান করতেছিল।

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **ভবেন্দ্রনাথ বর্মণ**
ডিসেম্বর ০৩, ১৯৯৬

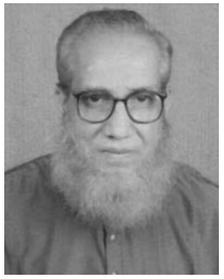

মো. মহসীন আলী চৌধুরী

পিতা : মৃত নিজামউদ্দীন চৌধুরী, গ্রাম : ভেরম, ডাক : জামগ্রাম
ইউনিয়ন : কাজীহাল, থানা : ফুলবাড়ী, জেলা : দিনাজপুর
শিক্ষাগত যোগ্যতা : দশম শ্রেণী, ১৯৭১ সালে বয়স ২৪ বছর
১৯৭১ সালে সৈনিক ছিলেন, বর্তমানে কৃষিজীবী।

আপনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে কীভাবে জড়িত হলেন?

- আমি পাকিস্তানি আর্মির একজন সৈনিক ছিলাম। ১৯৭০ সালে নির্বাচনের পর যখন দেশে আন্দোলন শুরু হয়, তখন আমি পাকিস্তানের লাহোর থেকে দুই মাসের ছুটিতে ঢাকা এসেছিলাম। এ সময় আমি দেশের বাড়িতে অবস্থান করি। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্তানিরা বাঙালিদের ওপর হামলা শুরু করে। যুদ্ধ শুরুর পর থার্ড বেঙ্গলের একটা অংশ ক্যাপ্টেন আনোয়ারের নেতৃত্বে সৈয়দপুর থেকে ফুলবাড়ীতে আসে। এই সংবাদ পেয়ে আমি সেখানে আসি। ফুলবাড়ীতে ক্যাপ্টেন সাহেবকে সংবাদ দেওয়া হলো যে রংপুরের বদরগঞ্জ গোডাউনে খাদ্য আছে। পাকিস্তানি সেনারা ওই গোডাউন দখল করে নিলে খাদ্যের অভাবে বাঙালিরা মারা যাবে। পাকিস্তানি সেনারা যাতে ওই গোডাউন দখল করতে না পারে, সে জন্য ওখানে যেন থার্ড বেঙ্গলের সৈনিকেরা যায়। তখন ক্যাপ্টেন আনোয়ারের নির্দেশে কিছু সৈনিক ওখানে যায়। আমিও তাদের সঙ্গে ছিলাম। কিন্তু আমরা ওখানে পৌঁছানোর আগেই খানসেনারা গোডাউনটি দখল করে নেয়। তাদের সাথে আমাদের গোলাগুলি হয়। তাদের সঙ্গে না পারায় আমরা ওখান থেকে পিছনে হটে আসি। আমাদের সাথে ক্যাপ্টেন আনোয়ার সাহেবও ছিলেন। তিনি নেতৃত্ব দেন। যুদ্ধের সময় তাঁর ডান হাতে গুলি লেগেছিল। ফলে আমরা ওখান থেকে ফিরে

এসে ফুলবাড়ী থেকে আবার হিলি হয়ে কামারপাড়ায় ঢুকি। এভাবেই আমি মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে জড়িত হলাম।

১৯৭১-এর মার্চে যুদ্ধ যখন শুরু হলো তখন আপনার এলাকার মানুষের মনোভাব কী ছিল?

- আমার এলাকার লোকজন ভীতসন্ত্রস্ত ছিল। সবাই চিন্তাভাবনা করছে যে আমরা এখন কী করব? আমাদের বাড়ির কাছেই ছিল ভারত। যুবক ছেলেপেলেরা ভারতে চলে যাচ্ছিল। বাংলাদেশে খানসেনারা মেরে ফেলবে। ভারতে গিয়ে কিছু ট্রেনিং নিয়ে, অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আমরা খানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ব—এই মনোভাব কিন্তু সকলেরই ছিল।

আপনার এলাকায় পাকিস্তানিরা কখন আক্রমণ করল?

- তারিখটা আমার মনে নাই। সম্ভবত এপ্রিল মাস থেকে।

পাকিস্তানি সৈন্যরা আপনার এলাকায় এসে কী কী করল?

- আমাদের এলাকায় তারা নতুন ছিল। তাই এলাকা সম্পর্কে সবকিছু জানত না। আমাদের এলাকা পার্বতীপুর, ফুলবাড়ী এলাকায় এরা যখন ঢুকল, তখন তাদের বড় সহযোগিতা করেছিল বিহারিরা। তারা প্রতিটা ইউনিয়ন, গ্রামের পথঘাট চিনত। তারা আমাদের আশপাশেই থাকত। একই সঙ্গে বসবাস। এরাই কিন্তু খানসেনাদের রাস্তাঘাট সব দেখাইছে। বিহারিদের সহযোগিতায় খানসেনারা গ্রামে গ্রামে নির্বিচারে মানুষ হত্যা, বাড়িঘরে আগুন লাগানো, মা-বোনদের ধরে নিয়ে যাওয়া, ইয়ং ছেলেদের বেঁধে পিটানো, ঝুলিয়ে রাখা এবং শেষে গুলি করে হত্যা করেছে নির্বিবাদে।

স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় আপনার পরিবারের কেউ কি শহীদ হয়েছেন?

- হ্যাঁ, স্বাধীনতাসংগ্রামের সময় রুদ্রাণী সীমান্ত ফাঁড়ির ওখানে ভাড়াবাড়ির দিকে একটা রাস্তা চলে গেছে। ওই দিক দিয়ে আমার মা-বোন সবাইকে ভারতে নিয়া যাই। ওখানে আমি একটা ক্যাম্প করেছিলাম। সেটা বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে ৫০-৬০ গজ দূরে। ওই ক্যাম্পের মধ্যে আমার মা-বোনকে রেখে আমি পুরোপুরি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। সেই দিনই আমাদের ক্যাম্পের কাছাকাছি বাংলাদেশ সীমান্তে ১০-১২ জন খানসেনা ছিল। তারা আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের খুঁজে বেড়াচ্ছিল। মুক্তিযোদ্ধারা কোন দিকে গেছে, কোন দিক থেকে আসতেছে—এগুলো তারা পাবলিকের কাছে জিজ্ঞাসা করছিল। পাবলিক তো সবাই ভয়ে পালিয়ে চলে আসে। এ সময় একদল মুক্তিযোদ্ধার সাথে তাদের মুখোমুখি যুদ্ধ হয়। সংঘর্ষ চলাকালে পাকিস্তানিদের একটি গুলি আমার বোনের শরীরে লাগে। সে তখন ভারতের সীমার মধ্যেই দাঁড়িয়ে ছিল। ব্যাক সাইড থাইকে গুলিটা লাগে। গুলিটা আমার বোনের বক্ষ ভেদ করে সামনের দিক দিয়ে বের হয়ে যায়। আমার বোন ঘটনাস্থলেই মারা যায়। আমার আপন বোন।

আমার দুই বছরের বড় তিনি। তিনি রাজশাহী ইউনিভার্সিটির অ্যারাবিকের হেড ড. আফতাবুর রহমানের স্ত্রী আলেফা রহমান।

১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে আপনি কি আক্রান্ত হয়েছিলেন?

- আমি পাকিস্তানি সেনাবাহিনী দ্বারা সরাসরি আক্রান্ত হইনি।

আপনি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেন কেন?

- মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ কেন করলাম সেটা ভাবার অবকাশ পাকিস্তানিরা রাখে নাই। আমাদের এই দেশ মুক্ত হবে, এই দেশ স্বাধীন হবে, এই দেশে আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারব, আমাদের কথা এইখানে থাকবে, আমাদের সম্পদ আমাদের দেশে থাকবে—এই চিন্তাভাবনা নিয়া যখন আমার ভাই এবং আত্মীয়স্বজন সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ছে, তখন আমি একজন বাঙালি সৈনিক হিসাবে কি বাড়িতে বসে থাকতে পারি? আমাদের দেশকে পাকিস্তানি হানাদার মুক্ত করতেই হবে। আর এ জন্যই আমি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলাম।

আপনার এলাকায় মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা কখন থেকে শুরু হয়?

- প্রথম তো এখানে থার্ড বেঙ্গল এবং মুজাহিদরা তৎপরতা শুরু করে। তখন আমাদের সৈয়দপুরে থার্ড বেঙ্গল ছিল। আমাদের থার্ড বেঙ্গলকে নিয়ে আমরা ফুলবাড়ী থেকে হিলি হয়ে ভারতে ঢুকি। ভারতে গিয়ে ক্যাপ্টেন আনোয়ার বলছেন যে, ঠিক আছে, আমরা থার্ড বেঙ্গল তো সামান্য কিছুসংখ্যক। সুতরাং মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা বাড়াতে হবে। এই অবস্থায় ফুলবাড়ী কলেজের, বিরামপুর কলেজের অনেক ছাত্র, তারপর হাইস্কুলের নাইন-টেনের ছাত্ররা যখন আমাদের বলে যে, আমরা কী করব, তখন ক্যাপ্টেন আনোয়ার বলেন যে, তোমাদের আমরা ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করতেছি। এরপর তারা ট্রেনিং নিয়া গেরিলা যুদ্ধ শুরু করে।

এটা কোন মাস থেকে?

- এটা হতে হতে জুন-জুলাই হয়ে যায়। তখন থেকেই ব্যাপক হারে তৎপরতা শুরু হয়।

আপনার এলাকায় কারা স্বাধীনতাযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল?

- আমাদের এলাকায় স্বাধীনতাযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল বিহারিরা। ১৯৪৭ সালের পর ভারতের বিভিন্ন জায়গা থেকে তারা ফুলবাড়ী এলাকায় এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করতেছে। কতিপয় বাঙালি, যারা ওই মুসলিম লীগের সমর্থক ছিল, তারাও আমাদের বিরোধিতা করেছে। এরা খানসেনাদের সহযোগিতা করেছিল এবং আমাদের সম্বন্ধে তারা ম্যালা কুৎসা রটাইছিল।

আপনার এলাকায় রাজাকার, আলবদর, আলশামস কারা ছিল?

- পাকিস্তানি বাহিনী এখানে শান্তি কমিটি নামে একটা কমিটি গঠন করে। এরপর

তারা কতিপয় ইউপি চেয়ারম্যান এবং মৌলভি-মওলানাদের ডেকে নিয়ে বলছিল যে, আপনারা রাজাকার-আলবদর বাহিনীর জন্য লোক দেন। তারা বিভিন্ন জায়গার পুল, কালভার্ট, বড় বড় রাস্তার মোড় পাহারা দিবে যেন মুক্তিবাহিনী বা গেরিলাবাহিনী আইসে কোনো ক্ষয়ক্ষতি না করতে পারে। পাকিস্তানিরা বলছিল যে, আপনাদের গ্রামের লোক বা আপনাদের আশপাশের লোক এবং আপনাদের আত্মীয়স্বজনদের আপনারা রাজাকার-আলবদরে ভর্তি করায়ে দেন। এরাই রাত্রে পাহারা দেবে। তখন রাজাকার, আলবদররা লিস্টেড হয়ে যায়।

আপনার এলাকায় শান্তি কমিটিতে কারা ছিল?

- আমার এলাকায় শান্তি কমিটিতে খজাপুরের এক মৌলভি ছিলেন। উনি মারা গেছেন। আরও কয়েকজন ছিল। আমার গ্রামের কেউ শান্তি কমিটিতে ছিল না। আমার বাড়ি তো একদম উদ্রানী ক্যাম্পের সামনেই। আমাদের গ্রামের সবাই ভারতের ভিতরে জাকিরপুর নামে একটা গ্রাম আছে সেখানে শিবির করে ছিল। আমাদের ৩ নং কাজীহাল ইউনিয়ন, বিশেষ করে আটপুকুরহাটের দিকের লোক শান্তি কমিটিতে ছিল না।

স্বাধীনতাযুদ্ধের পর রাজাকার, আলবদর, আলশামস বা শান্তি কমিটির যারা সদস্য ছিল, তাদের ধরা হয়েছিল কি?

- অনেককেই মুক্তিযোদ্ধারা ধরে এনেছিল। কাউকে কাউকে গুলি করে মেরে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়ার চিন্তাভাবনা করেছিল। কিন্তু আমরা আইন নিজের হাতে তুলে নেইনি। আমরা পরে তাদের সরকারের হাতে তুলে দেই। তাদের কিছু লোক হাজতে ছিল। কিন্তু নানা কারণে তারা পর্যায়ক্রমে মুক্তি পায়।

আপনি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে কোন কোন এলাকায় যুদ্ধ করেছেন?

- মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে আমি বরাহার আঙ্গিনাবাদ-ফকিরগঞ্জ হয়ে মোহনপুর এবং ওখান থেকে হিলির কাছাকাছি অচিন্ত্যপুর পর্যন্ত যুদ্ধ করেছি। অচিন্ত্যপুরের ওখানে ভাইগড় নামে একটা গ্রাম আছে, সেখানে আমি যুদ্ধ করেছি। এখন সেখানে বিডিআর ক্যাম্প হয়েছে। তারপর মোহনপুর ডাকবাংলার ওখানেও যুদ্ধ করেছি। ফকিরগঞ্জ পার হয়ে পায়ে হেঁটে রাত্রে সেখানে গিয়ে আমরা যুদ্ধ করি। আমাদের সঙ্গে ইন্ডিয়ান আর্মি ছিল। সে দিন নায়েক সুবেদার শহীদুল্লাহ শহীদ হন। তাঁর বাড়ি নোয়াখালী। সে দিন আমরা বড় কষ্টে ওখান থেকে বেঁচে আসছি।

সেখানে আপনারা কতজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন?

- আমার সঙ্গে ছিল ৩০-৩৫ জন। ইন্ডিয়ান আর্মি আমাদের পিছনে সাপোর্টে ছিল। তারাও ৩০-৪০ জন ছিল।

সে দিন কি সেখানে কোনো পাকিস্তানি সৈন্য হতাহত হয়েছিল?

- কতজন পাকিস্তানি সৈন্য সেখানে হতাহত বা আদৌ হতাহত হয়েছিল কি না, তা বলতে পারি না। তবে পরের দিনই আমরা ফিরে আসার সময় একজন খানসেনাকে অস্ত্রসহ জিন্দা ধরে নিয়ে আসছি।

ধরে নিয়ে এসে তাকে কী করলেন?

- আমার ক্যাম্প ইনচার্জ মেজর রণজিৎ সিং এবং ক্যাপ্টেন এস এস ভাটের হাতে আমরা ওই পাকিস্তানিকে তুলে দেই। তাঁরা বলেছিলেন, একে মারা হবে না। একে আমরা ইন্ডিয়ান সরকারের হাতে তুলে দিব। ইন্ডিয়ান সরকার তার ব্যবস্থা নেবে। পাকিস্তানি সেনাকে তারা দিল্লিতে না কোথায় নিয়ে গেল, পরে তা আর আমরা বলতে পারি না।

আপনি ভাইগড়ে কীভাবে যুদ্ধ করেছেন?

- সেখানে খানসেনারা ক্যাম্প করে লোকজনদের ওপর অত্যাচার করত। আমরা তখন গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ করছি। আমরা প্রথম ওখানে গিয়ে অর্থাৎ ভাইগড়ে গিয়ে একটা ব্রিজ উড়িয়ে দেই। এর পর থেকে ওখানে খানসেনাদের তৎপরতা কমে যায়। তখন ওখান থেকে আমি চলে আসি। আসার পর আমবাড়ী ক্যাম্পের ওখানে মাছুয়াপাড়া নামে একটা জায়গা আছে, এখন জলপাইতলি ক্যাম্প নামে পরিচিত, সেখানে পাকিস্তানি সৈন্যদের ওই ক্যাম্পটা আমরা উড়িয়ে দেই। ওটা পাকিস্তানিদের বেশ শক্ত ঘাঁটি ছিল। আমার সাথে সে দিন ফুলবাড়ীর কাইউম ডাক্তার ছিলেন। তারপর হোসেন নামে এক ছেলে ছিল, তার পায়ে গুলি লাগে। এইভাবে যেখানে যেখানে প্রয়োজন মনে করছি এবং যেখানে খানসেনাদের তৎপরতা ছিল, সেখানেই আমরা তাদের প্রতিহত করার জন্য যুদ্ধ করেছি।

সবচেয়ে ভয়াবহ যুদ্ধ কোথায় করেছেন?

- একদিন আটপুকুর হাটের ওখানে দাদুল গ্রামে আমরা আসি। ওখানে তখন কেউ ছিল না। দু-চারজন লোক ছিল বাড়ি পাহারা দেওয়ার জন্য। বাকি সব লোক ভারতে চলে গেছে। আমরা তখন ওই ফাঁকা গ্রামে এসে দেখি যে মাদুলি হাটের ওখানে চিন্তামন ডাকবাংলায় খানসেনাদের এক বিরাট ঘাঁটি। সেই ঘাঁটি থেকে প্ল্যান করছে যে ওরা সম্পূর্ণ আটপুকুর এলাকাটা দখল করবে। তখন আমরা চিন্তা করলাম যে যদি ওরা অ্যাডভান্স করে এত দূর চলে আসে, তাহলে তো আমরা আর এখানে টিকে থাকতে পারব না। কারণ, আমাদের শিবির ইন্ডিয়ার অতি কাছে হলেও শিবিরগুলো ওদের গুলির রেঞ্জের মধ্যে পড়বে। তখন আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে ওদেরকে যেভাবে হোক আমরা বাধা দিব, যেন তারা এদিকে অ্যাডভান্স করতে না পারে। পাকিস্তানি সৈন্যরা

চিন্তামন ডাকবাংলা থেকে সোজাসুজি মেলাবাড়ীর ওই দিক দিয়ে নিরুলকুড়ি আসে। আমরা সকালবেলা দেখি, নিরুলকুড়ি থেকে অনেক মেয়েছেলে গরু-বাছুর এবং মাল-সামান নিয়ে পালিয়ে আসতেছে। খানসেনা আসতেছে—এই রকম একটা সুর উঠে গেল। আমরা তখন সাত-আটজন মুক্তিযোদ্ধা আটপুকুর হাটের ওখানে আসলাম। সেখানে এক পুকুরপাড়ে ত্বরিত গতিতে এলএমজি, এসএলআর এবং স্টেনগান নিয়ে আমরা পজিশন নেই। আমরা দেখতেছি যে ১৫-২০ জন লম্বা লম্বা লোক মাথায় হাত দিয়ে আসতেছে। সবগুলোর মাথায় কাপড়। দূর থেকে মনে হচ্ছে সব মেয়ে। কিন্তু আমি অনেকক্ষণ লক্ষ করে দেখলাম যে মেয়ে যদি হয়ে থাকে এবং তারা যদি খানসেনার ভয়ে পালিয়ে ভারতের দিকে আসতে থাকে, তাহলে তাদের কারও কোলে কোনো বাচ্চা নাই কেন? সঙ্গে কোনো পোঁটলাপুঁটলি নাই কেন? কেবল মাথায় শাড়ি, গায়ে চাদর। এই দৃশ্য দেখে ওদের মেয়ে বলে মনে হলো না। আমার আরও মনে হলো যে এরা সাধারণ পাবলিক নয়। নিশ্চয়ই এরা পাকিস্তানি আর্মি। এরা সব খানসেনা। তখন আমি পুকুরের এক পাড় থেকে এলএমজি দিয়ে ওদের ওপর ফায়ার শুরু করলাম। ফায়ার শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে ওরা সব মাঠের মধ্যে শুয়ে পড়ল। তখন আমি কনফার্ম হয়ে গেলাম যে ওরা কারা। আমি নিশ্চিত হয়ে গেলাম যে এরা খানসেনা। তখন ওরাও আমাদের ওপর উত্তর দিক দিয়ে ফায়ার শুরু করল। কিন্তু পূর্ব দিকটা ফাঁকা ছিল। পাশেই জাঙ্গাল ব্রিজ নামে একটা জায়গা আছে, ওই দিকে তারা মুভ করতে শুরু করল। তখন আমি চিন্তা করলাম যে এদের প্রতিহত করার জন্য আমার সঙ্গে ১০-১২ জন মাত্র মুক্তিযোদ্ধা আছে। তখন আমি তাদের বললাম যে ঠিক আছে, তোমরা ব্যাপকভাবে এই দিকে ফায়ার অব্যাহত রাখো। আমি সামনের খানসেনাদের দেখতেছি। তখন আমি আমার এলএমজি দিয়ে ফায়ার শুরু করে দিলাম জাঙ্গালের ব্রিজের ওখানে। আমরা জেনেছি, সে দিন আমার সঙ্গীদের হাতে ৪০ থেকে ৪৫ জন খানসেনা মারা গেছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাদের লাশগুলো আমরা আনতে পারি নাই। কারণ, ওদের ভারী অস্ত্রের সাপোর্ট ছিল। আমরা আক্রমণ শুরু করার কিছুক্ষণ পর থেকে ওদের সাপোর্টিং দল শেলিং শুরু করল। তখন ওদের গোলায় টিকে থাকতে না পেরে মুক্তিযোদ্ধাদের বাঁচানোর জন্য ওখান থেকে আমি উইথড্র করে পালিয়ে আসি। সেখান থেকে আবার আমি জাকিরপুর ক্যাম্পের ওখানে ভেড়ম মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে ঢুকি। ওখানে পৌঁছে জানলাম যে পাকিস্তানি সৈন্যরা দাদুল গ্রাম তছনছ করে সম্পূর্ণ গ্রামটা আগুন লাগিয়ে একেবারে পুড়িয়ে শেষ করে দিছে। এইটেই আমার জীবনের ভয়াবহ যুদ্ধ, ভয়াবহ স্মৃতি।

ওই যুদ্ধে ৪০-৪৫ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত হওয়ার কথা আপনি কী করে জানলেন?

● এই ঘটনার পরের দিনই চিন্তামন ডাকবাংলার ওই দিক থেকে কতিপয় লোক ভারতের দিকে যাচ্ছিল। ওরা ভারতে আসার সময় পথে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তাদের কাছেই জানলাম যে ওই ব্রিজের ওইখানে ৪০-৪৫ জন পাকিস্তানি সৈন্য মারা গেছে।

ওই যুদ্ধে কোনো মুক্তিযোদ্ধা কি শহীদ হয়েছিলেন?

● ওই যুদ্ধে একজন মুক্তিযোদ্ধার ডান পায়ে গুলি লাগে। তাকে কাঁধে করে আমি কাজীহাল ইউনিয়ন অফিসের সামনে নিয়ে আসতেই সে মারা যায়। ওই ইউনিয়ন অফিসের পাশেই আমরা দাফন করি। তার নাম সেকেন্দার। বাড়ি রংপুর জেলায়।

যুদ্ধের শেষের দিকে আপনি কোথায় ছিলেন?

● তখন আমরা মোল্লাদীঘি জলপাইতলি ক্যাম্পের দিক দিয়ে সোজা ফুলবাড়ীতে ঢুকি। আমাদের সাথে ইন্ডিয়ান আর্মি ছিল। আমার সাথে প্রায় ৫০-৬০ জন মুক্তিযোদ্ধা ছিল। ইন্ডিয়ান আর্মির ছয়টা ট্যাংকের সঙ্গে আসার সময় বেজাই মোড় নামে একটা জায়গায় একটা ট্যাংকের চেইন মাইন বার্স্টে ছিঁড়ে যায়। রাস্তায় মাইন পোঁতা ছিল। ইন্ডিয়ান আর্মিরা ভয় পেয়ে গেল। তখন আমি বললাম, পাকিস্তানি সৈন্যরা এখন আর অত সাহসী নয় যে সম্পূর্ণ জায়গায় তারা মাইন পুঁতে রাখছে। যেভাবে হোক আমাদের ঢুকতে হবে। তখন পাকা রাস্তা ছিল না। ঠিক হলো যে আমরা কাঁচা রাস্তার পাশ দিয়ে ট্যাংক নিয়ে যাব। মুভ করে আমরা বাবাইতে আসতেই আবার একটা বিকট আওয়াজ হলো। তখন চিন্তা হলো যে আর বোধ হয় ভিতরে ঢুকতে পারতেছি না। এরই মাঝে বিকট আরেকটা আওয়াজ হইল ফুলবাড়ীর কাছে। আমরা মনে করলাম, আমাদের ওপর বোধ হয় পাকিস্তানিরা আবার অ্যাটাক করছে। বিকট একটা আওয়াজের পর আর কোনো শব্দ আমরা পাইনি। তখন আমরা ফুলবাড়ীর দিকে অ্যাডভান্স হই। পথিমধ্যে দেখি, ফুলবাড়ী নদীর ওপর যে ব্রিজটা ছিল তার পূর্ব অংশটা পাকিস্তানিরা সম্পূর্ণ ভেঙে দিয়ে পার্বতীপুর হয়ে সৈয়দপুরের দিকে চলে গেছে। আমরা ফুলবাড়ীতে এসে খানসেনা কাউকে পাইনি।

ফুলবাড়ীতে যখন আপনারা ঢুকলেন তখন ফুলবাড়ীর অবস্থা কী দেখলেন?

● ফুলবাড়ীতে ঢুকেই দেখি রাস্তায় লোকজন নাই, প্রায় জনশূন্য রাস্তা।

ফুলবাড়ী ঢোকার পথে আপনাদের সাথে ভারতীয় সৈন্য কতজন ছিল?

● আমাদের সাথে ভারতীয় সৈন্যের সঠিক সংখ্যা বলতে পারব না।

ফুলবাড়ী থেকে আপনি পরবর্তী সময়ে কোথায় গেলেন?

● ফুলবাড়ীতে যখন আমি দেখলাম যে খানসেনা বা বিহারিরা এখানে কেউ নাই,

লোকে বলছে যে স্পেশাল ট্রেনে চেপে তারা সব সৈয়দপুর চলে গেছে, তখন আমরা গাড়ি নিয়ে পার্বতীপুরের দিকে যাত্রা করি। কেউ হেঁটে, কেউ গাড়িতে, কেউ দৌড়ে—এইভাবে তখন আমরা পার্বতীপুর যাই।

পার্বতীপুর গিয়ে আপনি কী দেখলেন?

- পার্বতীপুরে গিয়ে দেখি যে ওখানে অনেক বিহারি আটকা পড়ে গেছে। তারা সবাই মেয়েছেলে আর বাচ্চা। পুরুষ লোকেরা যারা খানসেনাদের সহযোগিতা করেছিল, তারা সবাই পার্বতীপুর থেকে সৈয়দপুরে পালিয়ে গেছে।

তারপর আপনি কী করলেন?

- তারপর ওখান থেকে আমরা পুনরায় ফুলবাড়ীর দিকে চলে আসি। সবাই ফুলবাড়ীতে একত্র হইলাম। হওয়ার পর খুব আনন্দ-উল্লাস করলাম। সবার সঙ্গে পরিচয় হলো। কে কোথায় কী অবস্থায় গেছিলাম, আমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হচ্ছিলাম। কয়েক দিন পর সরকার থেকে নির্দেশ দিল, আপনাদের কাছে যেসব অস্ত্র আছে, সেসব অস্ত্র আপনারা থানায় জমা করেন। তখন আমাদের কাছে যেসব অস্ত্রশস্ত্র ছিল সেসব ফুলবাড়ী থানায় জমা করি।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আপনার এলাকার গ্রামের বাড়িঘরগুলোর অবস্থা কেমন ছিল?

- আমাদের গ্রামের সবাই ভারতে পালিয়ে গেছিল। ঘরবাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ করার মতো লোক ছিল না। যাদের ঘরে টিনের ছাউনি ছিল, তাদের ঘর কিছু বাঁচিছে। কিন্তু মালামাল কিছুই ছিল না। তা ছাড়া ওই মাটির ঘর যেগুলো ছিল, মাটির দেওয়াল-টেওয়াল যেসব বাড়ির ছিল, সেসব ভেঙে গেছিল। আর আমার পাশের দাদুল গ্রামটা তো খানসেনারা সম্পূর্ণ পুড়িয়ে দিছিল। আগুনে পুড়িয়ে দেওয়ার পর বৃষ্টি-বাদলে সম্পূর্ণ গ্রাম একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছিল।

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **ভবেন্দ্রনাথ বর্মণ**
ডিসেম্বর ১৬, ১৯৯৬

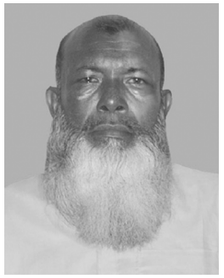

মো. রহিমউদ্দীন

পিতা : হানিফ উল্লাহ মানিক, গ্রাম : মন্মথপুর দক্ষিণপাড়া
ইউনিয়ন : মন্মথপুর, থানা : পার্বতীপুর, জেলা : দিনাজপুর
শিক্ষাগত যোগ্যতা : অষ্টম শ্রেণী, ১৯৭১ সালে বয়স ২০ বছর
১৯৭১ সালে বেকার ছিলেন, বর্তমানে শ্রমজীবী।

১৯৭১ সালে আপনি কি পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাতে আক্রান্ত হয়েছিলেন?

- আমিসহ আমাদের গ্রামের সবাই আক্রান্ত হয়েছিলাম। পাকিস্তানি সেনারা আমাদের গ্রামে আইসা গ্রামের সব বাড়িঘর জ্বালাও-পোড়াও করে। একজন মুসলমান, তিনি ছিলেন তহশিলদার, তাঁকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী গুলি করে মারছিল। সেই সঙ্গে আরও দুইজন হিন্দু ব্যক্তিকেও তারা গুলি করে মারছিল।

আপনি কেন মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেন?

- দেখলাম, পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আমাদের বাঙালিদের এ দেশে আর থাকতে দেবে না বা এই দেশটা তারা তাদের আওতায় নিয়ে নিবে, আমাদের দেশে উর্দু ভাষা চালু করবে, তারা শুধু আওয়ামী লীগ যারা করে, তাদেরই নয়, হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান সবার ওপরই নির্বিচারে নির্যাতন করছিল—মহিলাদের ওপরই তারা বেশি নির্যাতন করছিল—তাদের অপহরণ করে নিয়ে যেত—এই সব দেখে মনে করলাম যে সত্যি তো আমাদের দেশকে শত্রুমুক্ত করতে হবে—এই জন্যই আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করি।

আপনার এলাকায় কখন পাকিস্তানিরা আক্রমণ করল?

- এটা ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে।

তারা কীভাবে আক্রমণ করল?

- পাকিস্তানি সৈন্যরা পার্বতীপুর থেকে দিনাজপুর অভিমুখে ট্রেনে গিয়েছিল।

মন্মথপুর রেলস্টেশন-সংলগ্ন আমার বাড়ি। তারা রেলস্টেশনের কাছেই ট্রেন দাঁড় করাইয়া আমাদের গ্রামে হামলা করে। তাদের সঙ্গে সহযোগিতায় ছিল পার্বতীপুরের অনেক অবাঙালি, যাদের আমরা বিহারি বলি। তাদের নেতৃত্ব দিত বাদশা খান। সে ছিল তাদের লিডার। আমাদের এই এলাকায় হিন্দু বসতি বেশি। বিহারি বাদশা খানের কথায় পাকিস্তানি সেনারা আমাদের মন্মথপুরে ট্রেন থামিয়ে আক্রমণ করছিল। তখন লোকজন ভয়ে পালাইয়া যায়। গ্রামের লোকজন প্রাণের ভয়ে পালাচ্ছিল। পাকিস্তানি সেনারা তখন তাদের গুলি করে। তাদের গুলিতে অনেক লোক আহত ও মারা যায়।

আপনার এলাকায় ওই দিন পাকিস্তানি সেনাদের গুলিতে কতজন মারা গিয়েছিল?

- ওই দিন আমাদের এখানে মারা গেছিল তিনজন; দুইজন হিন্দু, একজন মুসলমান।

পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে আপনার পরিবারের কেউ কি শহীদ হয়েছেন?

- না, আমার পরিবারে কেউ শহীদ হয়নি। কেউ গুলিবিদ্ধও হয়নি।

আপনার এলাকায় মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা কখন থেকে শুরু হয়?

- আমাদের এলাকায় মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা শুরু হয়েছিল ১৯৭১ সালের জুলাই মাস থেকে।

আপনি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে কোন কোন এলাকায় যুদ্ধ করেছেন?

- আমরা ট্রেনিং করি পানিঘাটায়। সেখান থেকে ট্রেনিং শেষ করে আসার পর কোম্পানি কমান্ডার সাহেব আমাদের সামনে পার্বতীপুর থানার একটা ম্যাপ মেলে ধরলেন। ম্যাপ দেখিয়ে আমাদের বললেন, আপনার নিজ গ্রামসহ পাশের কয়েকটি গ্রাম আপনাদের অপারেশন এরিয়া। কমান্ডার সাহেব মন্মথপুর, চককৃষ্ণপুর, বড়হরিপুর, তাজনগর—এই চারটি গ্রাম আমাদের অপারেশন এরিয়া হিসেবে নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন।

এই এলাকায় আপনি কীভাবে তৎপরতা চালিয়েছেন?

- আমরা ভারত থেকে রাতের অন্ধকারে গোলাবারুদ নিয়া চলে আসতাম এপারে। এদিকে দেশের মধ্যে আমাদের সহযোগিতা করতেন মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মীয়স্বজন। একবার একজনের বাড়িতে আমরা লুকিয়েছিলাম। তিনি খানসেনাদের হাতে পরে ধরা পড়েছিলেন। কিন্তু তিনি আমাদের কথা খানসেনাদের কাছে স্বীকার করেন নাই। গ্রামের লোকেরাই এলাকায় ঘুরেফিরে আমাদের জন্য সংবাদ সংগ্রহ করে দিতেন। আমরাও অনেক সময় নিজেরাই ক্যাম্প ক্লোজ করে কৃষক সেজে বা বাজার করার জন্য সাধারণ থলি হাতে নিয়ে পার্বতীপুর শহরে আসতাম। এইভাবে আমরা সংবাদ সংগ্রহ করে খানসেনাদের ওপর হঠাৎ আক্রমণ করতাম।

এ সময় মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আপনারা কী কী সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন?

- এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা বলব। আমরা এক গ্রামে ছিলাম, দক্ষিণ সালন্দা গ্রাম। শেষ রাতের দিকে ভারত থেকে এসে এই গ্রামের এক জায়গায় আমরা অবস্থান করছিলাম। পার্শ্ববর্তী গ্রামে খানসেনাদের এক দালাল ছিল। বর্তমানে সে বেঁচে নেই। তার নাম ছিল মাহতাব উদ্দীন চৌধুরী। সে ছিল খানসেনাদের দালাল, শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান ছিল। সে কীভাবে যেন আমাদের সংবাদ পেয়েছিল। সম্ভবত তাদের রাজাকার বাহিনী তাকে এ সংবাদ দেয়। সে আবার পার্বতীপুরে খানসেনাদের সংবাদ দেয়। সংবাদ পেয়ে খানসেনা, রাজাকার আর বিহারিরা, আমরা যে গ্রামে ছিলাম, সেই গ্রাম চারদিক দিয়ে ঘেরাও করে আমাদের অ্যাটাক করে। ওই গ্রামে আমাদের আবার কিছু স্পাই ছিল। তারা আমাদের সংবাদ দিল যে খানসেনারা আমাদের ঘেরাও করে ফেলেছে। আমরা যে গ্রামে ছিলাম তার দক্ষিণে আরেকটি গ্রামে ১০০ জনের মতো মুক্তিযোদ্ধা ছিল। আমরা একজন স্পাইকে তাদের কাছে পাঠিয়ে দিলাম। আমাদের অ্যাটাক করার জন্য খানসেনারা যে স্থানে অবস্থান করছিল সেখানে একটা নদী ছিল। তারা নদীর পশ্চিম পারে অবস্থান করছিল। আমরা ছিলাম নদীর পূর্ব পাশে। খানসেনারা আমাদের অ্যাটাক করার আগেই আমরা তাদের ওপর আক্রমণ শুরু করি। আমরা তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে তাদের আক্রমণ করি।

  যারা ঘেরাও করছে সেই দলে খানসেনা কম ছিল, বেশি ছিল রাজাকার আর বিহারি। খানসেনা কিছু পার্বতীপুর থেকে আসছিল। আর কিছু খানসেনা মন্মথপুর থেকে আসছে। ওই সময় মন্মথপুর রেলস্টেশনের পাশে খানসেনাদের একটা ক্যাম্প ছিল। সেখান থেকে প্রথমে অল্পসংখ্যক পাকিস্তানি সেনা গিয়েছিল আমাদের ঘেরাও করে রাখার জন্য। পরবর্তী সময়ে একটি ট্রেন পার্বতীপুর থেকে মন্মথপুরের দিকে আসছিল। ট্রেনটি মন্মথপুর পৌঁছানোর আগেই আমরা তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ি। গোলাগুলির আওয়াজ এবং স্পাই মারফত খবর পেয়ে আমাদের দক্ষিণে মাইল দুয়েক দূরে যে পার্টি ছিল, তারাও অ্যাডভান্স করে। পাকিস্তানিরা আমাদের পালানোর একটা রাস্তা ঘিরে রেখেছিল। তারা বোধ হয় ভেবেছিল যে আমরা হয়তো ওই রাস্তা দিয়ে নিরাপদ এলাকায় চলে যাব। আরেক দিকেও পিছু হটার রাস্তা ছিল। সেই দিকে রাজাকাররা ছিল। সেখানে আবার খানসেনারা ছিল না। আমরা রাজাকারদের অবস্থানে প্রচণ্ড গোলাগুলি করলে তারা তাদের হাতিয়ারগুলো ফেলে সেখান থেকে পালিয়ে যায়। আমরা তখন তাদের পিছু ধাওয়া করি। তাদের হাতিয়ারগুলোও আমরা ওখান

থেকে পাই। অল্প কয়েকজন খানসেনা যেদিকে ছিল, সেদিকে আমরা আক্রমণ করিনি। পরবর্তী সময়ে আমরা ওই গ্রাম থেকে আরও পশ্চিম দিকে রায়পুর, জয়পুর, মধুপুর গ্রাম পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে সংবাদদাতা শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান মাহতাব উদ্দীনের বাড়ি ঘেরাও করি। আমরা আরও জানতে পারলাম, কয়েক দিন আগে কয়েকটি হিন্দু মেয়েকে সে এবং তার দলবল ধরে এনে তার বাড়িতেই রাখছে। আমরা তার বাড়ি অ্যাটাক করে সেখান থেকে দুজন হিন্দু মেয়েকে উদ্ধার করি। এই সময় পাকিস্তানিরা মন্মথপুর রেলস্টেশন থেকে সালন্দার দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়। তাদের অগ্রসর হওয়ার সংবাদ পেয়ে আমরা আবার উত্তর দিকে অ্যাডভান্স করি। আমরা তাদের কাছাকাছি হয়ে টার্গেটের অনেক দূরে থাকতেই কিছু হাতবোমা নিক্ষেপ করি এবং এলএমজির ফায়ার শুরু করি। খানসেনারা আমাদের দিকে কিছু গোলাগুলি করার পর যখন বুঝল যে মুক্তিযোদ্ধারা সংখ্যায় বেশি তখন তারা মন্মথপুর স্টেশনে ফিরে গিয়ে ওই ট্রেনে করেই অতি দ্রুত পার্বতীপুরের দিকে চলে যায়।

এ দিনের যুদ্ধে কতজন মুক্তিযোদ্ধা হতাহত হয়েছিল?

- এ দিন আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে একজন গুলিবিদ্ধ হয়েছিল। আল্লাহর অশেষ রহমতে আমাদের মধ্যে আর কেউ গুলিবিদ্ধ হয় নাই।

এই যুদ্ধে পাকিস্তানি সৈন্যরা কি হতাহত হয়েছিল?

- পাকিস্তানিরা আমাদের থেকে অনেক দূরে ছিল। তাদের কথা ঠিক বলতে পারব না। তবে আমরা কয়েকজন রাজাকার ধরেছিলাম। তাদের কাউকে আমরা মেরে ফেলিনি। আমরা তাদের ধরে নিয়ে গিয়ে ভারতে ক্যাম্পে জমা দিয়েছিলাম।

আর কোন কোন জায়গার যুদ্ধে আপনি অংশগ্রহণ করেছিলেন?

- ওই সময় জলপাইতলিতে বিরাট একটা যুদ্ধ হয়েছিল। সেখানে আমরা নিজেরাই অ্যাটাক করেছিলাম। ওখানে খানসেনাদের ক্যাম্প ছিল। প্রায় বর্ডারের পাশেই ছিল ক্যাম্পটা। আমরা দুই-আড়াই শর মতন মুক্তিযোদ্ধা ওই ক্যাম্পে অ্যাটাক করেছিলাম। প্রচণ্ড যুদ্ধের পর খানসেনারা পালাইয়া যায়। একজন খানসেনাকে আমরা ধরে ফেলেছিলাম। আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে দুজন গুলিবিদ্ধ হয়েছিল। আহত মুক্তিযোদ্ধাদের আমরা সঙ্গে সঙ্গে পতিরামে যে হাসপাতাল ছিল, সেখানে পৌঁছে দিছি।

আপনার গ্রাম বা এলাকায় কারা রাজাকার ছিল?

- আমাদের গ্রামে অনেক রাজাকার ছিল। আমি স্পষ্ট করে বলতে পারি, তাদের মধ্যে আমার এক আপন মামাও ছিলেন। তিনি আমাদের দলের

লোকের হাতেই মারা গেছেন যে দিন দেশ স্বাধীন হয়, তার আগের দিন। পার্বতীপুরে ভারতীয় প্লেন এসে বোম্বিং করছিল। তখন আমার মামা এবং আরও কয়েকজন রাজাকার নাকি পালিয়ে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে তারা আমাদের অন্য এক দলের সামনে পড়ে যায়। মুক্তিযোদ্ধারা তাদের ধরে হত্যা করে। অন্যদিকে দেশ যখন স্বাধীন হতে যাচ্ছিল, তখন অনেকেই আবার নিজেরা গোপনে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে হাতিয়ারসহ সারেন্ডার করে। আমরা তখন ওই সব হাতিয়ারসহ রাজাকারদের ভারতের জিম্মায় দিয়া আসি।

আমরা এর আগে বশীর এবং তার সঙ্গে যে আরও পাঁচজন ছিল, আমরা তাদের ধরেছিলাম। তারা আমাদের ওখানকার রেললাইনে ডিউটিতে ছিল। তাদের আমি ভালোভাবেই চিনতাম। তাদের ঘেরাও করার পর আমি বশীরের নাম উচ্চারণ করে বলেছিলাম, বশীর, আমি রহিম মুক্তিযোদ্ধা বলছি, তুমি যদি বাঁচতে চাও, তাহলে তোমার দলবল নিয়ে হাতিয়ার ফেলে দিয়ে সারেন্ডার করো। আর সারেন্ডার না করলে আমরা গুলি চালাব এবং তোমরা কেউ বাঁচতে পারবে না। সে আমার গলার আওয়াজ শুনে হাতিয়ার ফেলে দিয়ে কইল যে, ভাই, আমরা সবাই হাতিয়ার ফেলে দিয়েছি, আপনারা আমাদের মারবেন না, আমরা সারেন্ডার করছি। তখন আমরা তাদের হাতিয়ারপত্রসহ ভারতে নিয়ে যাই এবং সেখানকার ক্যাম্পে তাদের জমা দেই।

দেশ যখন শত্রুমুক্ত হয় তখন আপনি কোথায় ছিলেন?

- আমরা পার্বতীপুর এলাকাতেই ছিলাম। ভোররাতের দিকে সালন্দা, মন্মথপুর, তাজনগর এবং পলাশবাড়ীর দিক থেকে আমরা, মুক্তিযোদ্ধারা পার্বতীপুর শহর অ্যাটাক করি। দক্ষিণ ও পশ্চিম দিক থেকে পার্বতীপুর শহরে আমরা গোলাগুলি শুরু করি। এখানে তখন খানসেনা, রাজাকার এবং অবাঙালিরা ছিল। তারা আমাদের লক্ষ্য করে পাল্টা গুলি চালায়। পরে তারা যখন দেখল যে মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণ তীব্র আকার ধারণ করছে, তখন বিহারিরা মাইকিং শুরু করে। বিহারিরা মাইকিং করে বলছিল যে, যার যা আছে সব রেখে যদি জীবন বাঁচাতে চান, তাহলে এখনই ট্রেনে ওঠেন। এই মুহূর্তে ট্রেন সৈয়দপুরের দিকে চলে যাবে। এই মাইকের আওয়াজ আমি শুনিনি, কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেকেই নাকি শুনেছিল। মাইকিংয়ের পর হঠাৎ তাদের পক্ষ থেকে গোলাগুলি কমে যায়। পরে শুনেছি, তারা নিজ নিজ প্রাণ নিয়ে ট্রেনে উঠে সৈয়দপুরের দিকে পালিয়ে যায়। আমরা সেখানে পৌঁছে তাদের পাইনি। বাঙালি কিছু রাজাকার মারা পড়ে। আর কিছু ধরা

পড়ে। পাকিস্তানি সেনারা বিহারিদের গোলাগুলি করতে লাগিয়ে দিয়ে সৈয়দপুরের দিকে আগেই পালিয়ে যায় বলে শুনেছি।

যুদ্ধের শেষে গ্রামে ফিরে আপনার এলাকার অবস্থা কী দেখলেন?

- যুদ্ধের শেষে ফিরে এসে দেখি আমাদের। ভিটেমাটি সম্পূর্ণ সমান হয়ে গেছে। গাছপালা, বাঁশঝাড় সব তারা ধ্বংস করেছে। পার্বতীপুরে যারা বিহারি ছিল তাদের লাকড়ির প্রয়োজনে আমাদের গাছপালা সব কেটে নিয়ে গেছে। শুধু আমার গ্রাম নয়, আশপাশের কোনো গ্রামের বাড়িঘরই ভালো ছিল না। মন্মথপুরে একটা বিরাট হিন্দুপাড়া ছিল। এই পাড়ার একটি ঘরও ছিল না।

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **ভবেন্দ্রনাথ বর্মণ**
নভেম্বর ০২ ১৯৯৬

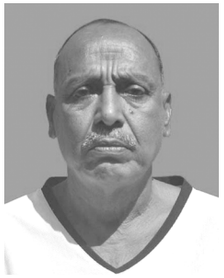

মো. সাইদুর রহমান

পিতা : নজরউদ্দীন প্রামাণিক, গ্রাম : রঘুনাথপুর (গড়েরপাড়া)
ডাক : নূরুল মজিদ, ইউনিয়ন : রামপুর, থানা : পার্বতীপুর
জেলা : দিনাজপুর, শিক্ষাগত যোগ্যতা : এইচএসসি, ১৯৭১ সালে
বয়স ১৬ বছর, ১৯৭১ সালে ছাত্র ছিলেন, বর্তমানে কৃষিজীবী।

১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে আপনি আক্রান্ত হয়েছিলেন কি?

- হ্যাঁ, ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে আমি কয়েকবার আক্রান্ত হয়েছিলাম। আমার গ্রামের পাশেই শাখোয়াপাড়া নামক একটা গ্রাম। ঈদের আগের দিন খানসেনারা সেই গ্রামে নারী-নির্যাতন এবং অগ্নিসংযোগ করছিল। আমরা তাদের সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে লিপ্ত হয়ে আক্রান্ত হয়েছিলাম।

আপনি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেন কেন?

- মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ এই কারণে করলাম যে যখন দেখলাম, মা-বোনদের ইজ্জত যাচ্ছে, ঘরবাড়ি লুট হয়ে যাচ্ছে, তাই নিরস্ত্র অবস্থায় মরার চেয়ে বীরের মতো লড়ে মরা ভালো। হয় আমরা স্বাধীন হব, নয় সম্পূর্ণ বাঙালি জাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব। সে কারণেই মুক্তিযুদ্ধে গেছি।

আপনার এলাকায় পাকিস্তানিরা কখন আক্রমণ করল?

- আমার এলাকায় পাকিস্তানি সৈন্যরা মার্চ মাসের ২৭-২৮ তারিখের দিকে আক্রমণ করে। পার্বতীপুরে বহুসংখ্যক অবাঙালি বসবাস করত। এরা খানদের সহযোগিতায় এবং পরে রাজাকারদের সহযোগিতায় সবচেয়ে বেশি অত্যাচার করেছে। নয় মাসের মধ্যে আটবার আমাদের গ্রামের বাড়িঘর পুড়িয়ে দিয়েছে তারা। আমাদের গ্রামে কোনো বাড়িঘর ছিল না।

পাকিস্তানি সৈন্যরা প্রথমে কীভাবে আক্রমণ শুরু করে?

- তারা প্রথমে আসে ভোরবেলা। আসার পর ব্রাশফায়ার করে। তারপর গ্রামে

ঢোকে। ব্রাশফায়ার করাতে অনেক লোক পালিয়ে চলি যায়। তারপরে তারা গ্রামে অগ্নিসংযোগ ও নারী-নির্যাতন করে।

আপনার পরিবারের কেউ শহীদ হয়েছেন কি?

- না, আমার পরিবারে কেউ শহীদ হয় নাই।

আপনার প্রতিবেশী কেউ শহীদ হয়েছেন কি?

- হ্যাঁ, প্রতিবেশী কয়েকজন শহীদ হয়েছে।

তারা কীভাবে শহীদ হয়েছেন?

- খানসেনারা আসি ব্রাশফায়ার করছিল। যারা সবল লোক তারা সবাই ভাগি গেছিল। আমার পাশের বাড়ির বৃদ্ধ রহিমউদ্দীন পালিয়ে যেতে পারে নাই। আর একজন হইল আলিফউদ্দীন। এই দুইজন পাকিস্তানি সৈন্যদের গুলিতে এক দিনে মারা গেছে।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে আপনার কোনো সহযোদ্ধা যুদ্ধের ফিল্ডে মারা গেছে কি?

- হ্যাঁ, মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে আমার বাড়ি থেকে হাফ মাইল পশ্চিমে শাখোয়ার ব্রিজে আমরা একদিন রাজাকার ধরতে আইছিলাম। রাজাকাররা ওই ব্রিজ পাহারায় ছিল। এটা আমাদের প্রথম অপারেশন ছিল। এই অপারেশনে আমার সহযোদ্ধা ছিল আনোয়ারুল হক। সে মারা গেছে।

আপনার এলাকায় কখন থেকে মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা শুরু হয়?

- আমার এলাকায় মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা শুরু হয় মে মাসের শেষ দিক থেকে।

মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আপনি কখন থেকে তৎপরতা শুরু করেন?

- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমি তৎপরতা শুরু করি মে মাসের শেষের দিক থেকে।

আপনাদের বিরোধিতা কারা করেছিল?

- বাঙালিদের মধ্য থেকে যারা রাজাকার এবং যারা শান্তি কমিটিতে গিয়েছিল, তারা। আবার জামায়াতে ইসলামী আর মুসলিম লীগ যারা করত, তারাও আমাদের বিরোধিতা করেছিল।

আপনার গ্রাম বা এলাকায় রাজাকার, আলবদর কারা ছিল?

- আমাদের গ্রামে রাজাকার ছিল মুসলেম আর তার ভাই মোকসেদ। তারা বেঁচে নাই। তার মা, বোন সবাই মারা গেছে।

স্বাধীনতাবিরোধীদের ধরা হয়েছিল কি?

- স্বাধীনতাবিরোধীদের অনেককেই ধরা হয় নাই। তবে আমাদের এলাকার যারা স্বাধীনতাবিরোধী ছিল, তাদেরকে স্বাধীনতার ছয় মাস পরও ধরে আনা হয়েছিল এবং মুক্তিযোদ্ধারা তাদের মেরে ফেলে।

আপনি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে কোন এলাকায় যুদ্ধ করেছেন?

- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমি যুদ্ধ করেছি খোলাহাটি, বদরগঞ্জ, পার্বতীপুর ও ভবানীপুর। এসব এলাকা আমার অপারেশন এরিয়া ছিল।

সবচেয়ে ভয়াবহ যুদ্ধ আপনি কোথায় করেছেন?

- সবচেয়ে ভয়াবহ যুদ্ধ করেছি জলপাইতলি।

সেখানে কীভাবে আপনি যুদ্ধ করেছেন?

- সেখানে আমরা পাকিস্তানি সৈন্যদের সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধ করেছি। ওখানে আমাদের তিনজন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হয়েছেন। তাদের একজনের বাড়ি ফুলবাড়ী আর দুইজনের বাড়ি বগুড়ায়।

আপনারা সেখানে কতজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন?

- আমরা সেখানে ছিলাম ১৭ জন।

আপনারা ১৭ জন মুক্তিযোদ্ধা খানসেনাদের ক্যাম্প অ্যাটাক করেছিলেন?

- হ্যাঁ, আমরা ১৭ জন মুক্তিযোদ্ধা পাঞ্জাবিদের ক্যাম্প অ্যাটাক করেছিলাম। আমাদের সঙ্গে বেঙ্গল রেজিমেন্টের একজন সৈনিক ছিল। সে রেকি করেছিল। আমাদের ইন্ডিয়া থেকে নির্দেশ দিছিল পাকিস্তানি সৈন্যদের বাংকার থেকে ৩০০ গজের মধ্যে পজিশন নিতে। কিন্তু ওই বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈনিক আমাদের ৫০ গজের মধ্যে নিয়ে গেছে। যদি পাকিস্তানি সৈন্যরা আমাদের দেখে ফায়ার করত, তাহলে আমরা কেউ হয়তো সে দিন বাঁচতাম না। আমরা পজিশনে যাওয়ার পর ইন্ডিয়া থেকে শেলিং শুরু হইছে। আবার খানরাও শেলিং করছে। ইন্ডিয়া থেকে শেলিং শুরু হবার পর খানসেনারা তুমুল ফায়ার শুরু করছে। তখন আমরা আর ফায়ার করার দিশা পাই না। কেউ গোবরের ভিড়ায় পড়ছি। কারও গায়ে ওই শেলিংয়ের মাটির চাপ পড়ছে। তিনজন সঙ্গে সঙ্গে মারা গেছে। আর একজনকে পরের দিন বেলা ১২টার সময় আমরা পাইছি। সে আর্মির ছিল। তার নাম বয়নউদ্দীন। পরের দিন ১২টার সময় সে ক্যাম্পে হাজির হইছে, ইন্ডিয়াতে। সে কোথায় যেন লুকিয়ে ছিল।

সে যুদ্ধে আপনাদের যে তিনজন সহযোদ্ধা শহীদ হলেন, তাঁদের লাশগুলা কি আপনারা উদ্ধার করেছিলেন?

- লাশগুলা পুরোপুরি পাওয়া যায়নি। একজনের হাত পাওয়া গেছে। কারও-বা মাথা।

সে যুদ্ধে আপনারা খানসেনাদের ক্যাম্প দখল করতে পারছিলেন কি?

- ক্যাম্প আমরা দখল করতে পারিনি। আমরাও ভাগি আসছি। খানসেনারাও ভাগি গেছে। পরের দিনে শুনলাম।

এরকম ভয়াবহ যুদ্ধ আর কোথায় করেছেন?

- আরেকটা ভয়াবহ শুরু হয়েছিল খোলাহাটি থেকে দক্ষিণে, হাজীপুর গ্রামে।

সেখানে কীভাবে যুদ্ধ হলো?

- সেখানে দিনের বেলা আমরা সংবাদ পাইলাম যে, ওখানে খানসেনারা অপারেশনে আসছে। জমিরহাট গ্রাম থেকে আমরা ওখানে রওনা দিলাম।

আমরা জনা পঞ্চাশেক মুক্তিযোদ্ধা গিয়ে দেখি খানসেনারা সেই গ্রামে অপারেশন করে বার হয়ে আসতেছে। ৩০ জন খানসেনা ছিল। আর ৬০-৭০ জন রাজাকার ছিল। তারপর আমরা দুই সাইড দিয়া তাদের ঘেরাও করলাম। করার পর ফায়ার শুরু হইল। ফায়ার বহুক্ষণ চলার পর ওরা একটা কাঁদানে গ্যাসের মতো কী যেন মারি দিয়া ভাগি গেছে। আমরা তারপর চুপচাপ। ধোঁয়াতে কিছুই দেখতে পাই না। পরে গিয়ে দেখি, ওখানে দুইটা গরু মরে আছে। আর দুই জায়গায় রক্তের দাগ পাওয়া গেল। মনে হয়, খানসেনাদের দু-একজন মারা গেছে। আমরা লাশ পাইনি।

দেশ স্বাধীন হওয়ার শেষ দিকে আপনি কোথায় যুদ্ধ করেছেন?

- দেশ স্বাধীন হওয়ার ঠিক এক দিন আগে আমরা এখান থেকে দেড় মাইল দূরে খোলাহাটির পাশেই বাগবার নামে এক গ্রামে ছিলাম। এটা হলো বদরগঞ্জ এলাকায়। ওখানে খানসেনাদের সঙ্গে আমরা লড়াই করি। ওখানে আমাদের এক মুক্তিযোদ্ধার চোখ তুলি নিছিল রাজাকাররা। এই সংবাদ অবশ্য আমরা আগে জানতাম না। খানসেনারা ভেগে যাওয়ার পর সেখানে আমরা যাই। এক ঘরে গিয়ে দেখি, দুইজন রাজাকার এক মেয়েকে বলাৎকার করতেছে। আমাদের সঙ্গে তখন প্রফেসর আফজাল সাহেব ছিলেন। ওদের একজনকে ধরতে পারছি। আরেকজনকে ধরতে পারি নাই। ওকে নিয়া আসি আমরা প্রকাশ্যে হত্যা করছি। হত্যা করার পর গিয়ে দেখি ওই কুমারবাড়িতে আমাদের এক মুক্তিযোদ্ধার দুইটা চক্ষু রাজাকাররা তুলি নিছে। তার নামটা এখন আমার মনে নাই। সে আমার এক বছরের জুনিয়র। আমাদের নুরুল মজিদ স্কুলের ফার্স্ট বয় ছিল। সে সঙ্গে সঙ্গে মারা গিয়েছিল।

যুদ্ধের শেষে গ্রামে ফিরে আপনার এলাকার অবস্থা কী দেখলেন?

- গ্রামে এসে দেখি আমাদের বাড়িঘর কিছু নাই। আমাদের গ্রামে কয়েক ঘর হিন্দু ছিল। এদের বাড়িঘর তো সব ধ্বংসপ্রাপ্ত। এমনকি তাদের গাছ, বাঁশ পর্যন্ত বাঙালিদের মধ্যে যারা রাজাকার ছিল, তারা কাটি নিয়ে গেছে। চারদিক শ্মশানের মতো।

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **ভবেন্দ্রনাথ বর্মণ**
ডিসেম্বর ০৩, ১৯৯৬

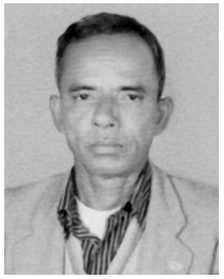

মো. সাহেব সরকার

পিতা : মৃত কাচু সরকার, পূর্ব ঠিকান—গ্রাম : রাজারামপুর
ইউনিয়ন : শিবনগর, থানা : পার্বতীপুর, বর্তমান ঠিকানা—গ্রাম ও ইউনিয়ন : আলাদীপপুর, ডাক : রাজারামপুর, থানা : ফুলবাড়ী, জেলা : দিনাজপুর
শিক্ষাগত যোগ্যতা : অষ্টম শ্রেণী, ১৯৭১ সালে বয়স ২১ বছর
১৯৭১ সালে বাবুর্চি ছিলেন, বর্তমানে কৃষিজীবী।

১৯৭১ সালের পঁচিশে মার্চ পাকিস্তানি সামরিক জান্তার আক্রমণ সম্পর্কে আপনি কী শুনেছেন?

- আমি শুনি যে, সেই দিন রাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে পাকিস্তানি সৈন্যরা অ্যারেস্ট করে পাকিস্তানে নিয়া যায় এবং ঢাকায় আওয়ামী লীগের সমর্থনকারীসহ সমগ্র বাঙালি জাতিকেই এরা গুলি করে মারতে শুরু করে। দোতলার ওপর থেকে আমি জানালা দিয়ে এসব দৃশ্য দেখি।

তখন আপনি কোথায় ছিলেন?

- আমি ঢাকায় ছিলাম।

পাকিস্তানি সৈন্যরা আপনার বাসায় গুলি করেনি?

- ও বাসাতে কোনো গোলাগুলি করে নাই। এটা সাবেক সংসদ সদস্য মুসলিম লীগের নুরুল হুদা চৌধুরী সাহেবের বাসা ছিল। সে জন্যই হয়তো ওই বাসায় কোনো আক্রমণ হয়নি। তবে আশপাশের সব বাসার দরজা-জানালা ওরা গুলি করে ঝাঁঝরা করে দিছে। অনেক লোকজনও মারা গেছে। কেউ হয়তো জানালা দিয়ে দেখতে গেছে, তখন তার চোখের মধ্যে গুলি লাগছে, মাথায় গুলি লাগছে, বুকে গুলি লাগছে। কেউ মারা গেছে সঙ্গে সঙ্গে। আর অনেকে চিকিৎসার অভাবে মারা গেছে।

আপনি নিজে দেখেছেন এগুলো?

- আমি নিজে দেখেছি। পাশের বাসায় প্রাচীর টপকায়ে গেছিলাম। সেই বাসায়

একজন আহত হইছিল। তার হাতে, বগলের ওপরে গুলি লাগছিল। উনার নাম ছিল সাদেক, বাড়ি ছিল কুষ্টিয়া। ওই বাড়িতে কাজ করতেন মালি হিসাবে। আমি আর ঢাকাতে থাকতে পারলাম না। আমার পরিচিত আবদুল জব্বার নামে এক ছেলে ছিল, সে-ও একজনের বাসাতে আমার মতো বাবুর্চির কাজ করত। জব্বার এবং আমি ২৭ মার্চ তারিখে ময়মনসিংহ রওনা দেই ওই এলাকা নিরাপদ ভেবে। কিন্তু রাস্তা ভুলে আমরা টাঙ্গাইলে চলে গিয়েছিলাম। কিন্তু টাঙ্গাইলের জনগণের সহযোগিতায় আমরা ময়মনসিংহ পর্যন্ত যেতে পেরেছি সাত দিনের মাথায়।

ঢাকা থেকে ময়মনসিংহ যাওয়ার পথে আপনি কি কোথাও বাধাগ্রস্ত হয়েছিলেন?

● হ্যাঁ, হয়েছিলাম। টাঙ্গাইলের উত্তর পাশে রাস্তার ধারে আমরা কেবল উঠতেছি, তখন খানসেনারা আমাদের ধরে। ওখানে এক ব্রিজের নিচে খানসেনাদের জিপ দাঁড়ানো ছিল। ওই পাশ দিয়ে পার হতেই এক পাকিস্তানি মিলিটারি আমাদের ডাকে। ডাকার পরে আমরা তাদের কাছে যাই। তখন ওরা উর্দু ভাষায় আমাদের সঙ্গে কথা বলে। আমি নিজেও উর্দু বলতে পারতাম। আমার গলার মধ্যে একটা বড় চাদির তাবিজ লাগানো ছিল। উর্দু জানি বলে উর্দুতেই আমি ওদের কথার জবাব দিতে পারছি, সে জন্যই হয়তো আমাকে ওরা আর মারে নাই। বরং ওরা আমাদের রাস্তা দেখিয়ে দিল। পাকিস্তানি সেনারা এ সময় বলেছিল, তোমরা খুব সাবধানে থাকবে, সামনে বাঙালিরা তোমাদের পেলে মেরে ফেলবে। কিছুদূর যাওয়ার পর আমরা আবার বিহারিদের পাল্লায় পড়ি। ওই বিহারিরাও আমার সঙ্গে উর্দুতে কথা বলেছিল, 'ঘার কাহা হে, কাহা যাওগে?' উর্দু ভাষাতেই বলছিলাম আমি ঢাকা থেকে আসছি এবং আমি ময়মনসিংহ পর্যন্ত যাব। তখন ওরা বলেছে, 'সামনে বাঙালিরা আছে, তোমাদের শেষ করে দেবে, সুতরাং তোমরা আমাদের সঙ্গে চলো।' তখন আমি ওই বিহারিদের বললাম, ভাই, আমরা বাংলাও বলতে পারি। অনেক জাগায় আমাদের আটক করেছিল, কিন্তু কেউ আমাদের ধরতে পারেনি। ময়মনসিংহ পর্যন্ত গেলে আমরা বেঁচে যাব—এমনটা আমার মনে হলো। বিহারিরা আমাদের বলল যে দক্ষিণ দিকে না গিয়ে পশ্চিম দিকের রাস্তা হয়ে যেতে। ওরা একটা গ্রামের নাম বলছিল ছাতনিয়া। বলছিল যে ছাতনিয়া গ্রামে আমাদের মিলিটারিরা আছে। সেই মিলিটারিদের কাছে গেলে তোমাদের ময়মনসিংহের রাস্তা দেখিয়ে দেবে। আমরা ওদের আড়াল হয়েই পশ্চিম দিকে না গিয়ে পূর্ব দিকে যেতে থাকি। যাওয়ার পথে আমাদের সঙ্গে কিছু লোকের দেখা হয়। তখন ওরা আমাদের জিজ্ঞাসা করল আমরা কোথায় যাব। বললাম, আমরা ঢাকা থেকে আসতেছি, আমরা ময়মনসিংহে যাব। তখন একজনে

জিজ্ঞাসা করতেছে যে, ভাই, আপনার ভাষা তো ময়মনসিংহের ভাষা না। তখন আমি লোকগুলোকে বললাম যে, ভাই, আমার বাড়ি দিনাজপুর ডিস্ট্রিক্ট, পার্বতীপুর থানা, শিবনগর ইউনিয়ন। আমি ঢাকা থেকে আসতেছি। আমি কোন রাস্তায় আমার দেশে যেতে পারব? আমার বাবা নেই, আমার মা, ছোট ভাইবোন বাড়িতে আছে, তারা কীভাবে আছে, জানি না। এটা খোঁজখবর না নেওয়া পর্যন্ত আমি খুব অশান্তির মধ্যে আছি। আর আমি বেঁচে আছি, না মারা গেছি—তার জন্য আমার মা, ভাইবোন এবং আত্মীয়স্বজনেরা হয়তো খুব কান্দাকাটি করতেছে। আপনারা আমাকে একটু সহযোগিতা করেন যে কীভাবে কোন রাস্তায় আমি দিনাজপুর পর্যন্ত যেতে পারব। তখন উনারা বলল, ভাই, আপনি কীভাবে অত দূর যাবেন? যানবাহন সব বন্ধ। আপনি কী করে নদী পার হবেন? আপনি আমাদের সঙ্গে চলেন। কয়লাঘাট দিয়ে আমরা আসাম চলে যাব। আমরা আসাম যাচ্ছি। তারপর দেশের কী হয় না হয়, সেটা দেখার পর এবং দেশে যদি শান্তি আসে তাহলে আমরা দেশে আসব। তাদের কথার ওপর ভরসা করে আল্লাহর ওপর ভরসা করে ওই লোকদের সঙ্গে আবদুল জব্বার সহকারে আমি আসামে চলে যাই। আসামে যাইয়া দেখি বাংলাদেশ থেকে অনেক লোকজন গেছে। সে অন্য রকম এক দৃশ্য, আমার বুক ফেটে যায়। চোখের পানি ধরে রাখাও কঠিন। আমরাও তাদের মতো এমনই শরণার্থী। ভারতে আমরা আশ্রয় নিলাম আর ভারত সরকারও আমাদের আশ্রয় দিল। আমরা তো পরে আসলাম। আমাদের আগেই সেখানে অনেক লোক গেছে।

আপনি কেন মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেন?

● আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করলাম বাঙালি জাতির অধিকার আদায়ের জন্য। খানসেনারা মা-বোনের ইজ্জত নেয়, বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়, হত্যা করে, এসব প্রতিরোধে আমরা বাংলাদেশ থেকে ভারতে আশ্রয় নিই। তখন আমাদের যে বড় বড় নেতারা ছিলেন, উনারা মুক্তিবাহিনী গঠন করেন ভারত সরকারের সহযোগিতায়। আমি ফার্স্ট ব্যাচেই ট্রেনিং নেওয়া শুরু করি।

পাকিস্তানি সৈন্যরা আপনার এলাকায় এসে কী করেছিল সে সম্পর্কে আপনি কি কিছু জানেন?

● আমি ট্রেনিং শেষ করে কাটলা ক্যাম্পে ফিরে আসি। সেখানে আমার এলাকা থেকে বিভিন্ন খবর নিয়ে অনেকে আসত। তাদের কাছ থেকে আমরা শুনতে পেয়েছি, ফুলবাড়ী-পার্বতীপুর এলাকায় পাকিস্তানি সৈন্যরা ভালো ভালো লোককে ধরত। ধরে গুলি করে মারত, বেয়নেট চার্জ করে মারত, বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিত। যাদের পাইত না তাদের আত্মীয়স্বজনকে ছোট ছোট বাচ্চাকাচ্চা

সহকারে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারার কথা শুনেছি। এসব কথা কতটুকু সত্য তা জানার জন্য আমি একদিন রাত্রিবেলা নিজেই এক মুক্তিযোদ্ধাকে সঙ্গে নিয়ে অতি সাধারণ পোশাকে বাংলাদেশে প্রবেশ করি। আমার সঙ্গে অস্ত্র ছিল দুটি গ্রেনেড ও একটা এসএমজি। আমার নিজ এলাকায় আসি দেখি যে আমার এলাকায় ২৩ জন লোককে সেই দিনই খানসেনারা হত্যা করছে। এই ঘটনা দেখার পর আমার সঙ্গে যে একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিল, তার বাড়ি ছিল রংপুরের বদরগঞ্জ থানার নোহালীপাড়ায়। সে ছিল উপজাতি, একজন সাঁওতাল। তার নাম ছিল ফুচু। সে খুবই দুঃসাহসী ছিল। সে বলল, দাদা, আপনার এলাকার খবরটা তো আমরা নিলাম। কিন্তু আপনার মা-ভাই-বোন কোথায় আছে, সেই খবর এখনো পর্যন্ত আপনি পাননি। এদিকে আমার বাবা-মা কেমন আছেন, সেটা না জেনে আমিও শান্তি পাচ্ছি না। তো আপনি আমার সঙ্গে একটু বদরগঞ্জ পর্যন্ত চলেন।

আমি তখন ফুচুকে বলি, দেখো, তোমার হাতে তো কোনো অস্ত্র নেই। আমার কাছে একটি এসএমজি, দুইটা গ্রেনেড এবং ৪০ রাউন্ড গুলি আছে। এই নিয়ে যদি কোনো পাকিস্তানি সেনার সামনে পড়ে যাই, তাহলে আমরা কেমন করে মোকাবিলা করব? যদি মোকাবিলা করতে হয়, তাহলে আমাদের সমর্থন দেবে কে? আমি এই জায়গায় অনুসন্ধান করে দেখব যে, এখানে আমাদের কোনো মুক্তিবাহিনী আছে কি না। যদি থাকে তবে তাদের সঙ্গে আমরাও থাকব এবং কিছু গোলাবারুদ এবং তোমার জন্য একটা অস্ত্র নিয়ে আমরা তোমার বাড়ি রওনা দিব। এই কথা শুনে ফুচু খুব খুশি হলো এবং বলল, ঠিক আছে, আমরা আপনার পরিকল্পনা অনুযায়ী রওনা দিব। কথাটা আমি যখন বলছিলাম তখন সকাল সাড়ে দশটা। বেলা দুইটা বাজতেছে এমন সময় আমাদের খোঁজে একজন মুক্তিযোদ্ধা আসলো। তার নাম তসলিম, পার্বতীপুরের রামপুরাতে বাড়ি। তার কাছে একটা এসএলআর, ১৪০ রাউন্ড গুলি এবং দুইটা গ্রেনেড ছিল। তাকে বললাম, ভাই, তুমি এক দিন এখানে হোল্ড করো এবং তোমার হাতিয়ারটা ফুচুরে দাও। ফুচুকে নিয়ে আমি ওর বাড়ি যাব। আমরা ওর গ্রাম নোহালীপাড়া পর্যন্ত যেতে না পারলেও পাশের গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছে জানব যে ওর বাবা-মা, ভাই-বোন, বউ বেঁচে আছে নাকি মারি ফেলেছে, না অন্য কোথাও আছে। আমার কথা শুনে তসলিম তার এসএলআরটা এবং তার যতগুলা গুলি ছিল সব ফুচুর হাতে তুলে দিল। আমরা রওনা করলাম বেলা সাড়ে পাঁচটার দিকে। তসলিম কেবল গ্রেনেড দুইটা রাখল।

ভবানীপুর এবং ফুলবাড়ীর মাঝখানে হচ্ছে রসুলপুর। রসুলপুর গুমটি দিয়ে বর্তমানে যেখানে কয়লাখনি হয়েছে মধ্যপাড়ায়, সেই রাস্তায় না গিয়ে পাতাবীর

খেতবাড়ির মাঝখান দিয়ে আমরা চলে যাই খলিলপুর সরদারপাড়া। খলিলপুর সরদারপাড়ায় আওয়ামী লীগের একজন ভালো নেতা ছিলেন। উনার নাম ছিল আনিসুল হক চৌধুরী। ভাবলাম উনি আছেন কি না সেটা জেনে নিই। কয়েকজনকে জিজ্ঞাসা করায় লোকে কইছে, না, উনারা যে কোথায় আছে তা আমরা জানি না। এখন আমাদের নিজেদেরই জান বাঁচতেছে না। কয়েক দিন আগে মুক্তিবাহিনী আসি খানসেনাদের সাথে টুকটাক গোলাগুলি করার পর ওরা আমাদের গ্রামসুদ্ধ সব জ্বালিয়ে দিছে। একজন বয়স্ক লোক বলল, ভাই, আপনাদের বাড়ি কোথায়? তখন আমি বললাম, আমার নাম সাহেব সরকার। আমার বাড়ি রাজারামপুর। শিবনগর ইউনিয়ন। তখন ওরা বলল, আপনারা এখানে কী জন্য আসছেন? আমরা বলছি, আমাদের এখানে আত্মীয়স্বজন আছে তাদের একটু খোঁজখবর নেওয়ার জন্য আসছি। আর আমার সঙ্গে যে আছে, তার বাড়ি নোহালীপাড়া। তো উনি নোহালীপাড়ার খবরটা জানতে আসছেন। তারা তখন বলে, আপনারা আসছেন কোথা থেকে, এখন আছেন কোথায়? আর একজন আমাকে বলল, আপনার পিছনে চাদর দিয়ে ঢাকা ওটা কী? তখন ওরা পুরাপুরি বুঝতে পারল যে আমরা দুজন মুক্তিযোদ্ধা। তখন ওরা খুব খুশি হয়ে আমাদের দুইজনকে নিয়ে গিয়ে এক বাড়িতে খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করল। তারা খুব খাতির-যত্ন করছিল, তথাপি আমাদের মনে একটা ভয় ছিল। আমাদের আগে থেকেই বলা ছিল যে যদি তোমাদের কেউ খেতে দেয়, তবে দলবদ্ধভাবে তোমরা যাবে না। একজন খাইলেও আরেকজন বাড়ির বাইরে ডিউটি দিবে, বলা যায় না কার মনে কী আছে। হতেও পারে তোমাদের খাইতে দিয়া পাকিস্তানি সেনাদের খবর দিয়া তোমাদের মারি ফেলবে। এই কথা মনে করে আমি ফুচুকে খেতে বললাম। আমি বললাম, তুমি খাও, তোমার খাওয়ার পরে তুমি পাহারা দিবে, আমি খাব। এই কথামতো ফুচু খেতে গেল। ওই বাড়ির মালিক রহিম নামের এক লোক। উনি এখন বাঁইচা আছেন কি না, তা জানি না। উনি বলল, ভাই, তোমরা কেন ভয় করতেছ? আমিও তো বাঙালি। আমরাও আওয়ামী লীগের লোক, আমরা তোমাদের কোনো ক্ষতি করব না। আমাদের দেশ স্বাধীন হওয়ার জন্য তোমরা অস্ত্র হাতে নিয়েছ এবং তোমরা জান দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। বাঙালি হয়ে বাঙালির ওপর আমরা নিমকহারামি করতে পারব না। এই কথা বলার পরও আমি বিশ্বাস করলাম না। না করে ফুচুকে খাইতে বললাম। আর আমি বাইরে আমগাছের নিচে এসএমজিতে গুলি লোড করে সেন্ট্রি হিসাবে পাহারা দেই। যখন ফুচুর খাওয়া শেষ হয় তখন ফুচু আসি পাহারা দেয়, আর আমি গিয়ে খাই। খাওয়াদাওয়ার পর ওই লোকসহকারে নোহালীপাড়ায় ফুচুর বাবা-মা, আত্মীয়স্বজনের খোঁজখবর নিতে যাই। সেখানে

গিয়ে শুনলাম নোহালীপাড়ার দক্ষিণ পাশে বড় একটা পুকুর আছে, সেই পুকুরের কাছে ফুচুর এলাকার ১৩২ জন হিন্দু, ৬২ জন মুসলমানকে খানসেনারা, আমরা যে দিন যাই তার আগের দিন, গ্রাম ঘিরে সবাইকে ধরে পুকুরপাড়ে নিয়ে গিয়ে হত্যা করছে। এই কথা শুনে আমার গলা ধরে ফুচু খুব কাঁদতে শুরু করল। একপর্যায়ে সে মাটিতে পড়ে গেল। আমি তার মাথায়, বুকে হাত বুলিয়ে বললাম, দেখো, আমরা মুক্তিযোদ্ধা। যুদ্ধ করা অবস্থায় যদি আমাদের জান চলে যায় যাক। আমার ভাই কি মা কি বাপ অথবা আত্মীয়স্বজন যদি কেউ মারা যায় তো যাক। কয়টাকে খানসেনারা মারবে? তুমি একটু ধৈর্য ধরো। চলো, এখন তো আর খানসেনারা নাই। তুমি আর আমি গিয়ে দেখি প্রকৃত অবস্থাটা। কারণ, লাশগুলো তো ওরা পুঁতি ফেলে নাই। পুকুরের পাড়েই হয়তো পানির মধ্যে নয়তো গর্তের মধ্যে ফেলায় রাখছে। চলো গিয়ে দেখি, দেখি কোনটা তোমার মা, তোমার বউ আর ছেলেমেয়ে। আমরা দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ দিয়ে পুকুরের দক্ষিণ-পশ্চিমে যে বিরাট একটা তেঁতুলগাছ ছিল, সেই গাছের কাছে গেলাম। গিয়ে দেখি ঘটনা সত্য। এমন সময় একটা লোক উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে আমাদের দিকে দৌড়ে আসতেছে। আমি সন্দেহ করলাম যে এ লোক হয়তো কোনো বিহারি হবে, নতুবা পাঞ্জাবিদের কোনো অনুচর। সঙ্গে সঙ্গে আমি গুলি লোড করে ফেললাম এবং ট্রিগারে হাত দিয়া পজিশনে বসে পড়লাম। তখন দূর থেকে ওই লোকটা হাত তুলে আসি আমার কাছে বলছে, ভাই, আমি বাঙালি, আপনারা আমাকে গুলি করে মারবেন না। আপনারা কে, কী জন্য আসছেন? তখন আমি বললাম, আমাদের আপনার কী মনে হয়? তখন সে বলছে, ভাই, আমি আপনাদের মুক্তিবাহিনী মনে করে দৌড়ে আসতেছি। ভাই, এখানে আমার বাপ, মা, ছেলেমেয়ে সবাইকে ওরা শেষ করছে। আমরা ছয়জন আছি এ জন্য যে কুকুর-শেয়ালে এই লাশগুলোকে নষ্ট করে ফেলবে, তাই কিছু করা যায় কি না ভাবছি। আমি মুসলমান। এই এলাকাতে কোনো লোকজন নাই। মনে হয় ৪০০ জনকে খানসেনারা মারি ফেলছে। এদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান-সাঁওতাল সবাই আছে। এদের সবার তো কবর দেওয়া সম্ভব নয়। আমার বাবার চেয়ে বেশি ইজ্জত আমার মায়ের। আপনারা একটু সহযোগিতা করেন, পুকুরপাড়ে পাহারায় থাকেন, আমার মাকে অন্তত গর্ত করি পুঁতি রাখি। জানাজা করতে পারব না। তখন আমি বললাম, ভাই, ঠিক আছে। আপনারা একটু ধৈর্য ধরুন, এই গ্রামে লোকজন কেউ না কেউ আছে।

এরপর আমরা পুকুরের উত্তর পাশে গিয়ে দেখি সবাইকে হাত-পা বাঁধি গুলি করি মারে নাই, ওদের খালি বেয়নেট চার্জ করি হত্যা করা হয়েছে। তারপর পূর্ব দিকের কর্নারে গিয়ে দেখি, ওখানে শুধু যুবতী মেয়েদের হত্যা করা হয়েছে।

ওখানে হিন্দু-মুসলমান কোনো ভেদাভেদ নাই। আর একটা বীভৎস ব্যাপার। আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, দেখলাম, বেশির ভাগ মেয়ের স্তন তারা কেটে নিয়েছে। কোনো মেয়ের ডান দিকের, কারও বাম দিকের স্তন কেটে নিয়েছে। কাউকে কাউকে গুপ্তস্থানে বেয়নেট দিয়ে আঘাত করে করে মারা হয়েছে। কোনো কোনো মেয়ের গালে আমি কামড়ের দাগও দেখেছি। একটা মেয়েকেও তারা গুলি করে মারে নাই। সবাইকে বেয়নেট চার্জ করে মারা হয়েছে। এই সমস্ত দেখে আমার এবং আমার সঙ্গে যারা ছিল তাদের কারও চোখের পানি আর আটকা থাকে নাই। এসব দৃশ্য আমরা সহ্য করতে পারছিলাম না। তারপর গেলাম দক্ষিণ-পূর্ব কর্নারে। সেখানে গিয়ে দেখি ছয়জন পুরুষ মানুষ হাত-পা বাঁধা মৃত অবস্থায় পড়ে আছে। তারা হলো সাঁওতাল। তার মধ্যে ফুচুর বাবা-ভাই ছিল। তার বাবা এবং বড় ভাইকে ওখানে হত্যা করা হয়েছে। তখন ফুচু তার বাবা এবং ভাইকে দেখে ওই লাশের ওপর আছড়ে পড়ল। সে হাতিয়ার পানির মধ্যে ফেলায় দিয়ে বলছে, আর আমি বাঁচব না, আমার নিজের জান আমি নিজেই শেষ করব। আমার বাবা-মা, ভাইবোন কেউ আর বাঁচি নাই, আমার এই জীবন থুইয়া আর কী লাভ? আমাদের সঙ্গে ওই গ্রামের যে লোক ছিল, সে ফুচুকে সান্ত্বনা দিয়া বলল, ভাই, তুমি সাঁওতাল হয়েও তুমি এই দেশকে স্বাধীন করার জন্য অস্ত্র হাতে নিয়েছ। তোমার মতো কত মুক্তিযোদ্ধার মা-বাবা, ভাইবোন জীবন দিয়েছে, ইজ্জত দিয়েছে, তার পরও তারা ভেঙে পড়ে নাই। তোমাকে শক্ত হতে হবে। পাকিস্তানি খানসেনাদের বিরুদ্ধে তোমাকে যুদ্ধ করতে হবে। এই বাংলাদেশকে স্বাধীন করতে হবে। তখন ফুচু চোখের পানি মুছে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে তার হাতিয়ার পানি থেকে তুলে নিয়ে শপথ করল: আমার এক বিন্দু রক্ত থাকতে আমি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে ছাড়ব না।

তারপর সেখান থেকে আপনারা ফিরে এলেন?

● ওই গ্রামের যে লোক আমাদের সঙ্গে ছিল তার নাম আবদুল জব্বার। তার বাবা এবং মাকে পাকিস্তানি সৈন্যরা মারি ফেলছিল। কবর খুঁড়তে পারে নাই। ওটা তো লালমাটি এলাকা, ওই সময় মাটি খুব শক্ত ছিল। একটু গর্ত করে তার বাবা-মাকে বিনা জানাজায় মাটি দেওয়া হয়। ওই দিন বেলা সাড়ে ১১টা-১২টার সময় আমরা ওখান থেকে, মধ্যপাড়া গুড়গুড়ির ওখানে শালবন নামে যে জায়গা আছে, তার দক্ষিণ পাশে চলি যাই।

তারপর?

● ওখানে আমাদের কোনো মুক্তিযোদ্ধা ছিল না। আমরাও খুব ক্লান্ত ছিলাম। এই মুহূর্তে আমরা কোথায় যাই, কার বাড়িতে যাই! সন্ধ্যা লাগতেছে। তখন আমার মনে হলো, এখানে সাহেবগঞ্জ নামে একটা গ্রাম আছে এবং যে গ্রামে আমাদের

নূরুল হুদা চৌধুরীর ভাগনি এবং বোনের শ্বশুরবাড়ি। ঠিক করলাম, ওখানেই যাব। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই আমার খেয়াল হলো, নূরুল হুদা চৌধুরী তো মুসলিম লীগের লোক, তার আত্মীয়স্বজনও তো মুসলিম লীগের হতে পারে। এই মনে করে আমি আর ওখানে গেলাম না। না গিয়ে ফুলবাড়ী এবং বিরামপুরের মাঝামাঝি রাস্তায় রওনা দিলাম। ফুলবাড়ীর পূর্ব দিকে আমেরডাঙ্গা এসে একজন লোকের সঙ্গে দেখা হলো। তাঁর সাথে আলাপ করে বুঝতে পারলাম, তিনি আওয়ামী লীগের একজন কর্মী এবং মুক্তিবাহিনীকে সাহায্য করছেন। যদি কোনো মুক্তিযোদ্ধা বিপদে পড়ে তবে তাকে সাহায্য এবং তার খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা উনি করে দিতেন। এ জন্যই নাকি রাস্তার মধ্যে তিনি পাহারা দেন। আমাদের দেখেই তিনি বুঝতে পারছেন আমরা মুক্তিবাহিনী। বিশ্বাস জন্মাবার পর আমরা তাকে ঘটনা বিস্তারিত খুলে বললাম। বললাম, আমরা হয় চিন্তামন ডাকবাংলা নতুবা মেলাবাড়ীর দিকে যাব। ওই দিক দিয়া আমরা আমাদের ক্যাম্পে ফেরত যাব। তখন তিনি বলছেন, ভাই, আপনে বলতেছেন ডাকবাংলা যাবেন, কিন্তু ডাকবাংলাতে তো খানসেনাদের ক্যাম্প। সেটা হলো মাদিলা ডাকবাংলা। ওখানে খানসেনাদের ক্যাম্প। আমরা খুব চিন্তায় পড়ে গেলাম। তার পরই বললাম, ভাই, কোন রাস্তাটায় গেলে আমরা রেললাইনটা ক্রস করতে পারব, আপনে একটু সহযোগিতা করেন। আমেরডাঙ্গা থাকি ফুলবাড়ী রেলস্টেশন মনে হয় এক থেকে সোয়া মাইল পশ্চিমে। তো উনি ফুলবাড়ী রেলস্টেশনের দক্ষিণ কর্নার দিয়ে আমাদের পার করে দিলেন। সে জায়গাটার নাম বারকোনা। তারপর উদ্রানী ক্যাম্প হয়ে আমরা আবার নিজের ক্যাম্পে ফিরে যাই।

মুক্তিযুদ্ধের সময় আপনার পরিবারের কেউ কি শহীদ হয়েছেন?

- আমার পরিবারে চারজন শহীদ হয়েছেন। আমার এক মামা, এক ভাই, এক ভগ্নিপতি আর এক বোন।

তারা কীভাবে শহীদ হলেন?

- তারা একদিন রাস্তা ক্রস করার সময় খানসেনাদের সামনে পড়ে যায়। খানসেনারা তখন ফুলবাড়ী থেকে দিনাজপুর যাচ্ছিল। খানসেনাদের দেখে ওরা এক খালি বাড়ির ঘরের মধ্যে চৌকির নিচে ঢুকে গেছিল। খানসেনারা সেই বাড়িতে গিয়ে বেয়নেট দিয়ে তাদের হত্যা করে। এ খবর আমি পরে শুনছি।

আপনি পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে আক্রান্ত হয়েছিলেন কি?

- হ্যাঁ। আমি আক্রান্ত হয়েছিলাম। ইন্ডিয়ার মালদা থেকে বর্ডার ক্রস করার সময় খানসেনাদের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ হয়। তখন আমার পিঠে গুলি লাগে। গুলি লাগার পর আমার জ্ঞান ছিল না। সহযোদ্ধারা আমাকে পাশেই একটা

চিকিৎসাকেন্দ্রে নিয়ে যায়। সেখানে গুলিটা তারা বার করতে পারেনি। পরে মালদহ সদর হসপিটালে নিয়ে গিয়ে আমার পিঠে অপারেশন করে গুলি বার করে। ছয় ঘণ্টা পর আমার জ্ঞান ফিরে। চোখ মেলি দেখি যে আমি একটা হসপিটালে এবং আমার স্যালাইন চলতেছে। ১৬ দিন সেখানে ছিলাম।

তারপর?

- সুস্থ হয়ে আবার আমি যুদ্ধে গেলাম।

আপনার এলাকায় রাজাকার বাহিনীর তৎপরতা কখন থেকে শুরু হয়?

- যারা মুসলিম লীগ-সমর্থক এবং খানসেনাদের দালাল ছিল, তারা জোরজবরদস্তি করে বাড়ি ঘেরাও করিয়া ছেলেদের ধরে নিয়ে গিয়ে রাজাকারে ভর্তি করায়। তখন একজন আমাদের ক্যাম্পে খবর দেয় যে, এভাবে যদি আমাদের গ্রামের ছেলেপেলেগুলোকে এরা জোরপূর্বক রাজাকার বানায়, তাহলে মুক্তিযোদ্ধা হবে কে? এইটা কীভাবে বন্ধ করা যায়? তখন আমাদের মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারের নির্দেশে ক্যাম্প থেকে ১৬ জন মুক্তিযোদ্ধা আমাদের এলাকায় যায়। তখন আমার এলাকার রাজাকার ছিল আবুল কাশেম, আজু হক, মনসুর মোল্লা, আবুল বকর, লোকমান আলী, সাবের, জিল্লুর রহমান চৌধুরী, চান চৌধুরী, হবিবর, আনসার, শহীদ। আমার এলাকায় যে ১৬ জন মুক্তিযোদ্ধা যায়, তাদের মধ্যে একজনের নাম ছিল আসদ্দি। তার বাড়ি রাজারামপুর মৌজার ফকিরপাড়ায়। সে হবিবর রাজাকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং তাদের আত্মসমর্পণ করতে বলে। কিন্তু সে আমাদের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয়। আমরা চিঠি দিয়ে জানাইছিলাম, তারা যদি অস্ত্রসহকারে আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে, তাহলে আমরা তাদের মুক্তিবাহিনীতে গ্রহণ করে নেব। কিন্তু তারা আত্মসমর্পণ করেনি। যাদের নাম বললাম তারা বেশির ভাগ স্বেচ্ছায় গেছে। আমরা পরে আরও খবর পাইলাম যে, এরা খানসেনাদের সহযোগিতার পাশাপাশি বাঙালি হিন্দু-মুসলমান যারা জানের ভয়ে ইন্ডিয়ায় পালাচ্ছিল, তাদের জিনিসপত্র লুট করে নিচ্ছে। কাউকে কাউকে হত্যা করত। সুন্দরী যুবতী মেয়েদের ধরে রেখে দিত। ওই এলাকায় কেনান নামে এক লোক ছিল। সে খানসেনাদের দালাল এবং পিস কমিটির চেয়ারম্যান ছিল বলে জানি। আমার বাড়ি থেকে পশ্চিমে বড়াইহাটের দক্ষিণে এক মাইল দূরে এক পুকুরের পাড়ে না হলেও দেড় শ থেকে পৌনে দুই শ লোককে এক দিনেই হত্যা করছে সে এবং তার দলবল। নিহতদের সবাই ছিল হিন্দু। এ সময় ভদ্র-শিক্ষিত ফ্যামিলির ছয়জন মেয়েকে ধরে নিয়ে যায় এই কেনানের লোকজন।

আপনার এলাকায় মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা কখন থেকে শুরু হয়?

- এপ্রিলের শেষের দিক থেকে।

আপনি কখন তৎপরতা শুরু করেন?

- মে মাসের প্রথম দিক থেকে আমি তৎপরতা শুরু করি।

আপনার এলাকায় যারা রাজাকার, আলবদর, আলশামস এবং শান্তি কমিটির সদস্য ছিল তাদের কি ধরা হয়েছিল?

- স্বাধীন হওয়ার পর আমাদের কমান্ডার আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের নির্দেশ দিলেন এলাকায় যত রাজাকার, আলবদর আছে তাদের ধরার জন্য। আমরা খুবই চেষ্টা করেছিলাম ধরার জন্য। কিন্তু তাদের আমরা পাইনি। তারা দেশ স্বাধীন হওয়ার আগ দিয়া পালিয়ে গেছিল। তারা বর্তমানে গ্রামেই আছে।

মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আপনি কোন কোন এলাকায় যুদ্ধ করেছেন?

- সরাসরি আমি যুদ্ধ করেছি বর্তমান চাঁপাইনবাবগঞ্জের রোহনপুরে।

সবচেয়ে ভয়াবহ যুদ্ধ কোথায় করেছেন?

- সেটা হয়েছে চাঁপাইনবাবগঞ্জের আমনুরা রেলওয়ে জংশনের উত্তর-দক্ষিণ সাইডে।

আপনারা কতজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন?

- আমরা ৬২ জন মুক্তিযোদ্ধা ছিলাম।

কীভাবে যুদ্ধ হলো সেখানে?

- আমনুরা স্টেশনের উত্তর পাশ দেখতে অনেকটা পাহাড়ি এলাকার মতো। অনেক টিলা সেখানে ছিল। তার দুই মাইল দূরে আমাদের বাংকার ছিল। ওখানেই বাংকার করে আমরা ছিলাম। আমাদের কাছে খবর আসলো যে চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে খানসেনারা আমনুরা-রোহনপুরের দিকে আসতেছে। খবর পেয়ে কমান্ডারের কাছে আমরা বলি যে, স্যার, বহু খানসেনা নাকি এদিকে আসতেছে, এদের সঙ্গে আমরা কীভাবে মোকাবিলা করব? তখন কমান্ডার বলছেন যে, আমাদের কাছে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র-গোলাবারুদ আছে। যদি ওরা ৫০০ জনও হয়, তাহলেও আমরা এই গোলাবারুদেই তাদের মোকাবিলা করতে পারব। আমাদের কমান্ডার জিজ্ঞাসা করলেন, ওরা কত দূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছে? তখন আমরা বললাম যে, এ কথাটা আমাদের কাছে আসা বার্তাবাহক বলতে পারে নাই যে, ওরা কত দূর পর্যন্ত অগ্রসর হইছে। খবরের গুরুত্ব বুঝে কমান্ডারের নির্দেশমতো আমরা সেখান থেকে তাড়াতাড়ি আমনুরা আসি। তখন পাকা রাস্তা ছিল না, রেললাইনের পূর্ব পাশ দিয়ে কাঁচা রাস্তা ছিল। আমরা পুকুরের ধারে কিংবা বাঁশঝাড়ের মধ্যে গিয়ে বাংকার খোঁড়ার কোনো সময় পাইনি। তাই আমরা উঁচা আইল, পুকুরের ধার, গাছের কর্নারে পজিশন নিলাম।

  রেললাইনটা ছিল উত্তর-দক্ষিণে। আমরা কমান্ডারের নির্দেশে তিনটা ডিফেন্স করলাম। যদি ওরা দক্ষিণ দিক থেকে উত্তর দিকে অগ্রসর হয় এবং আমরা যদি সামনে থেকে বাধা দেই, তাহলে ওরা পশ্চিম দিকে রেললাইনের ধারে পজিশন নিতে পারে, নতুবা রাস্তার পূর্ব দিকে পজিশন নিতে পারে। তাই নির্দেশ অনুযায়ী প্রথম ডিফেন্সে দুইটা এলএমজি আর ছয়টা এসএমজি নিয়ে লাইনের পশ্চিম দিকে পূর্ব মুখে একদল মুক্তিযোদ্ধা পজিশন নেয়। চারটা এলএমজি এবং একটা এসএমজি নিয়ে রাস্তার পূর্ব দিকে আর একদল মুক্তিযোদ্ধা পজিশন নেয়। আর একটি মেশিনগান, ছয়টি এলএমজি আর একটা এসএমজি নিয়ে রেললাইনের ব্রিজের গার্ডারের নিচে আমরা পজিশন নেই। একটা অ্যান্টি-ট্যাংক মাইনও আমরা ব্রিজে ফিট করেছিলাম। যদি ওরা কোনো মোটর ট্রলি নিয়াও আসে, তাহলেও মাইন ব্রাস্ট করি গাড়িসহকারে ওদের উড়িয়ে দেব, এমন চিন্তা ছিল আমাদের। কিন্তু খানসেনারা কোনো ট্রলিতে আসে নাই। পায়ে হেঁটেই আসছিল। আমরা পজিশন নেওয়ার এক ঘণ্টা পর খানসেনারা আসলো। আমাদের কমান্ডারের কাছে একটা দুরবিন ছিল। তিনি দুরবিন দিয়ে সব দেখলেন। দেখার পর বললেন, খানসেনারা আসতেছে, বহুসংখ্যক। তোমরা পজিশনে থাকবে, তোমাদের গুলি এবং অন্যান্য সামগ্রী সাপ্লাই দেওয়া হবে। তোমরা আমার নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত গুলি করবে না। সেই মুহূর্তে আমি আমার কর্মীদের সতর্ক করে দিলাম এবং সাহস দিয়ে বললাম যে তোমরা কোনো ভয় পাবে না। সহযোদ্ধাদের সাহস দিয়ে আমি পুকুরের ধারে আমার নিজ পজিশনে গিয়ে বসলাম। আমার কাছে এলএমজি এবং ৪৩২ রাউন্ড গুলি ছিল। যখন খানসেনারা আমাদের রেঞ্জের ভিতরে আসছে তখন আমাদের কমান্ডার নির্দেশ দিলেন ফায়ারের। আমরা পশ্চিম দিকে যারা রেললাইনের সামনাসামনি পজিশনে ছিলাম, তারা ফায়ার শুরু করলাম খানসেনাদের ওপর। তখন খানসেনারা রেললাইনের দুই পাশে পজিশন নিতে শুরু করল। এই অবস্থায় আমাদের কমান্ডার ফায়ারের নির্দেশ দিলেন পশ্চিম এবং পূর্ব পাশের মুক্তিযোদ্ধাদের, যারা ইতিমধ্যে পজিশন নিয়েছিল। আমরা একই সঙ্গে দুই পাশ থেকে ওদের ওপর গুলি শুরু করি। এই যুদ্ধে ১২৬ জন খানসেনা আমাদের হাতে নিহত হয়। তাদের কাছ থেকে আমরা বহু অস্ত্রশস্ত্র-গোলাবারুদ উদ্ধার করি। শেষ পর্যন্ত খানসেনারা পিছু হটে রাজশাহী বা নাচোলের দিকে পালিয়ে যায়। এইটা আমাদের সবচেয়ে বড় যুদ্ধ ছিল এবং সেটা খানসেনাদের সঙ্গেই হয়েছে।

জীবিত অবস্থায় কোনো খানসেনাকে আপনারা ধরতে পেরেছিলেন কি?

- না। ওই মুহূর্তে তাদের আমরা ধরতে পারিনি। কিন্তু এই সংঘর্ষের তিন দিন পর ছয়জন খানসেনাকে আমরা ধরেছিলাম। তারা ওই যুদ্ধে আহত হয়ে আশপাশের জঙ্গল বা ধানখেতে পালিয়ে ছিল। ঘটনাস্থল থেকে এক মাইল দূরে ছয়জন

খানসেনাকে আমরা জীবিত অবস্থায় পেয়েছি। তাদের একজনের একটা পা উড়ি গেছিল, একটার হাত ছিল না। ওই অবস্থায় তারা হয়তো যাইতে পারে নাই বা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। পরে তাদের আমরা ধরে নিয়া আসছি।

আর কোথায় এ ধরনের বড় যুদ্ধ করেছেন?

- এই যুদ্ধের পর খানসেনারা আমনুরাতে আর আসতে পারে নাই। আমনুরা সম্পূর্ণ মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাপচারে ছিল। এই যুদ্ধের সাত দিন পর আমরা অ্যাডভান্স করি কাঁকনহাটের উদ্দেশে। সেখানেও বড় রকমের যুদ্ধ হইছিল।

কাঁকনহাটে কীভাবে যুদ্ধ হলো?

- চাঁপাইনবাবগঞ্জের আমনুরা থেকে আমরা গোটা মুক্তিযোদ্ধা গ্রুপ কাঁকনহাটে যাই। ওখানে হেভি ধরনের বাংকার তৈরি করে আমরা একটা ক্যাম্প বানাইছিলাম। চার দিন পর আমাদের প্রতিহত করার জন্য খানসেনারা রাজশাহী থেকে রেলপথে রওনা দেয়। একজন সংবাদদাতা আমাদের এ খবর দিয়ে জানালেন, খানসেনারা অল্পক্ষণের মধ্যেই আপনাদের চারদিক দিয়ে ঘিরে ফেলবে। আপনারা কী করবেন সেটা এখনই করেন। ওই সময় আমাদের কমান্ডার ক্যাম্পে ছিলেন না।

তখন আপনারা কী করলেন?

- আল্লাহর ওপরে আমার ভরসা ছিল এবং মনে সাহস ছিল। আমরা ১৬৯ জন মুক্তিযোদ্ধা ছিলাম ওখানে। আমি সবাইকে বললাম, এ মুহূর্তে আমাদের কমান্ডার নেই। আমিই কমান্ডার হিসাবে তোমাদের সবাইকে নির্দেশ দিচ্ছি: তোমরা সবাই অস্ত্র নিয়ে নিজ নিজ বাংকারে গিয়ে পজিশন নেও। যখন খানসেনারা আমাদের বাংকারের কাছে আসবে তখন দুই দিক থেকে আমরা আক্রমণ করব, অর্থাৎ পশ্চিম এবং উত্তর পাশ থেকে। আর যারা পূর্ব পাশে থাকবে তারা ফায়ার দেবে না। কিন্তু খানসেনারা যখন জান বাঁচাবার তাগিদে রেললাইন এবং রাস্তার পূর্ব পাশে পজিশন নিবে তখন পূর্ব দিক থেকে তোমরা মেশিনগান ও এলএমজির ফায়ার দিবে। ওখানে মুক্তিযোদ্ধা যারা ছিল তারা সবাই আমার নির্দেশ মেনে নিল। ওই দিন ছিল মঙ্গলবার। বিকাল তিনটার সময় থেকে রাত দুইটা পর্যন্ত খানসেনাদের সঙ্গে আমাদের প্রচণ্ড গোলাগুলি হয়। ওখানে আমার ১৩ জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হয়। খানসেনা আইছিল মনে হয় ৪০০ জনের বেশি। আমার অনুমান আরকি! মাত্র ৩৫ জন খানসেনা আমাদের হাতে নিহত হইছে। আর কোনো খবর জানতে পারি নাই।

দেশ যখন শত্রুমুক্ত হয় তখন আপনি কোথায় ছিলেন?

- দেশ শত্রুমুক্ত হওয়ার সময় আমরা ওখান থেকে পাঁচ মাইল পূর্ব দিকে রসুলপুর গ্রামে ছিলাম। আমাদের ঊর্ধ্বতন কমান্ডার ছিলেন বাংলাদেশ

সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন জাহাঙ্গীর। তিনি কয়েক দিন পরই এক যুদ্ধে শহীদ হন। উনি এ সময় মালদহ থেকে আমাদের নির্দেশ দিলেন সবাইকে মালদহ চলে আসার জন্য। তখন আমরা ওখান থেকে ব্যাক করে মালদহ চলে যাই। আমরা যাওয়ার তিন দিন পরই ভারত সরকার বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিল। তখন ক্যাপ্টেন জাহাঙ্গীরসহ ওখানে আমাদের যত মুক্তিযোদ্ধা ছিল, তারা এত খুশি হয়েছিল যে সে কথা আজ ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। এটা ২৫ বছর আগের কথা। এখন সেই আনন্দের কথা বললে এখনকার ছেলেপেলেরা হয়তো বিশ্বাসই করবে না। এরপর আমরা ভারতীয় সেনাবাহিনীর সঙ্গে চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জে যুদ্ধ করি। এখানে বিভিন্ন গ্রুপের আমরা এগারো শ জনের মতো ছিলাম।

ভারতীয় বাহিনীর কতজন ছিল আপনাদের সঙ্গে?

- দুই হাজারের মতো।

শিবগঞ্জে কীভাবে যুদ্ধ হলো?

- প্রথম আমরাই আক্রমণ করি। ৭ ডিসেম্বর আমাদের সঙ্গে যোগ দিল ভারতীয় সেনাবাহিনী। ট্যাংক, সাঁজোয়া গাড়ি এবং বিমানের সাহায্য নিয়ে আমরা পাকিস্তানি সৈন্যদের পরাজিত করলাম। সেখানে আমাদের কাছে ২২৬ জন খানসেনা আত্মসমর্পণ করে। আর বাকি খানসেনারা রাজশাহীর দিকে পালাইয়া যায়। যেসব পাকিস্তানি সৈন্য আত্মসমর্পণ করেছিল তাদের চারদিক দিয়ে আমরা ঘেরাও করে ফেলছিলাম। তারা আর পালাতে পারেনি।

এ সময় আপনারা পাকিস্তানি সৈন্যদের কাছ থেকে বাধার সম্মুখীন হননি?

- না, আমরা বাধাগ্রস্ত হইনি। কেননা ইন্ডিয়ান সেনাবাহিনী তার আগেই রাজশাহী ঢুকে গেছে। সে জন্য খানসেনাদের সঙ্গে সরাসরি কোনো মোকাবিলা আমাদের হয়নি।

তারপর কী করলেন?

- আমরা ২৬ জন মুক্তিযোদ্ধা ইন্ডিয়ান সেনাবাহিনীর গাড়িতে চড়ে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ পর্যন্ত যাই। যাওয়ার পর শুনলাম যে ওখানকার সকল পাকিস্তানি সেনা আত্মসমর্পণ করেছে। তখন আবার ওখান থেকে আমরা ফেরত যাই রাজশাহী কোর্ট স্টেশনে। ওখান থেকে আবার কেউ হাঁটা পথে, কেউ গাড়িতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের জোহা হলে আসি। আমরা জোহা হলটা দখল করে থাকলাম।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আপনি বাড়ি ফিরলেন কবে?

- দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সেভেন সেক্টরের হেডকোয়ার্টার্স হয়েছিল দিনাজপুর। আমাদের দিনাজপুর ট্রান্সফার করা হলো। রাজশাহী থেকে ট্রান্সফার নিয়ে

আমরা মোটরযোগে আসি দিনাজপুর মহারাজা স্কুলে। এখানে আমরা এক মাসের মতো ছিলাম।

মহারাজা স্কুলে যে দিন বিস্ফোরণ ঘটে, সে দিন কি আপনি সেখানে ছিলেন?

● জি, সেখানে আমি ছিলাম। ওই দিন বেলা দুইটার দিকে আমাদের ১৪০ জন মুক্তিযোদ্ধাকে আউট পাস দেওয়া হয়। তাদের মধ্যে আমিও ছিলাম। আমাদের সিনেমা দেখার জন্য অনুমতি দেওয়া হয়। আমরা মুক্তিযোদ্ধারা ভাগ হয়ে বিভিন্ন সিনেমা হলে যাই। আমি মডার্ন সিনেমা হলে ছিলাম। হলে ছবি দেখার সময় বিকট একটা আওয়াজ শুনতে পাই এবং আমাদের হল কেঁপে ওঠে। তখন আমরা দ্রুত বাইর হইয়া যাই। আমরা দৌড়ে যেখানে আমাদের ক্যাম্প ছিল সেই মহারাজা স্কুলে গেলাম। স্কুলের কাছাকাছি যেতেই দেখি এখানে-ওখানে মানুষের ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হাত-পা।

মহারাজা স্কুলে গিয়ে দেখি, ওখানে একটা বিরাট গর্ত। না হলেও ২০ থেকে ২৫ ফুট গর্ত হয়ে গেছে। আশপাশে যে বিল্ডিং ছিল তা সম্পূর্ণ ভেঙে চুরে গেছে। বিল্ডিংয়ের ইটের নিচে অনেক মুক্তিযোদ্ধা চাপা পড়ছে বলে জানলাম। অনেক মুক্তিযোদ্ধা সে দিন প্রাণ দিল, আহতও হলো অসংখ্য।

আপনি বাড়ি ফিরলেন কবে?

● বাড়ি ফিরলাম ওই ঘটনার ২৫ দিন পর। আমাদের নির্দেশ দিয়ে বলা হলো যে মুক্তিযোদ্ধারা যেন অস্ত্র জমা দেয়। যারা স্কুলের ছাত্র তারা স্কুলে গিয়ে লেখাপড়া করবে, যারা চাকরিজীবী তারা চাকরিতে জয়েন করবে আর যারা কৃষিজীবী তারা কৃষিকাজ শুরু করবে। তখন আমি বাড়ি গেলাম।

বাড়িঘরের অবস্থা কেমন দেখলেন?

● আমাদের গ্রামে আমরা হিন্দু-মুসলমান সবাই ছিলাম। আমার বাড়ি, আমার চাচার বাড়ি আর আমার বাড়ির সাথে সাঁওতাল আদিবাসী যারা ছিল আর আমাদের হিন্দু সম্প্রদায় যারা ছিল, তাদের বাড়িঘর সম্পূর্ণ ধ্বংস হওয়া অবস্থায় দেখেছি। তাদের বাড়িঘর-দুয়ার, গাছপালা কিছুই ছিল না।

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **ভবেন্দ্রনাথ বর্মণ**
ডিসেম্বর ১৮, ১৯৯৬

মো. সিদ্দীকুল হক

পিতা : মরহুম মো. আমিন, মাতা : মরহুমা সফিনা আমিন
গ্রাম : মধ্য বলুবাড়ী, ডাক : দিনাজপুর, থানা : কোতোয়ালি
জেলা : দিনাজপুর, শিক্ষাগত যোগ্যতা : ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং
১৯৭১ সালে বয়স ১৭ বছর, ১৯৭১ সালে ছাত্র ছিলেন, বর্তমানে ব্যবসায়ী।

আপনি কেন মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেন?

● একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্য।

পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী আপনার এলাকায় কী কী করল?

● নির্বিচারে গণহত্যা আর অগ্নিসংযোগ।

আপনার পরিবারের কেউ শহীদ হয়েছেন কি?

● হ্যাঁ, আমার বাবা আর আমার মেজো ভাই।

১৯৭১ সালে আপনি আক্রান্ত হয়েছিলেন কি?

● হ্যাঁ, অনেকবার। তবে এককভাবে নয়; কারণ, আমরা যুদ্ধ করেছি দলবদ্ধ হয়ে।

যুদ্ধ চলাকালে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মুক্তিযোদ্ধারা যেসব অপারেশন চালিয়েছেন, তার কোনোটিতে কি আপনি ব্যক্তিগতভাবে ছিলেন?

● অবশ্যই, আমি আমার দলের টুআইসি ছিলাম।

আপনার এলাকায় কখন থেকে মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা শুরু হয়?

● স্বাধীনতাযুদ্ধের শুরু থেকেই আমার বাড়িতে ইপিআর (বাঙালি) ক্যাম্প ছিল, অনেকেই ছিল।

আপনি কোন কোন এলাকায় যুদ্ধ করেছেন এবং যুদ্ধ চলাকালে আপনার জীবনের দু-একটি স্মরণীয় ঘটনার কথা বলুন?

● পাবনা, উল্লাপাড়া, বগুড়া, রংপুর, সবশেষে দিনাজপুরে সংঘটিত মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়া প্রত্যেক বীর মুক্তিযোদ্ধার জীবনে ঘটনাবহুল এক একটা অধ্যায়।

আমার যুদ্ধজীবনে অনেক ঘটনা আছে, যার একটা ছোট করে বলছি : সময়টা মনে নেই, সম্ভবত নভেম্বর মাসে, খুব শীত ছিল। আমরা তখন বিরল এলাকায়। একদিন রাতে আমাদের নিয়ে যাওয়া হয় ঘুঘুডাঙ্গা এলাকায়—যেখানে কোল্লাকাটা সাঁকো নামের একটি কালভার্ট ছিল—সেটা পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকারদের দখলমুক্ত করার জন্য। সাঁকোর অদূরে যেখানে অবস্থান নিলাম, সেটা শুধুই বালুচর, সেখানে আত্মরক্ষার জন্য কোনো আড়াল ছিল না। ফুটফুটে জ্যোৎস্না রাত; সবকিছু না হলেও আমাদের অবয়বগুলো পুরোপুরি দেখা যাচ্ছিল। নিজেকে নিরাপদ রাখার জন্য হাত দিয়েই বালুচরের কিছুটা মাটি খুঁড়ে ফেললাম সেখানে লুকাব বলে। একটা কথা বলে নিই, তখন আমার কমান্ডার ছিলেন আমার পরম শ্রদ্ধেয় বীর মুক্তিযোদ্ধা মরহুম আব্দুর রাকিব ভাই। আমার সাথে তখন অনেক সহযোদ্ধা ছিলেন। তার মধ্যে ঘটনাস্থলে ছিল আমার বন্ধু এবং একান্ত সহযোগী মো. মঞ্জুরুর রহমান মুন্সি এবং সমগ্র অপারেশন পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন তৎকালীন ইপিআরের সুবেদার জনাব আদম আলী, তিনি অত্যন্ত বদমেজাজি ছিলেন। যা-ই হোক, আমাদের প্রাথমিক কাজ ছিল কিছুক্ষণ পর পর সাঁকোর কাছাকাছি পাকিস্তানি সেনাদের ওপর গুলি বর্ষণ করা। জবাবে তারা কী ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করছে এবং তাদের সংখ্যা ও জনবলের একটা ধারণা নেওয়ার চেষ্টা করা। প্রথম ফায়ারিং শুরু করি প্রথম রাতের কিছুক্ষণ পর থেকে। প্রতিপক্ষকে নিরুত্তর থাকতে দেখে দ্বিতীয় দফা ফায়ারিংয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছি, এমন সময় প্রথমে আমাদের সম্মুখ থেকে এবং তার কিছুক্ষণের মধ্যে ডানে-বাঁয়ে—সব দিক থেকেই ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি ছুটে আসতে শুরু করল। সাথে আরেকটা নতুন মাত্রা যোগ হলো—৩ ইঞ্চি মর্টারের গোলাবর্ষণ। বিরামহীন গোলাগুলি বর্ষণের ফলে অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, সেই বালুচরে আর লুকিয়ে থাকা সম্ভব হচ্ছিল না। আমার বন্ধু ও সহযোদ্ধা এবং আমি দুজনেই একটু আড়ালের খোঁজে গাঁয়ের দিকে এগোতেই সামনের অন্ধকার ফুঁড়ে দুই ছায়ামূর্তিকে আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে দেখলাম। অন্ধকারে ছায়া দেখে চেনার কোনো উপায় ছিল না যে তারা শত্রু না মিত্র। সতর্কতা হিসাবে আমার বন্ধু ছায়ামূর্তির দিকে তার এসএলআর তাক করল; কিন্তু কোনো ফল হলো না। তাদের গতি আমাদের দিকে আরও জোরালো হতে দেখে আমি আমার অস্ত্র তাক করলাম, আমার বন্ধু সহযোদ্ধা 'হল্ট' বলে চাপা গলায় আওয়াজ করল। সঙ্গে সঙ্গে একটা ভোঁতা শব্দ হলো এবং আমার বন্ধুকে ধরাশায়ী অবস্থায় দেখতে পেলাম। প্রাথমিক অবস্থায় শব্দটা কিসের বুঝতে না পারলেও গুলির শব্দ যে নয়, সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। এবার আমার পালা। কোনো কিছু ঠিকভাবে বুঝে ওঠার আগেই আমার অস্ত্রটা আমার হাতছাড়া

হলো। এবার বুঝতে পারলাম, ছায়ামূর্তি দুজনের একজন হলেন আমার শ্রদ্ধেয় কমান্ডার রাকিব ভাই এবং অপরজন আমাদের আদম আলী ওস্তাদ। আমার বন্ধুকে আদম আলী ওস্তাদ কেন ঘুষি মেরে ধরাশায়ী করেছিলেন, কেন সে দিন মার খেয়েছিলাম, তার বর্ণনা আর দেব না।

আসল ঘটনা শুরু হলো ১৫ থেকে ২০ মিনিট পর থেকে। গোলাগুলি আকস্মিকভাবে এতটাই বেড়ে গেল যে সেই ধু ধু প্রান্তরে দাঁড়িয়ে থাকা অসম্ভব হয়ে গেল। একই সাথে মনে হচ্ছিল, আমাদের তিন দিকে একটা বেষ্টনী তৈরি হচ্ছে। ব্যাপারটা বুঝতে একটু সময় লাগল। ততক্ষণে আমাদের অন্য সহযোদ্ধারা তাদের অবস্থান ছেড়ে নিরাপদ জায়গায় সরে গেছে। আমার চারপাশে তাকিয়ে দেখার কোনো অবকাশ নেই। অনুভব করলাম, আমার বন্ধু সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আমিও তাকে অনুসরণ করলাম। কিছুক্ষণ হাঁটার পর আমরা একটা সবুজ প্রান্তরে পৌঁছালাম। বন্ধু সহযোদ্ধা বলল যে এই মাঠের মধ্য দিয়েই যেতে হবে; কারণ, মাঠের চারপাশে ঘন জঙ্গল। কথা শেষ হওয়ামাত্রই মাঠে নেমে পড়লাম আর সাথে সাথে পানিতে তলিয়ে গেলাম। আমার সাথে থাকা গুলির কনটেইনার, সহযোদ্ধাদের ফেলে যাওয়া অস্ত্র আর শীতের গরম কাপড় ভিজে গিয়ে আমার ওজন যেন দ্বিগুণ হয়ে গেল। আর সেই ভারে আমি ক্রমাগত আরও তলিয়ে যেতে থাকলাম। হঠাৎ ইন্দ্রিয় সচল হলো। বুঝলাম, এখনই কিছু করতে হবে, তা না হলে পানিতে ডুবে মারা যাব। হাতে থাকা সহযোদ্ধার রাইফেলটা দিয়ে মাটি স্পর্শ করার চেষ্টা করলাম। পেয়েও গেলাম। সজোরে মাটিতে একটা ধাক্কা দিলাম। আর সাথে সাথেই ওপরের দিকে উঠতে লাগলাম। একসময় ভেসে উঠলাম আর বুক ভরে নিঃশ্বাস নিলাম। পানিতে অনেক বুনো ঘাস ছিল, যা দিয়ে আমার মুখের অনেক জায়গায় ছড়ে গিয়েছিল। ভীষণ জ্বালা করছিল।

হঠাৎ পাশের বুনো ঘাসের ভেতর থেকে কেউ যেন আমার নাম ধরে ডাকল। গলা শুনে বুঝলাম, এটা আমার বন্ধুর গলা। খুব সাবধানে আর নিঃশব্দে তার কাছে গেলাম। আমরা আমাদের অবস্থান যতটা সম্ভব গোপন করার চেষ্টা করছি; কারণ, চারদিক থেকে যেমন গোলাগুলি ছুটে আসছে, তেমনি মানুষজনও ছুটছে। অন্ধকারে শত্রু-মিত্র বোঝার উপায় নেই। একসময় কোলাহল কিছুটা কমে গেলে পানি আর ঘাসের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলাম এবং যতটা সম্ভব সবকিছু এড়িয়ে আমাদের হাইড আউটের দিকে এগিয়ে যেতে থাকলাম। এখানে একটা কথা বলে নিই, যে সবুজ প্রান্তরকে আমরা মাঠ মনে করে তাতে নেমেছিলাম, সেটা আসলে ছিল ছোট সবুজ শ্যাওলা ভরা একটা পুকুর। সে বছর ভারী বর্ষণের কারণে পুকুরের পানি আর পাড় সমান হয়ে ছিল।

ওটা যে পুকুর, সেটা আলাদাভাবে বোঝার উপায় ছিল না। তার ওপর জ্যোৎস্নার আলো আর ছায়ায় পুকুরটাকে একটা খোলা প্রান্তরই মনে হচ্ছিল। অনেক কষ্টে অবশেষে হাইড আউটে পৌঁছালাম, যেটা ছিল একটা পরিত্যক্ত স্কুলঘর। সেখানে গিয়ে মোটামুটি সবাইকে পাওয়া গেল। সেই সাথে স্থানীয় অনেক পরিবারও পাকিস্তানি সেনাদের তাড়া খেয়ে সেখানে আশ্রয় নিয়েছিল। এই অবস্থায় জায়গাটা যদিও নিরাপদ ছিল না, তার পরও সব রকমের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে রাতের মতো সেখানেই থাকার সিদ্ধান্ত হলো। ভেজা কাপড় পাল্টানো দরকার। কাপড় পাল্টাতে গিয়ে অনুভব করলাম, আমার বাঁ ঊরুর সাথে গোলাকার এবং মোটা কিছু একটা লেপ্টে আছে। অনেক সময় ধরে সেই জায়গাটা চুলকাচ্ছিল। কিন্তু সেই সময় মনোযোগ দেওয়ার মতো পরিস্থিতি ছিল না। প্যান্ট খোলার পর যা দেখলাম, তাতে আমার হাত-পা অবশ হওয়ার উপক্রম হলো। আমার কথা বন্ধ হয়ে গেল; কারণ, সেটা ছিল একটা জোঁক, যা লম্বায় প্রায় আট ইঞ্চি আর প্রস্থে এক ইঞ্চির মতো। আমার রক্ত খেয়ে আরও মোটা হয়ে গেছে। হাতের ইশারায় রাকিব ভাইকে ডাকলাম। তিনি এসে আমাকে এক প্রস্থ গালাগালি দিয়ে জোঁকটা ছাড়িয়ে দিলেন। আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম; কারণ, ছোটবেলা থেকেই এই বস্তুটাকে আমি জমের মতো ভয় করি।

যাক, রাতে যে যার মতো শুয়ে পড়লাম। আমার বন্ধু মুন্সি আমার পাশেই শুয়ে ছিল। রাত তখন কত হবে জানি না, মনে হলো, আমার বন্ধু আমাকে ডাকছে। কান পেতে আবার শুনতে চেষ্টা করলাম। এবার বাস্তবে তার ডাক শুনলাম। বন্ধু আমার প্রস্রাব করবে। আমি বললাম, ভয়ের কিছু নেই, বাইরে প্রস্রাব করে এসো, বাইরে সেন্ট্রি আছে। উত্তরে সে বলল, আমি উঠতে পারছি না। আমাকে ওঠাতে হবে। উঠে তার কাছে গেলাম। বললাম, ওঠো। সে বলল, আমি হাত-পা কিছুই নাড়াতে পারছি না। বাস্তবেও দেখলাম তার হাত-পা অবশ হয়ে গেছে। ঘটনাটা রাকিব ভাইকে জানালাম। রাকিব ভাই তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা হিসেবে বিছানায় পাতা কিছু খড় নিয়ে তাতে আগুন জ্বালিয়ে আমার বন্ধুকে সেঁক দিতে বললেন। কাজটা ঘরের ভেতরেই করতে হলো; কারণ, বাইরে রাতের আগুনের আলো অনেক দূর থেকে দেখা যায় আর আমাদের অবস্থানটাও গোপন রাখা দরকার। কাজ শেষে তাকে বাইরে প্রস্রাব করানো হলো। আগুনের গরমে খুব বেশি উপকার হলো। সেখানে স্থানীয় একজন গ্রাম্য চিকিৎসকের সেবায় আমার বন্ধু সেরে উঠতে লাগল। এর মধ্যেই আমি আবার হায়ার ট্রেনিংয়ের জন্য ভারতের পানিঘাটার উদ্দেশে রওনা হলাম। ঘটনার দিন-তারিখ কিছুই মনে নেই। কারণ, তখন ভাবিনি যে যুদ্ধদিনের অবসান হবে। জানতাম, দেশ স্বাধীন হবে, কিন্তু স্বাধীনতা আমি দেখব, এর নিশ্চয়তা ছিল না। আর এসব

ঘটনা লিখব, তা-ও কখনো ভাবিনি। যাদের জীবনে কোনো নিশ্চয়তা ছিল না, তাদের লেখালেখির তো প্রশ্নই ওঠে না। শুধু ভাবতাম, দেশ স্বাধীন হবে। তবে কবে হবে, জানি না। যুদ্ধ করছি, আর কত দিন করতে হবে, বুঝতে পারতাম না। এই ছিল সকল প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধার মনের পরিস্থিতি।

এমন কারও নাম কি আপনার মনে পড়ে, যে বা যারা বাংলাদেশের ভেতরে থেকেই মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দিয়েছে এবং অন্যান্য সহযোগিতা করেছে?

● এমন অনেক নাম আছে, যাঁরা যুদ্ধ চলাকালে বাংলাদেশের ভেতরে থেকেই মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করেছেন। এঁদের মধ্যে জাইনূরের নূরুল ভাইকে বেশি মনে পড়ে।

যুদ্ধের শেষে গ্রামে ফিরে আপনার এলাকার অবস্থা কী দেখলেন?

● বিধ্বস্ত পুরো গ্রাম, বাড়িঘরে দরজা-জানালা নেই, নেই কোনো আসবাব। গ্রামের প্রায় প্রতিটি বাড়িরই ছিল একই চিত্র। চারদিক অন্ধকার। সব মিলে যেন একটা মৃত নগরে পরিণত হয়েছিল।

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **মো. আসাদুল্লাহ সরকার**
মে ০১, ২০১৩

মোজাফফর রহমান

পিতা : রহম শাহ মণ্ডল, গ্রাম : মিরপুর, ডাক : জামগ্রাম
ইউনিয়ন : কাজীহাল, থানা : ফুলবাড়ী, জেলা : দিনাজপুর, শিক্ষাগত যোগ্যতা : এসএসসি, ১৯৭১ সালে বয়স ১৯ বছর, ১৯৭১ সালে ছাত্র ছিলেন, বর্তমানে অবসর জীবন যাপন করছেন।

আপনার এলাকায় পাকিস্তানি সৈন্যরা কখন আক্রমণ করে?

- ২৬ মার্চের পর ওরা ফুলবাড়ীর মাদলা হাটের পানিঘাটায় ক্যাম্প নির্মাণ করল। ক্যাম্প করার পর ওরা [পাকিস্তানি সেনা] ওখান থেকে গ্রামে গ্রামে যাইত। যাওয়ার পর মেয়ে-পুরুষদের ওপর জুলুম-অত্যাচার চালাত এবং যুবতী মেয়ে পেলে তাদের তারা ধরে নিয়ে আসত। তাদের ইজ্জত নেওয়ার পর তারা তাদের গুলি করে মারি ফেলত। সে সময় এটা তাদের একটা পেশায় পরিণত হয়েছিল। তারা ওখান থেকে অপারেশন করতে লাগল বিভিন্ন এলাকায়।

পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী আপনার এলাকায় আর কী কী করল?

- আমাদের এলাকায় বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিছে, রাস্তাঘাট নষ্ট করে দিছিল।

স্বাধীনতাযুদ্ধে আপনার পরিবারের কেউ শহীদ হয়েছেন কি?

- জি, আমার এক ভাতিজা, এক ভাগিনা, এক চাচাসহ আমাদের পরিবারে পাঁচজন শহীদ হয়েছেন।

তারা কীভাবে শহীদ হলেন?

- ওরা দিনাজপুর মহারাজা হাইস্কুলে মাইন বিস্ফোরণে শহীদ হয়েছেন।

আপনি কেন মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেন?

- আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম মাতৃভূমির স্বার্থে, মা-বোনের ইজ্জতের স্বার্থে, আমাদের দেশ মুক্ত করার স্বার্থে এবং দেশের জনগণের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য, বাংলা ভাষাকে কায়েম করার জন্য।

আপনার এলাকায় কখন থেকে মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা শুরু হয়?

- ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাস থেকে।

আপনি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে কখন থেকে তৎপরতা শুরু করেন?

- ১৯৭১ সালের জুন মাস থেকে।

আপনাদের বিরোধিতা করেছিল কারা?

- জামায়াতে ইসলামী ১৯৭১ সালের স্বাধীনতাসংগ্রামে আমাদের বিরোধিতা করেছিল। তারা সে সময় রাজাকার, আলবদর এবং দালাল নামে আখ্যায়িত হয়েছিল।

আপনার গ্রাম বা এলাকায় রাজাকার, আলবদর, আলশামস কারা ছিল?

- আমাদের কাজীহাল ইউনিয়নে কোনো রাজাকার ছিল না। এটা সীমান্ত এলাকা। তাই সেখানে রাজাকার ছিল না। অন্য এলাকায় রাজাকার ছিল।

অন্য এলাকায় কে কে রাজাকার ছিল?

- রাজাকার ছিল মনসের নামে এক লোক। আরও অনেকে ছিল। তাদের নাম এখন ভুলে গেছি। অনেক দিনের কথা তো।

তারা এখন কোথায়?

- তারা এখন বাড়িতেই সংসার-জীবন যাপন করতেছে।

ফুলবাড়ী এলাকায় শান্তি কমিটিতে কারা ছিল?

- অনেকেই ফুলবাড়ী এলাকার শান্তি কমিটিতে ছিল। কিন্তু তাদের সকলের নাম আমি ভুলে গেছি।

স্বাধীনতাবিরোধীদের যুদ্ধ শেষে ধরা হয়েছিল কি?

- হ্যাঁ, যুদ্ধের শেষে আমরা তাদের ধরেছিলাম। কিন্তু অনেককেই আমরা ক্ষমা করে দিছি। তবে যারা বেশি অত্যাচার করছিল তাদের আমরা মারি ফেলছি। অনেককে আমরা বাঁচিয়ে নিছি।

তাদের ক্ষমা করলেন কেন?

- ক্ষমা করলাম এই জন্য যে, তারা আমাদেরই ভাই। হয়তো জীবন বাঁচানোর তাগিদে তারা একসময় খানসেনাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিল। তারা তেমন অপরাধ করে নাই। আমাদের একই ভাষা। এই জন্য আমরা তাদের মাফ করে দিছি।

আপনি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে কোন কোন এলাকায় যুদ্ধ করেছেন?

- ডা. মুজাফফর রহমান তখন ফুলবাড়ী আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি ছিলেন। ওনার সুপারিশপত্র নিয়ে আমরা ৩২ জন একসঙ্গে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। একটা ক্যাম্পে প্রথমে ২১ দিন ট্রেনিং নেওয়ার পর আমরা শিলিগুড়িতে আবার হায়ার ট্রেনিং করি। ওখানে দুই মাস ১০ দিন ট্রেনিং নেওয়ার পর আমি আমাদের গ্রুপ নিয়ে তরঙ্গপুরের কালীগঞ্জে আসি। ওখান থেকে আমাদের রাজশাহী

এলাকায় পাঠানো হয়। রাজশাহী এলাকা আমাদের তেমন চেনাজানা ছিল না। একটু অসুবিধা হয়েছিল। তারপর ওখান থেকে আমরা আমাদের নিজ এলাকায় চলে আসলাম। আমাদের তৎপরতা বিরামপুর, নবাবগঞ্জ, পার্বতীপুর এবং দক্ষিণে সদর থানা চিরিরবন্দরের অন্তর্গত ছিল। পানিঘাটায় যুদ্ধ করতে গিয়ে আমরা এক সহযোদ্ধা ভাইকে হারিয়েছি, যার নাম মোয়াজ্জেম হোসেন। কেটরা হাটে আমি আমার দুজন যোদ্ধাকে হারিয়েছি, একই সাথে আমরা যুদ্ধ করতেছিলাম। একটা শেল এসে তাদের গায়ে পড়ল। আমার সাথের জন মারা গেল। এই স্মৃতিগুলো আমার আজও মনে আছে।

কেটরা হাটের যুদ্ধে যে দুজন মুক্তিযোদ্ধা মারা গেলেন তাঁদের বাড়ি কোথায় এবং নাম কী?

- তাদের একজনের বাড়ি হলো জয়পুরহাটে, আরেকজনের বাড়ি ঘোড়াঘাটে। একজনের নাম ছিল রফিকুল ইসলাম। আরেকজনের নাম ছিল জামাল।

আপনারা কতজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন সেখানে?

- আমরা সেখানে ফ্রিডম ফাইটার ছিলাম ৩০০ জনের মতো এবং ইন্ডিয়ান বিএসএফ ছিল ৫০ জনের মতো।

সে দিন কি আপনারা পাকিস্তানিদের ক্যাম্প দখল করতে পেরেছিলেন?

- জি, আমরা ক্যাম্প দখল করেছি এবং দুইজন খানসেনাকে জীবিত ধরছিলাম। তারা রান্না করছিল। ভোরে আমরা তাদের ক্যাম্প দখল করেছি এবং বাংকারে আমরা রাজশাহী ইউনিভার্সিটির দুজন মেয়েকে নির্যাতিত অবস্থায় পেয়েছিলাম। আমরা ওই জীবিত খান দুইটাকে মাথা ন্যাড়া করে পরে আমাদের হেডকোয়ার্টার্স তরঙ্গপুরে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। আর মেয়েগুলোকে তরঙ্গপুরে ট্রিটমেন্ট করা হয়েছিল তিন সপ্তাহের মতো। দেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্বমুহূর্তে তাদের আমরা পৌঁছে দিয়েছি তাদের আত্মীয়ের বাড়িতে।

আপনি সবচেয়ে ভয়াবহ যুদ্ধ কোথায় করেছেন?

- বেদাই নামে একটা জায়গা আছে, সেখানে ভয়াবহ যুদ্ধ হইছিল। এটা ফুলবাড়ীতে। আমাদের কমান্ডার ছিলেন নজরুল ইসলাম। সেই যুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যদের গুলিতেই আমাদের বেশ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা হতাহত হইছিল। সে দিন আমাদের ৩২ জন মুক্তিযোদ্ধা মারা গেছিল। ওরা আমাদের চিহ্নিত করতে ভুল করছে। হয়তো মনে করছিল যে এরা পাকিস্তানি সেনা। ওখানে একটা পুকুর আর এক পাশে রোড ছিল। আমরা খেত-জমি দিয়া আসতেছিলাম। আমাদের পাশ থেকে ভারতীয়দের কভার দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তারা আমাদের পাকিস্তানি সেনা মনে করে মেশিনগান এবং লাইট মেশিনগানের গুলি চালাতে থাকে। তাতে আমাদের ৩২ জন মুক্তিযোদ্ধা মারা গেছিল। পাকিস্তানি সৈন্যরা আমাদের ক্ষতি করতে পারে নাই। ভারতীয় সৈন্যদের হাতেই আমরা মার খেলাম। এই স্মৃতিটা এখনো আমার মনে জাগে। মুক্তিযোদ্ধাদের লাশগুলো

অবশ্য আমরা ভারতীয় সৈন্যদের গাড়িতে করে ক্যাম্পে নিয়া গেছিলাম। ক্যাম্পে যাওয়ার পর এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়।

ওই যুদ্ধে আপনারা কতজন পাকিস্তানি সৈন্যকে হতাহত করতে পেরেছিলেন?

- আমরা সে দিন ১৪ জনকে মেরেছিলাম। তার মধ্যে খানসেনা ছিল তিনজন। আর বাকিগুলো ছিল বিহারি।

আপনারা জীবন্ত অবস্থায় কতজন খানসেনাকে ধরতে পেরেছিলেন?

- আমার ৮০ নম্বর পার্টি চিরিরবন্দরে ধরছিল দুইজনকে। আমরা ব্রিজ অ্যাটাক করছিলাম। আমরা দুই দিন দুই রাত পুকুরে ছিলাম। আমরা ওখানের এক বাংকার থেকে একজন বিহারি এবং একজন খানসেনাকে ধরে নিয়ে আসলাম। আর কেটরা ক্যাম্প থেকে আমরা দুইজন খানসেনাকে ধরছিলাম। আমার জীবনে তিনটা খানসেনাকে ধরছিলাম। আমি একা না, আমার পার্টি মিলে। আমার ৮০ নম্বর পার্টিটা ধরছিল।

দেশ যখন শত্রুমুক্ত হয় তখন আপনি কোথায় ছিলেন?

- যে দিন আমাদের ভারত সরকার স্বীকৃতি দিল, সে দিন আমি চরকায়। আমি তখন ভারতীয় ট্যাংকের ওপর। তাদের ট্যাংকেই আমি ওখান থেকে ফুলবাড়ী হয়ে পার্বতীপুর দিয়ে সৈয়দপুরে ইন করি। বিরামপুর, ফুলবাড়ী, পার্বতীপুর—এগুলো তখন অলরেডি শত্রুমুক্ত হয়ে গেছে। কিন্তু মাঝে মাঝে ওরা সৈয়দপুর থেকে বোম মারত শালবনের দিকে। আমরা ওই দিকে তাদের ধাওয়া করছিলাম।

সৈয়দপুরে গিয়ে আপনি কী দেখলেন?

- সেখানে গিয়ে আমরা অনেক বিহারি দেখতে পেলাম। বিহারিদের আমরা এক জাগায় করলাম। সেখানকার খানসেনারা সারেন্ডার করছে, বিহারিরাও। বিহারিদের আলাদা করা হয়েছিল। মেয়েমানুষ এক পাশে। পুরুষমানুষ আর এক পাশে। আমরা ওখানে একটা স্কুলে থাকলাম। স্কুলে কিছুদিন থাকার পর আমি ওখান থেকে আমার প্লাটুন নিয়া চইলা আসলাম ফুলবাড়ী। আমি প্লাটুন কমান্ডার ছিলাম। সহ-কমান্ডার ছিল রহীম উদ্দীন। তারপর আমরা দিনাজপুরে চলে যাই। আমরা মহারাজা হাইস্কুলে ক্যাম্প করি।

মহারাজা হাইস্কুলে আপনি কত দিন ছিলেন?

- মাস খানেকের মতন ছিলাম। আমরা এখানে থাকার সময়ই সেখানে বিস্ফোরণ ঘটে। এই ঘটনা আমার জীবনের চিরস্মরণীয় ঘটনা। ১৯৭২ সালের ৬ জানুয়ারি সন্ধ্যালগ্নে কতকগুলো উদ্ধারকৃত মাইন, যা বিভিন্ন জায়গা থেকে সেখানে আনা হয়েছিল। সেগুলো বার্স্ট হয়ে গেছিল। ওই মাইন বার্স্ট হওয়াতে সেখানে জমাকৃত মাইন এবং অন্যান্য গোলাবারুদ বিস্ফোরিত হয়ে এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়। সেখানে প্রায় ৪৭ হাজার বিভিন্ন ধরনের বিস্ফোরক জমা ছিল। একটা

মাইন বার্স্ট হওয়াতে সব বিস্ফোরক এবং গুলি বার্স্ট হয়ে গিয়েছিল। আমরা ওখানে প্রায় ষোলো শ মুক্তিযোদ্ধা ছিলাম। ওখানে ক্যাপ্টেন শাহরিয়ার ছিল। আমাদের ওই ষোলো শর মধ্যে মনে হয় আমরা চার শ মুক্তিযোদ্ধা বাঁচছি। তার মধ্যে আমিও ছিলাম। আমি আহত হয়েছিলাম। মহারাজা স্কুলটা বিস্ফোরণে উড়ে গেল। আমি এক ফুট বালির নিচে চাপা পড়ছিলাম। আর অনেক ইট-পাথর আমার গায়ের ওপর পড়েছিল। চাপা পড়া অবস্থা থেকে জ্ঞান ফেরার পর গা ঝাড়া দিয়ে উঠে আমি মনে করলাম যে খানসেনারা হয়তো আবার আমাদের ওপর আক্রমণ করছে। নিজের দিকে তাকিয়ে দেখি আমার শরীরের নিচের অংশে কোনো কাপড়চোপড় নাই। আমার মাথা, পেট এবং শরীরের বিভিন্ন স্থান থেকে রক্ত ঝরতেছে। তারপর ইন্ডিয়ান সোলজাররা এসে আমাকে উদ্ধার করে। প্রাথমিক চিকিৎসা করল। কিছুক্ষণ পর আমাদের রংপুর হাসপাতালে পাঠিয়ে দিল। মহারাজা হাইস্কুলে আমার ভাতিজা মতিয়ার রহমান, চাচা নজরুল ইসলাম, ভাগিনা নজু রহিম উদ্দিন, ভাতিজা জসিমউদ্দিন আমার চোখের সামনে মারা গেছে। তাদের আমি আর বাঁচাইতে পারি নাই।

যখন মাইন বিস্ফোরণ হয় তখন আপনি কী অবস্থায় ছিলেন?

- আমি আমার প্লাটুনের ব্যাপারে সেখানে হিসাব দিচ্ছিলাম অর্থাৎ আমার এতজন মুক্তিযোদ্ধা ব্যারাকে আছে, এতজন আউট পাশে বাইরে আছে। নাম করে রোল কল করতেছিলাম। সেই মুহূর্তে বিস্ফোরণ ঘটে। তার কিছুক্ষণ আগে আমি একবার বাইরেও আসছিলাম। তখন দেখলাম কয়েকটা গাড়ি দাঁড়ানো। গাড়ি থেকে উদ্ধারকৃত অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ আনলোড করা হচ্ছে। দেখে এসে আমার ওস্তাদকে আমি আমার প্লাটুনের হিসাব দেওয়া শুরু করলাম। এমন সময় এই বিস্ফোরণটা হয়।

রংপুর মেডিকেলে কত দিন আপনার চিকিৎসা হয়?

- দুই মাস ১০ দিন। আমরা চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় আমাদের দেখার জন্য তাজউদ্দীন আহমদ সাহেব আইছিলেন। তিনি আমাদের ৫০০ করে টাকা দেন।

চিকিৎসার পর আপনি কী করলেন?

- চিকিৎসার পর আমার বাবা-মা আমাকে বাড়িতে নিয়ে যান।

আপনি বাড়িতে ফিরে এসে আপনার বাড়িঘরের অবস্থা কেমন দেখলেন?

- দেখলাম, বাড়িঘর বিধ্বস্ত। তখন বাড়িঘর সব ভাঙি গেছিল।

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **ভবেন্দ্রনাথ বর্মণ**
ডিসেম্বর ১৯, ১৯৯৬

মোসাম্মৎ আনোয়ারা মালেক

পিতা : মো. আবদুল কুদ্দুস মুন্সী, গ্রাম : উত্তর বাসান্দী, ডাক : বাংলা হিলি ইউনিয়ন ও থানা : হাকিমপুর, জেলা : দিনাজপুর, শিক্ষাগত যোগ্যতা : এইচএসসি পাস এবং পিটিআই ট্রেনিংপ্রাপ্ত, ১৯৭১ সালে বয়স ১৮ বছর ১৯৭১ সালে ছাত্র ছিলেন, বর্তমানে শিক্ষকতা করেন।

১৯৭১ সালের মার্চ মাসের ঘটনা সম্পর্কে আপনি কী জানেন?

- মার্চ মাসে ধীরে ধীরে এই দিকে ট্রেন বন্ধ হতে লাগল। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হতে লাগল। আমরা তখন পাঁচবিবি ছিলাম। মামার বাড়িতে। একদিন এক লোক দৌড়াইয়া আসি আমার মাকে বলল, আপনারা বাড়ি গেলে খুব তাড়াতাড়ি যান, দেশের অবস্থা ভালো না। এখন যে ট্রেন যাবে সেটাই বোধ হয় শেষ ট্রেন। পরে আর ট্রেন যাবে না। তখনই আমরা তৈরি হয়ে নিলাম এবং ওই ট্রেনেই বাড়ি চলে আসলাম। আইসা দেখি ঠিকই, তারপর আর কোনো ট্রেন আসে নাই। বাড়িতে আসি শুনি, পাঞ্জাবিরা এখানে লোক মারছে, ওখানে লোক মারছে। চারদিকে শুধু মানুষ মারার কথা। তখনো কিন্তু ভারত-বাংলাদেশ বর্ডার খোলা হয়নি। আমরা যে ইন্ডিয়ায় যাব, এটা কিন্তু আমাদের ধারণায় ছিল না। আমরা খুব দুশ্চিন্তার মধ্যে ছিলাম তখন। আমার বাবা এবং আরও কয়েকজন মিলে একদিন ইন্ডিয়ায় গেলেন। ইন্ডিয়ায় গিয়ে যারা রাজনীতি করেন, তাঁদের সাথে বৈঠক করে আসলেন। যদি কোনো সমস্যা হয় তবে ইন্ডিয়ায় গিয়া আমরা বাঁচব, আত্মরক্ষা করতে পারব—এমন ধারণা বাবা আমাদের দিলেন। এর কিছুদিন পরই বর্ডার খুলে গেল। আমাদের তো আরেকটা সমস্যা ছিল। সেটা হলো, আমরা কিন্তু নন-বেঙ্গলি। আমার বাবা বাঙালি না। এ সময় নন-বেঙ্গলিরা এমন এক

রাজনীতি করত, যেটা বাইরে থেকে কল্পনাও করা যায় না। আমাদের মধ্যে একটা ভয় ছিল আমরা বিহারি বলে। কেউ কেউ না জেনে হয়তো আমাদের মারতে আসছে। আবার ওই দিক থেকে পাঞ্জাবিরও ভয়। কারণ, আমরা আওয়ামী লীগ করতাম। কিন্তু তাহলেও আমরা বিহারি তো! সে জন্য আমাদের উভয় সংকটে পড়তে হইছে। এই সংকটের জন্য আমরা ১২ এপ্রিলের পরই কিন্তু ইন্ডিয়া চলে গেছিলাম। ইন্ডিয়ায় আমাদের জমি-জায়গাও ছিল। বাসাটাসা ছিল আগে। পরে অবশ্য সব নষ্ট হয়ে গেছে। এক কাপড়ে আমরা বাড়ি থেকে বের হয়ে গেছি। কোনো জিনিস নিয়ে যাইনি। আমি তো তখন লেখাপড়া করতাম। মানুষ তো অনেক কিছু নিয়া গেছে। আমরা কিছুই নেই নাই। সীমান্তের কাছেই একটা বাসা ভাড়া করে আমরা ছিলাম। ওখানে থেকেই আমাদের দেশের অবস্থা জানতাম। যখন পাঞ্জাবি আসি আমাদের এলাকায় হামলা করল, তখন ওখানকার কতকগুলো বিহারি মদটদ খাইয়া আসছে বাবাকে মারবে বলে। রহমত বন্দুক দিয়া গুলি করছে পর পাঞ্জাবিরা মারা গেছে। সে বেশি শিক্ষিত ছিল না, থ্রি-ফোর পর্যন্ত পড়া। কিন্তু ভীষণ সাহসী ছিল।

আপনাদের ফ্যামিলিতে সবাই কি মুক্তিযোদ্ধা ছিল?

- প্রথম স্টেপে কিন্তু আমাদের অনেকেই পাঞ্জাবিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। দ্বিতীয় স্টেপে তারা সাহায্য করেছে মুক্তিযোদ্ধাদের। যখনই মুক্তিযোদ্ধারা এখানে আসত তাদের তারা শেল্টার দিত। মুক্তিযোদ্ধাদের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করত, পাঞ্জাবিদের সম্পর্কে বিভিন্ন খবরাখবর দিত।

১৯৭১ সালে আপনার এলাকায় পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর আক্রমণ সম্পর্কে আপনি কী জানেন?

- আক্রমণ সম্পর্কে অনেক কিছুই শুনছি। কেবল শুনি নাই। নিজেও বর্ডারের ওপার থেকে দেখছি। হঠাৎ একদিন ওই দিকে অর্থাৎ বাংলাদেশে লোকজন দৌড়াদৌড়ি আরম্ভ করছে। ওই দিন পূর্ব দিক থেকে দুনিয়ার লোক খালি দৌড়াচ্ছে। পালাও, পালাও বলছে আর দৌড়াচ্ছে। ওই দলে আমার দাদি, চাচা-চাচিরা সবাই ছিল। আমার বাবা আমাদের সেফের জন্য আগেই ইন্ডিয়ায় রাখছিল।

আপনি সীমান্ত থেকে খানসেনাদের চলাফেরা দেখেছিলেন কি?

- বর্ডারের পাশে এদিক-ওদিক তারা যাওয়া-আসা করছে সেটা দেখছি। যুদ্ধ করা দেখছি। আমরা ইন্ডিয়ান বর্ডার থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতাম। ওপারে মানে বাংলাদেশে পাঞ্জাবিরা মানুষের গরু, খাসি ধরে নিয়ে আসতেছে, জবাই করতেছে, খাচ্ছেদাচ্ছে, তারা ক্যাম্প করছে এবং ক্যাম্পে

পাঞ্জাবিরা থাকছে—আমরা বর্ডারের পাশে ইন্ডিয়ায় যে দোতলা বাড়িগুলো আছে ওখানে উঠে এসব দেখতাম। পাঞ্জাবিরা প্রথম যে দিন আসলো সেই দিন ওরা আমাদের বাসায় আগুন দিল। বর্ডার থেকে আমরা সব দেখছি। ওটাতে আগুন যখন দিছে তখন এক্কেবারে কালো হয়ে ধোঁয়া উঠতেছিল। বিভিন্ন বাড়িঘরে আগুনটাগুন দেওয়ার পর পাঞ্জাবিরা ওখানে ক্যাম্প করল। পাঞ্জাবিরা নৌকায় উঠতে চাইত না। ওরা পানি খুব ভয় পেত। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আমরা দেশে ফিরলাম। দেশে ফিরে এসে পাঞ্জাবিরা এখানে যে অত্যাচার করছে সেগুলো জানছি। এখানে নানান জায়গায় মানুষের হাড়-হাড্ডি, এটা-ওটা দেখছি। এখানে পাকিস্তানি সৈন্যদের যে ক্যাম্প ছিল, সে ক্যাম্পের কথা সবাই জানে।

আপনাদের এলাকায় পাকিস্তানিরা কখন আক্রমণ করল?

- এপ্রিল মাসের ১৭ থেকে ২০ তারিখের মধ্যে। ২৫ মার্চ তো প্রথম ঢাকায় শুরু করছে। তারপর পাঞ্জাবিরা বিভিন্ন দিকে ধীরে ধীরে ঢুকতে শুরু করল। ঘোড়াঘাটের ওই রাস্তা দিয়া মিলিটারি ট্রাকে তারা আসছিল। তারা যখন আসছিল, তখন একেকটা গ্রাম আগুনে জ্বলতে আরম্ভ করল। ওরা আসার সময় যেসব গ্রাম পথে পড়ল সেসব গ্রামে তারা আগুন দিল। লোকজন মারল। তবে ছাতনীর ওখানে কিছু লোক মুসলিম লীগ করত। তারা পাকিস্তানি ঝান্ডা নিয়ে রাস্তায় খাড়া হয়ে যায়। পাকিস্তানি ঝান্ডা দেখে তাদের ওরা আর কিছু করল না। কিন্তু বাকিদের ওপর পাঞ্জাবিরা খুব অত্যাচার করছে।

পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী আপনার এলাকায় আর কী কী করল?

- এলাকায় তো সবার বাড়িঘর পুড়িয়ে দিছে। আগুন দেওয়ার আগে বাড়ির টিন সব খুলে নিয়া গেছে। আর পাঞ্জাবিদের দালালগুলোই বাড়িঘরের টিন খুলে নিয়া গেছে।

আপনার পরিবারে কেউ শহীদ হয়েছেন কি?

- আমার পিতার দিক দিয়ে কেউ হয়নি। তবে আমার মায়ের গুষ্টির দিক থেকে কয়েকজন হয়েছে। আমার মামা দুইজন, আর খালু একজন। আমার মা তো ছিলেন বাঙালি।

আপনাদের এলাকায় কখন থেকে মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা শুরু হয়?

- পাঞ্জাবিরা গোটা এলাকা দখল করে নেওয়ার পর শুনলাম গেরিলাযুদ্ধের কথা। গেরিলাযুদ্ধ নাকি শুরু হবে। তখন আমরা এসব খুব একটা বুঝতাম না। এখানকার সব বাঙালি—বাসুদেবপুর, ভাঙ্গাপাড়া, তালপাড়াসহ অনেক দিককার লোক যারা আমরা ইন্ডিয়া গেছিলাম, ইন্ডিয়ায় ছিলাম, তারা

মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প করে দেয়, থাকার ব্যবস্থা খাওয়ার ব্যবস্থা করে। তারপর শোনা গেল মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার জন্য অনেক ছেলেপেলে প্রয়োজন। তখন দলে দলে এখানকার ছেলেপেলেরা ক্যাম্পে ভর্তি হলো।

আপনি কীভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন?

- মাঝে মাঝেই মুক্তিযোদ্ধারা আমাদের বাসায় আসত। রাত ১২টা হোক ১টা হোক, যখনই তারা আমাদের এখানে আসত তখনই আমরা তাদের জন্য রান্নাবান্না করতাম। খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করতাম। কেউ হয়তো ছোটখাটো আঘাত পাইছে, কিংবা অল্প আহত হইছে, তাদের ক্ষতস্থান ডেটলটেটল দিয়ে পরিষ্কার করে বেঁধেটেধে দিছি। এ ধরনের বহু কাজ করছি আমরা।

এই এলাকায় কারা রাজাকার ছিল?

- এই গ্রামের আমরা সবাই গেছিলাম ইন্ডিয়ায়। রাজাকার কেউ ছিল না। আমরা সবাই ইন্ডিয়া ছিলাম। সবাই দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আসছে। আসলাম চেয়ারম্যান বলে একজন ছিলেন। তার বাড়ি ভাঙ্গাপাড়ায়। উনি কিন্তু ইন্ডিয়া যাননি। উনি পাঞ্জাবিদের খুব সহযোগিতা করছেন। তারপর মারাও গেছেন। মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে মারা গেলেন না অন্য কোনোভাবে মারা গেলেন, এটা আমরা বলতে পারব না। উনি সে সময় এখানে পিস কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন।

শান্তি কমিটিতে কারা ছিল?

- আমি তাদের নাম বলতে পারব না। যে আসলাম চেয়ারম্যানের কথা বললাম, উনি ছিলেন সে সময় সবচেয়ে ক্ষমতাশালী ব্যক্তি। উনাদের ফ্যামিলির সবাই কিন্তু এই ধরনের।

এদের কি স্বাধীনতার পর ধরা হয়নি?

- কয়েকজনকে ধরা হইছে আর বাকিগুলো আত্মগোপন করছিল। আমার মনে আছে, অনেক দিন পর তারা বাড়ি আসছে।

যুদ্ধদিনের আর কোনো ঘটনার কথা কি আপনার মনে পড়ে?

- আমরা নিঃস্ব হয়ে গেছিলাম। আমাদের কিছুই ছিল না। দেশে ফিরে এলাকায় অনেক লাশ, কঙ্কাল দেখতে পাইছি। এটা বেশি দেখছি মোহড়ায়। আমি গুনে দেখিনি। পাঞ্জাবিরা এই এলাকায় অনেক লোককে মারছে। তারা এখানকার রশীদ চৌধুরীকে মারছে। ওনার ভাই এমপি ছিল। ওই কারণে উনার ওপর পাঞ্জাবিদের শত্রুতা। ওনারা ইন্ডিয়ায় যাইতে পারেননি। ওনাদের বাড়ি গোপালপুর। রশীদ চৌধুরীকে পাঞ্জাবিরা ধরে নিয়া মারছে। মেরে গর্ত খুঁড়ে ওই গর্তের মধ্যে চাপা দিছে। আরও দুইজন লোককে

ওখানে পাঞ্জাবিরা মারছে। ওদেরও গুলি করে ওই গর্তের মধ্যে ফেলে দিছে। এক রাখাল ছেলে এই ঘটনা দেখছিল। সে-ই বলছে সে দিনের ঘটনার কথা।

যুদ্ধের পর আপনার এলাকার স্কুল-কলেজ, ব্রিজ-রাস্তাঘাট, মসজিদ-মন্দিরের অবস্থা কেমন ছিল?

- কিছুই ছিল না। স্কুলে শুধু মাটি ছিল। ইটের গাঁথুনি যে দু-চারটা ঘর, ওগুলো ছিল। আর মসজিদে টিনটিন কিচ্ছু ছিল না। অন্যান্য জায়গায়ও তাই। কোনো জায়গায় স্কুল-কলেজ-মসজিদের টিন পাওয়া যায় নাই।

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **অমর চাঁদগুপ্ত**
নভেম্বর ২১, ১৯৯৬

মোহাম্মদ আবদুর রশিদ

পিতা : মোহাম্মদ রহিম উদ্দীন চৌধুরী, গ্রাম : সৈয়দপুর, ইউনিয়ন : বেতদীঘি
থানা : ফুলবাড়ী, জেলা : দিনাজপুর, শিক্ষাগত যোগ্যতা : দশম শ্রেণী
১৯৭১ সালে বয়স ২৪ বছর, ১৯৭১ সালে মুজাহিদ বাহিনীর থানা
কমান্ডার ছিলেন, বর্তমানে কৃষিজীবী।

১৯৭১ সালের পঁচিশে মার্চ পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর আক্রমণ সম্পর্কে আপনি কী শুনেছিলেন?

- আমি মুজাহিদ বাহিনীর কমান্ডার ছিলাম। ১৯৬৯ সালে আমি মুজাহিদে যোগ দেই। ২৫-২৬ মার্চ আমি পলাশবাড়ীতে (বৃহত্তর রংপুর) ছিলাম। সেখানে আমি থার্ড বেঙ্গল রেজিমেন্টের সঙ্গে ছিলাম। ২৪ মার্চ হঠাৎ ওই রেজিমেন্টের পাকিস্তানি সৈন্যরা আমাদের হাতিয়ার ক্লোজ করে। কোত (অস্ত্রাগার) তালাবদ্ধ করা হয়। তারপর আমাদের বলা হয়, তোমাদের বেতন দেওয়া হবে। বেতন দেওয়ার নামে প্রহসন করে আমাদের কোনো প্রকার হাতিয়ার ছাড়া রাখা হলো। পলাশবাড়ী হাইস্কুলে আমাদের ক্যাম্প ছিল। স্কুল বিল্ডিংয়ের নিচে আমরা ছিলাম প্রায় ৩৫০ জন। ওপর তলায় ক্যাপ্টেন শাহজাহান সাহেব। ২৫ মার্চ রাতে ঠা ঠা একটা শব্দ আসে আমাদের কানে। সেটা রাইফেলের গুলির শব্দ বলে মনে হচ্ছিল। এই শব্দ পেয়ে আমরা ছোটাছুটি শুরু করি। সেখানে আমাকে পাকিস্তানি সৈন্যরা আটক করে। আমাকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয় সৈয়দপুরে। সেখানে নিয়ে গিয়ে আমাকে ওরা (পাকিস্তানিরা) বলে, তোমাকে শান্তি বাহিনীতে যোগ দিতে হবে। আমি তখন বাধ্য হয়ে বলেছি, ঠিক আছে, আমি রাজি আছি। তখন ওরা আমার কোম্পানির মুজাহিদদের বেতন ১০ হাজার টাকা আমার হাতে দেয়। এই ১০ হাজার টাকা নিয়া আমি চিন্তামনে অবস্থিত আমার কোম্পানিতে ফিরে আসি। আমার কাছে মুজাহিদদের ৩০০ সার্টিফিকেটও ছিল। মুজাহিদদের আমি সার্টিফিকেট এবং বেতন দিয়েছি। তাদের বেতন দেওয়ার পর প্রায় ৫০০ টাকার মতো আমার কাছে ছিল, যে টাকা আমি নিজে খরচ করি। তারপর সেখানেই আমি চিন্তাভাবনা করতে থাকি এখন কী করা যায়। সেই মুহূর্তে থার্ড বেঙ্গল রেজিমেন্টের একজন আমাকে কল করে। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে শাহ আলম নামে আমার এক ওস্তাদ ছিল, ওনার বাড়ি ছিল আমাদের এলাকায়। উনি আমাকে কল করেন। তো ওনার কল পেয়ে আমি তখন ফুলবাড়ীতে যাই। ফুলবাড়ীতে থার্ড বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটা ইউনিটের সঙ্গে কাজ করতে থাকি। ইতিমধ্যে থার্ড বেঙ্গল রেজিমেন্ট পাকিস্তানিদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। তারা বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন এলাকায় পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলছিল। এদিকে তখন তোড়জোড় শুরু হয়ে যায় পার্বতীপুরের দিকে যাওয়ার জন্য। তারা (পাকিস্তানিরা) আমাদের ধাওয়া করে। আমরা সামান্য অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তাদের সাথে টিকতে না পেরে পিছু হটে ঠাকুরগাঁওয়ে পৌঁছাই। সেখানে গিয়ে শুনতে পেলাম ঢাকায় আমাদের বাঙালিদের ওপর পাকিস্তানিরা অত্যাচার, নির্যাতন এবং বিভিন্নভাবে আক্রমণ শুরু করেছে। এই সংবাদ আমরা ২৭ মার্চ রাত ১২টায় পাই।

এই সংবাদ আপনারা কীভাবে পেলেন?

- আমাদের থার্ড বেঙ্গল রেজিমেন্টের সঙ্গে যে ক্যাপ্টেন ছিলেন, ক্যাপ্টেন হারুন, উনার মুখে আমরা জানতে পারি।

আপনার তখন কী মনে হয়েছিল?

- আমার তখন মনে হলো যে এবার বোধ হয় যুদ্ধ লেগেই গেল।

১৯৭১ সালে আপনি আক্রান্ত হয়েছিলেন কি?

- হ্যাঁ, আমি তো বলেছি, পলাশবাড়ী থেকে যখন আমি পালানোর চেষ্টা করি, তখন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আমাকে ধরে সৈয়দপুর নিয়ে যায়।

সৈয়দপুর নেওয়ার পর?

- সৈয়দপুর নেওয়ার পরদিন আমাকে ওরা আমার কোম্পানির মুজাহিদদের বেতন দেয়। বেতন দেওয়ার আগে আমাকে শান্তি বাহিনীতে নেওয়ার চেষ্টা করে। তখন আমি বললাম, ঠিক আছে, আমি আমার কোম্পানি নিয়ে ফিরে এসে আপনাদের শান্তি বাহিনীতে যোগ দিব। এ কথা বলে আমি চিন্তামনে চলে আসি। সেখানে আমার কোম্পানি ছিল। এখানে আসার পর আমি আর ওদের কাছে ফিরে যাইনি।

আপনি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেন কেন?

- আমি তো পাকিস্তান মুজাহিদ বাহিনীতে ছিলাম। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আমাদের মুজাহিদদের তাদের দলে টানতে ছিল। তারা খোঁজখবর নিচ্ছিল

মুজাহিদ কারা? তারা মনে করছিল এরাই বোধ হয় মুক্তিফৌজ। এই উদ্দেশ্য নিয়া তারা যাদের নাগাল পাইত, তাদের খতম করত। এই ভয়ে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করি।

আপনার এলাকায় পাকিস্তানিরা কখন আক্রমণ করল?

- ৬ এপ্রিল। চরকাইতে তাদের ক্যাম্প ছিল। ওখানে তারা প্রথমে ক্যাম্প করেছিল। হঠাৎ তারা সেই ক্যাম্প থেকে উইথড্র করে এদিকে আসে। আমাদের এলাকার মধ্যে যে সমস্ত লোক মুজাহিদ বাহিনীতে ট্রেনিং-ফ্রেনিং করেছিল বা অন্যান্য ট্রেনিং করেছিল, বাঙালি যারা অন্যান্য বাহিনীতে ছিল, তাদের বাড়িঘর পুড়াতে পুড়াতে, জ্বালাতে জ্বালাতে পাকিস্তানিরা আসতেছিল। মেয়েদের ওপরও তারা অনেক নির্যাতন করে।

পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর হাতে আপনার পরিবারের কেউ শহীদ হয়েছে কি?

- না, হয়নি।

আপনার এলাকায় কখন থেকে মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা শুরু হয়?

- এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি থেকে।

আপনার এলাকায় বা গ্রামে রাজাকার কারা ছিল?

- রাজাকার আমাদের এলাকার মধ্যে কয়েকজন ছিল। তাদের নাম এখন মনে পড়ছে না।

শান্তি কমিটিতে কারা ছিল?

- হ্যাঁ, শান্তি কমিটিতে ছিল, ফজলু হাজি আর...।

আলবদর, আলশামস কারা ছিল?

- কুরি নামে একটা লোক ছিল। তার বাড়ি কেটাহাটায়।

ওরা রাজাকার-আলবদর হলো কেন?

- লোভে পড়ে হইছিল। রাজাকার হলে তার বাড়িতে অনেক কিছু জিনিসপত্র পাকিস্তানিরা দিত। এদের বাড়িতে তারা ওঠাবসা করত।

তারা এখন কোথায়?

- তারা কিছু মারা গেছে। কিছু বেঁচে আছে।

আপনি কোন সেক্টরের অধীনে ছিলেন?

- আমি থার্ড বেঙ্গল রেজিমেন্টের সঙ্গে কাজ করেছি ৭ নম্বর সেক্টরে।

আপনি কোন কোন এলাকায় যুদ্ধ করেছেন?

- কাউনিয়া, লালমনিরহাটে থার্ড বেঙ্গল রেজিমেন্টের সঙ্গে।

কীভাবে?

- আমি থার্ড বেঙ্গল রেজিমেন্টের নির্দেশ মোতাবেক কাজ করেছি। সেই এলাকায় যে সমস্ত রাজাকার, আলবদর ছিল তাদের ধরার প্রচেষ্টা চালাইছি এবং পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীকে হটানোর জন্য যুদ্ধ করেছি।

পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর সঙ্গে আপনাদের কীভাবে যুদ্ধ হয়েছে?

- মুখোমুখি যুদ্ধ হয়েছে।

কী ধরনের সেটা?

- তাদের সঙ্গে আমাদের অতিরিক্ত রকমের যুদ্ধ হয়েছে। যুদ্ধে দুপক্ষ থেকেই বৃষ্টিবর্ষণের মতো গোলাগুলি চলে। আমাদের ১১০ জনের মধ্যে প্রায় ৪০ জন জীবন হারায়। আল্লাহ আমার জীবন রক্ষা করেছেন।

সেটা কোন এলাকাতে?

- কাউনিয়ায়।

সেখানে আপনারা মোট কতজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন?

- সেখানে আমরা মোট ১১০ জন ছিলাম—আমরা ৬০ জন এবং সামরিক বাহিনীর ৫০ জন।

পাকিস্তানিরা কতজন ছিল?

- ওরা ১৫০ থেকে ২০০ জন ছিল।

আপনারা কি তাদের হটাতে পেরেছিলেন?

- হ্যাঁ, হটাতে পেরেছিলাম। তাদেরকে আমরা প্রায় ছয় মাইল পিছনে হটাতে সক্ষম হয়েছিলাম।

তাদের কাউকে আপনারা ধরতে পেরেছিলেন?

- হ্যাঁ, আমরা তাদের দুজনকে ধরেছিলাম।

জীবিত অবস্থায়?

- হ্যাঁ।

তাদের মৃত লাশ কয়টা পেয়েছিলেন?

- আমরা লাশ পাইনি। তবে আমাদের অনুমান, জনা চল্লিশেক তাদের পক্ষে মারা গেছে।

আপনাদের পক্ষে?

- আমাদের পক্ষে মারা গেছে ৩৫ জন।

কতজন আহত হয়েছিল?

- ১৫-২০ জন। আমি নিজেও আহত হয়েছিলাম। আহতদের মধ্যে কয়েকজন পরে মারা গেছে।

আহত অবস্থায় আপনার জ্ঞান ছিল?

- হ্যাঁ, জ্ঞান ছিল।

তারপর?

- তারপর বাংলাদেশের মেডিকেল টিম আমাকে ফিল্ড থেকে নিয়ে আসলো এবং তারা যথাসাধ্যভাবে আমার চিকিৎসা করে।

বাংলাদেশের ভিতরে?

● হ্যাঁ, এটা বাংলাদেশের ভিতরে।

কোথায়?

● ধবলহাটিতে।

সেখানে কি হাসপাতাল ছিল?

● হাসপাতাল মানে, সাময়িকভাবে একটি ফিল্ড হাসপাতাল করা হয়েছিল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য। সেখানে মেডিকেল টিম ছিল।

আর কোথায় যুদ্ধ করেছেন?

● তারপর আমরা চলে আসি দাঙ্গারহাটে। তারিখটা ঠিক খেয়াল নাই। দাঙ্গারহাট থেকে সীমান্ত পার হয়ে হিলিতে যাই।

হিলিতে কি আপনি যুদ্ধ করেছেন?

● হিলিতে যুদ্ধ করেছি মানে, আমি যাওয়ার পর কয়েক মিনিট যুদ্ধ করেছি।

হিলিতে কয়েক মিনিট যুদ্ধ করার সময় আপনি কী দেখেছেন?

● খানদের ইচ্ছা ছিল হিলির বর্ডার ক্রস করে তারা আমাদের উঠাইয়া নিয়া যাবে। আমাদের লোকগুলোকে তারা কীভাবে অ্যাটাক করতে পারে, আমাদের কীভাবে উঠাইয়া নিতে পারে, সেই চিন্তাভাবনা তাদের মধ্যে ছিল। হিলিতে বহু কাণ্ড ঘটেছে, তাণ্ডবলীলা চলেছে। পাকিস্তানিরা আশপাশের বাঙালিদের সব বাড়িঘর পুড়িয়ে দিয়েছে। বহু লোকের, মেয়েলোকের জীবন তারা নষ্ট করেছে। ওরা নিষ্ঠুরভাবে মানুষ হত্যা করত। সেই সিরিয়ালের মধ্যে আমিও পড়েছিলাম। মিথ্যা কথা বলে ভাগ্যক্রমে বেঁচে গেছি। আমরা সাতজন ছিলাম। রেকি করতে গিয়ে আমরা ধরা পড়ে গেছিলাম। আমাদের সাতজনকে বান্ধা হয়। খানসেনারা যাদের ধরত তাদের একত্র করে, লাইনের সামনে যে লোক থাকত তাকে দড়ির বাঁধন থেকে খুলে চারজন খানসেনা লাঠি দিয়ে পিটাত। পিটাইয়া মেরে ফেলত। মারার পর তার পিছনে যে লোক থাকে তাকে দিয়া ওই লাশ সরাইয়া নিত। তারপর ওই লোককে যেতে হতো সামনে। আমাদের সাতজন থেকে এভাবে যখন পাঁচজন পার হয়ে যায়, তখন আমার সিরিয়ালও আসে। আমি সবার শেষে ছিলাম। কাশেম খান নামে একজন ছিল তাকে আমি পাকিস্তান আমল থেকেই চিনতাম। দেখি যে সেই কাশেম খানও ওখানে। সে আমাকে দেখে চিনল। সে এসে আমাকে বলল, 'তুমি তো মুজাহিদ বাহিনীর কোম্পানি কমান্ডার ছিলে, চিন্তামনে, ডি কোম্পানিতে, ১১ নম্বরে, তোমার নাম রশিদ না? আমি তখন বললাম, 'হ্যাঁ।' সে বলল, 'তুমি কি মুক্তিযোদ্ধায় যোগ দিয়েছ?' আমি বললাম, 'না।' সে বলল, 'তোমাকে কীভাবে ধরল?' আমি বললাম, 'এই এলাকা দিয়ে আমি যাচ্ছিলাম আমার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে, সেই মুহূর্তে আমাকে তারা ধরে। আমি যখন ধরা পড়ি তখন আমার কাছে তারা কোনো হাতিয়ার পায়নি।' তখন সে বলল, 'ঠিক আছে, তুমি কি শান্তি বাহিনীতে আসবে।' আমি বললাম, 'আসব।' জান বাঁচানোর স্বার্থে আমি মিথ্যা কথা বললাম। তারপর তারা ওই পাঁচজনকে মেরে ফেলে দিল। তারপর আমার সামনে যে ছিল তাকে সে বলল, 'তুমি কী করো?' সে বলল, 'আমি দর্জিগিরি করি।' ওরা তো বাংলা কথা বুঝে না। সে বলল, 'পাটলুন সেলাই করতে পারি।' তখন ওই খান বলল, 'ঠিক আছে, আসো।' ওনাকে আর আমাকে নিয়া গেল। নিয়া যাইয়া আমাকে বলল, 'ঠিক আছে, তুমি চিন্তামন যাইয়া যোগ দেও।' আমি বললাম, 'ঠিক আছে, দেব।' সে মুহূর্তে আমাকে খানসেনারা গাড়ি করে চিন্তামন পাঠিয়ে দেয়। সেখানে পাঠিয়ে দেওয়ার পরই আমাদের এখানে শরিফ নামে এক লোক ছিল, মাদলাহাটের, সে যখন জানতে পারল, রশিদকে ধরা হয়েছে, তখন ভাইস চেয়ারম্যান আবদুস সামাদকে সঙ্গে নিয়ে সে আমাকে উদ্ধার করতে যায়। তারা যাওয়ার পর খানসেনারা আমার ওপর প্রসন্ন হয়। তারা বলে, 'ঠিক আছে, তোমাকে ছেড়ে দেওয়া হলো, তুমি বাড়ি থেকে কালকে সকালে আসো।' একটা কাগজ আমাকে লিখে দেয় এবং বলে, 'তুমি কাল সকালে এখানে আসো। এখানে এসে শান্তি বাহিনীতে যোগদান করবে।' আমি কাগজ নিয়ে ওই মুহূর্তেই সরাসরি ইন্ডিয়াতে ভেগে যাই।

যে সাতজনকে ধরা হলো, তাদের পাঁচজনকে আপনার চোখের সামনেই...?

● হ্যাঁ, চোখের সামনেই মেরে ফেলা হলো। আমরাই তাদের লাশ সরাইয়া রাখলাম।

আপনি নিজেও?

● হ্যাঁ, আমি নিজেও সহকর্মীদের লাশ সরাইয়া রাখলাম। এভাবেই খানসেনারা মানুষ মারত। গোল হয়ে, চারদিকে গোল হয়ে এ একটা কোপ মারত, মেরে আর একজনের কাছে ধাক্কা দিত, সে কোপ মারত, তারপর সে আরেকজন খানসেনার কাছে ধাক্কা দিত। সে আবার একটা কোপ মারত, মেরে সে আরেকজনের কাছে ধাক্কা দিত, সে কোপ মারত, এভাবে কুপিয়ে কুপিয়ে মারে ফেলছে। এটা দেখে আমার কলজে-টলজে সব শুকিয়ে গেছে। ভয়ে কাঁদতেও পারিনি। তাদের নিষ্ঠুরতা দেখে এমন হতবাক হয়েছি যে চোখেও পানি আসেনি।

যে পাঁচজনকে পাকিস্তানিরা আপনার চোখের সামনে মারল, তাঁদের বাড়ি কোথায় ছিল?

● হিলির ছিল তিনজন, আর দুজনের কথা সঠিক আমি বলতে পারব না।

তাঁদের কী নাম ছিল?

● একজনের নাম ছিল নুরুল, একজনের নাম ছিল ইসলাম, আরেকজন ছিল বাবুল মল্লিক।

তাঁরা কি সবাই মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন?

● হ্যাঁ, সবাই মুক্তিযোদ্ধা ছিল।

সবাই কি অস্ত্রসহ ধরা পড়েছিলেন?

● না, অস্ত্রসহ দুজন ধরা পড়েছিল। আর বাকিগুলো অস্ত্র ছাড়াই ধরা পড়ছিল। তারা অস্ত্র ফেলে দিয়েছিল। খানসেনারা তাদের বহু দূর দাবড়াইয়া নিয়া যাইয়া খালপাড়ে ধরছে।

সেখানে আপনারা কী জন্য গিয়েছিলেন?

● আমরা সেখানে রেকি করতে গেছিলাম এবং পাকিস্তানিদের একটা ক্যাম্প উড়িয়ে দেব সেই প্ল্যান নিয়ে গেছিলাম।

রেকি করতে গিয়ে কী দেখলেন?

● আমাদের রেকি করার উদ্দেশ্যই হলো সেখানে তাদের কী কী যন্ত্রপাতি, অস্ত্রশস্ত্র আছে এবং আমাদের কী যন্ত্র হলে আমরা পাকিস্তানি ক্যাম্প উড়িয়ে দিতে পারব বা তাদের হটাইয়া দিতে পারব, এই উদ্দেশ্যেই আমরা যাই। তারা আগে থেকেই সেখানে ক্যামোফ্লেজ বা অ্যামবুশ করে ছিল। ওরা বিভিন্নভাবে যেখানে-সেখানে লুকাইয়া ছিল। আমরা ঠিক বুঝতে পারিনি। আমরা যখন তাদের বাংকারের কাছাকাছি গিয়ে ওদের ভিতরে ঢুকে পড়েছি, তখন সামনের দিক থেকে এবং পিছনের দিক থেকে ধাওয়া করে আমাদের ধরে।

তারা কতজন ছিল?

● রেকি করার একটা নিয়ম ছিল। রেকিতে গিয়ে একটা ফায়ার দিলে বোঝা যায় কোন এরিয়াতে কী আছে, কোন বাংকারে কী আছে। একটা ফায়ার দিলে শত্রুপক্ষও ফায়ার দেয়। তখন আমরা সেটা ধরতে পারি। এই হিসেবে আমাদের একজন ফায়ার দিয়েছিলেন, ফায়ার দেওয়ার পরই আমরা বুঝতে পারলাম যে শ খানেকের মতো লোক ছিল তারা।

একশোর মতো লোক ছিল, সব পাকিস্তানি সেনা?

● হ্যাঁ, সব পাকিস্তানি সেনা।

সেখানে কোনো রাজাকার বা এ ধরনের কেউ ছিল?

● না, আমাদের চোখে তখন পড়ে নাই। ছিল হয়তো, কিন্তু আমাদের চোখে পড়ে নাই।

সেখানে সাধারণ মানুষ ছিল না?

● সাধারণ মানুষ তো মোটেই ছিল না। সম্পূর্ণ বাড়িঘর খান বাহিনী পুড়িয়ে শেষ করে দিয়েছে।

যুদ্ধ চলাকালে এ রকম আর কোনো...?

● এরকম আরেকটা স্মরণীয় ঘটনা, সেটা হলো আমার সম্পর্কে। আমার নিজের ঘটনা। আমাকে আরেকবার এখানে রেকি করার জন্য পাঠিয়ে দিল।

মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার ছিলেন বাদশা, ফুলবাড়ীর। উনি আমাকে রেকি করার জন্য পাঠিয়ে দিলেন আমাদের এই এলাকায়।

কোথায়?

● চিন্তামনে। এই চিন্তামন যখন পাঠায়, তখন আমি এখানে একাই রেকি করতে আসি। আসার পরে দেখি, এখানে পাকিস্তানি বাহিনী স্থানীয় লোকজন নিয়া তাদের ক্যাম্পের পাশে রাস্তার মধ্যে ইট বসাইতেছে। তো আমিও ইট বসানোর কাজে যাই। ইট বসানোর জন্য যখন যাই তখন আমার মাথার উপরে একটা গেঞ্জি ছিল, একটা ঘড়ি ছিল, আর কিছু কাগজ ছিল এবং একটা কলম ছিল। এসব ছিল পাকিস্তানিদের বাংকারের নকশা করার জন্য—তাদের কোন বাংকারে কী আছে? কতজন লোক আছে? আমি সকাল নয়টা থেকে ১২টা পর্যন্ত এটা করি। কয়েকটা বাংকারের আমি নকশা করে উঠেছি। তারপর যে বাংকারের মধ্যে ওদের মোটর ঢোকানো থাকত, সেই বাংকারের নকশা করতে যাই। তখন পিছন দিক থেকে দুজন পাকিস্তানি সৈন্য এসে আমাকে বলে, 'অ্যাটেনশন।' যখন অ্যাটেনশন বলেছে, তখন আমার পা জড়িয়ে আসে। আমার আগে থেকেই ট্রেনিং ছিল। তখন ওরা বোধ হয় বুঝতে পেরেছে আমি ট্রেনিংপ্রাপ্ত, মুক্তিফৌজ। তারপর ওরা আমাকে ধরে। ধরে নিয়ে যায় চিন্তামনের পশ্চিম পাশের একটা পুকুরের কাছে। এই পুকুরের পাড়ের নিচে দেখি একটা কোদাল আর দুজন খানসেনা। বয়স্ক খানসেনা। তারা আমাকে নিয়ে যায় শেষ করার জন্য। নিয়া যাইয়া আমাকে বলে তুমি কলেমা পড়ো। আমি কলেমা পড়তে থাকলাম, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ'। ওরা আমাকে গর্ত খুঁড়তে বলে। কোদাল দিয়ে আমি এক হাঁটু গর্ত খুঁড়ি। এরপর পুকুরের পানিতে ওজু করি এবং গর্তে শুয়ে পড়ি। এমন সময় আটপুকুর নামে একটা হাট আছে, ওই দিক থেকে আমাদের মুক্তিবাহিনী খানসেনাদের খুব তাড়া করল। তখন আশপাশের খানসেনারা জীবন নিয়ে পিছনে পলাইয়া যেতে শুরু করল। এই মুহূর্তে আমার কাছ থেকে দুজনের একজন সরে গেল, আর একজন আমাকে গুলি করবে, এই রকম একটা অবস্থা। দেখছি ১ নম্বর ট্রিগারে আঙুল দিছে। এরপর ২ নম্বর ট্রিগার টিপে গুলি করবে। আমি তখন চিন্তা করলাম, আমি তো ফায়ার হয়ে যাচ্ছি, আমার তো রক্ষা নাই। সেই মুহূর্তে অস্ত্র সম্পর্কে সবকিছু জেনেও আমি মনে করলাম, খান একজন যখন, তখন দেখি চেষ্টা করে। গর্ত থেকে ঝট করে উঠে আমি ওর রাইফেলের বাঁটে বাড়ি মারলাম। গুলি আকাশের দিকে গেল। তারপর ওই বয়স্ক খানকে ধাক্কা মেরে ওর রাইফেলটা আমি কেড়ে নিলাম। নিয়ে সেই রাইফেল দিয়ে ওকে একটা বাড়ি দিয়ে আমি দৌড় দেই এবং সোজা ইন্ডিয়া চলে যাই।

আপনি তখন ওই রাইফেল দিয়ে ফায়ার করতে পারেননি?

● না। ভয় ছিল, চারদিকে বহু খানসেনা ছিল। শব্দ শুনে আমাকে আবার তারা আক্রমণ করতে পারে।

আর যে খানসেনার কাছ থেকে রাইফেল কেড়ে নিলেন, সে?

● সে হয়তো পড়ে গেছে। তাকে শুধু রাইফেলের বাঁট দিয়ে একটা বাড়ি দিয়েছি। আর আমি লক্ষ করিনি তাকে, কী হয়েছে তার।

এর পরবর্তী সময়ে আপনি কী করলেন?

● ইন্ডিয়াতে যাওয়ার পর আবার ওখানে থার্ড বেঙ্গল রেজিমেন্টের একজনের সঙ্গে দেখা হয়। ওনার নাম ছিল আবুল হোসেন। উনি পতিরামে আসছিলেন। ওনার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর উনি আমাকে বললেন, তোমার কী অবস্থা। আমি তাঁকে বললাম, স্যার, এই তো অবস্থা। ওনার সঙ্গে গাড়ি ছিল। উনি বললেন, আমার গাড়িতে ওঠো। ওই গাড়িতে করে উনি আমাকে শিলিগুড়িতে নিয়ে যান।

শিলিগুড়িতে যাওয়ার পর?

● ট্রেনিং তো আমার জানাই দিল। তার পরও আমাকে আবার কিছু আইডিয়া এবং ট্রেনিং দিল। এরপর আমাকে কাউনিয়া নিয়া গেল। পরবর্তী সময়ে থার্ড বেঙ্গল রেজিমেন্টের শাহ আলম ওস্তাদ আমাকে কয়েক দিন ওখানে রাখে। রাখার পর আবার আমাকে নিয়া যায় কাউনিয়ায়। আমি দুইবার কাউনিয়াতে যাই।

তার আগে আপনি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে ট্রেনিং নেননি?

● না, তার আগে ট্রেনিং নেইনি। আমি তো মুজাহিদ ট্রেনিংপ্রাপ্ত লোক।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে এ রকম ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন আর কোথায়ও হয়েছিলেন কি?

● না। আর কোনো ঘটনা ঘটেনি।

দেশ যখন স্বাধীন হয় তখন আপনি কোথায় ছিলেন?

● ভারতে ছিলাম।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এলাকায় ফিরে গ্রামের অবস্থা কী দেখলেন?

● আমাদের গ্রাম এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষ করুণ অবস্থায় ছিল। অনেকের ঘরবাড়ি পাকিস্তানিরা পুড়িয়ে দিয়েছে। অনেকের বহু কিছু লুটতরাজ হয়েছে। সে সময় আমাদের ওই দিকে বন্যাও হয়েছিল। তাতেও অনেক ক্ষতি হয়েছে। সব জায়গায় করুণ অবস্থা ছিল।

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **ভবেন্দ্রনাথ বর্মণ**
অক্টোবর ২৬, ১৯৯৬

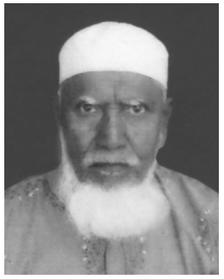

মোহাম্মদ খলিলুর রহমান সরকার

পিতা : মৃত খেদমতউল্লাহ সরকার, গ্রাম : বানিয়াল, ডাকঘর ও ইউনিয়ন : বোয়ালদা, থানা : হাকিমপুর, জেলা : দিনাজপুর, শিক্ষাগত যোগ্যতা : বিএ এবং পিটিআই ট্রেনিংপ্রাপ্ত, ১৯৭১ সালে বয়স ৩৬ বছর, ১৯৭১ সালে শিক্ষকতা করতেন, বর্তমানে অবসর জীবন যাপন করছেন।

আপনি কি ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে আক্রান্ত হয়েছিলেন?

● ঠিক সরাসরি আক্রান্ত না। তবে আমাদের এলাকায় প্রথম যখন তারা আক্রমণ করে, সে দিনের ঘটনা আক্রান্ত পর্যায়ের। আমাদের গ্রামের পূর্ব দিকে ছাতনী গ্রাম। ওই জায়গায় একদিন মিলিটারির কয়েকটা গাড়ি আসলো। তারা আসার সঙ্গে সঙ্গে আশপাশের গ্রামে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে দেখা গেল। যে দিক দিয়ে ওদের গাড়ি যাচ্ছে সেই দিক থেকেই সঙ্গে সঙ্গে দাউ দাউ আগুন এবং ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখা যাচ্ছিল। এসব দেখে লোকজন অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। তারপর সংবাদ আসলো যে লোকজনকে গুলি করে মারা হচ্ছে। যাকে পাচ্ছে তাকে পাকিস্তানি সৈন্যরা মারতেছে। চারদিকে সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হলো। তখন মনে হলো, ওদের সামনে যদি আমরাও পড়ি, তাহলে আমাদেরও অস্তিত্ব থাকবে না। এরা তো আক্রমণকারী। একটা বর্বর আক্রমণকারী নিরস্ত্র জনসাধারণের ওপর আক্রমণ করছে। এটা আমরা কোনো দিন আশাও করতে পারিনি। কোনো দিন ভাবিনিও যে, এ রকম ঘটতে পারে। আর সেটাকে বাধা দেওয়ার মতো হঠাৎ আমাদের কোনো স্কোপও তখন ছিল না। আমরা ছোটাছুটি করে বিভিন্ন দিকে পালাইয়া গেলাম। যে কারণে সরাসরি আক্রান্ত হইনি।

আপনি কেন মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেন?

● প্রধানত পাকিস্তানি মিলিটারিদের অন্যায়-অত্যাচার দেখে। তারা দেশের যেটা

সাধারণ আইনকানুন সেটা মানল না। নির্বাচন হলো। কিন্তু নির্বাচনের রায় অমান্য করে নিরস্ত্র জনসাধারণের ওপর তারা লাফিয়ে পড়ে জনগণের জানমাল, ইজ্জত ধ্বংস করতে থাকল। নিজের জীবন বাঁচানোর জন্য এবং এলাকা বাঁচানোর জন্য, আত্মীয়স্বজনকে বাঁচানোর জন্য, গ্রামগুলো বাঁচানোর জন্য আমাদের কী করণীয়, কী করতে পারি? তখন সবাই বলে যে আমরা হয়তো এখনই মরে যেতে পারি, কোনো নিশ্চয়তা নাই। তার চেয়ে বরং তাদের সঙ্গে লড়েই মরি। এই প্রেরণায় আমার মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়া।

আপনার এলাকায় কখন পাকিস্তানি সৈন্যরা আক্রমণ করল?

- খুব সম্ভব এটা এপ্রিলের ১৩-১৪ তারিখে। ঘোড়াঘাটের দিক থেকে ওরা প্রথম এদিকে আসে। রাস্তায় তখন ধুলা ছিল প্রচুর। তারা যখন আসছিল তখন দুই পাশের বাড়িঘরগুলোতে শুধু আগুন জ্বলছে। তারা কী যেন ছুড়ে আর গুলি করে। কী যেন ওটার নাম! সেটা দিয়া ওরা ফায়ার করে আর বাড়িঘরে দাউদাউ আগুন ধরে যায়। লোকজনও মারতে থাকে। যেখানে দেখে সেখানে গুলি করে।

পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী যখন আক্রমণ করে, তখন আপনার এলাকার লোকজন কী করল?

- ওরা আসার আগেই এখান থেকে ভয়ে লোকজন এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করে বিভিন্ন জায়গায় আশ্রয় নেয়। কেউ আশ্রয় নিল বনজঙ্গলের ভিতরে, কেউ মাঠের মাঝখানে। কেউ আবার ওপারে ইন্ডিয়া চলে যাওয়া শুরু করল। ইন্ডিয়ায় আমরা আশ্রয় পাব এ রকম ধারণা কিন্তু পুরোপুরি তখনো আমাদের ছিল না। আমাদের এখান থেকে কিছু লোক গেল। শুনলাম যে ওপারে দলে দলে লোক যাচ্ছে এবং কাউকে ইন্ডিয়ান কর্তৃপক্ষ অ্যারেস্ট-ফ্যারেস্ট করছে না। বরং তাদের তারা রক্ষা করার চেষ্টা করছে। তখন মানুষ স্রোতের মতো ওপারে যাওয়া শুরু করল।

১৯৭১ সালে আপনার পরিবারে কেউ শহীদ হয়েছেন কি?

- হ্যাঁ, হইছে। আমার ছোট ভাই পাকিস্তানের এয়ারফোর্সে ছিল। ডাইরেক্ট পাকিস্তানি সেনাদের হাতে নয়। সম্ভবত রাজাকার বা বিহারিদের হাতে। সে আমাদের গ্রামে আসতে ছিল। বাড়ি আসার সময় রাস্তায় গুলি কইরা তাকে মাইরে ফালাইছে। পরে আমি এ খবর পাই।

আপনার এলাকায় কখন থেকে মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা শুরু হয়?

- আমাদের এলাকায় মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা শুরু হয় এপ্রিলের শেষের দিক থেকে। এপ্রিলের শেষ দিক থেকেই লোকজন মুক্তিবাহিনীতে ভর্তি হতে শুরু করে।

মুক্তিযুদ্ধের সময় আপনার এলাকায় সংগঠক হিসেবে কারা কারা কাজ করেছে?

- এখানে আবদুল কুদ্দুস মুনশি, তখনকার আওয়ামী লীগ সভাপতি মরহুম সৈয়দ সোলায়মান আলী, মণি বাবু এবং এমপি আবদুল মজিদ চৌধুরী সংগঠক হিসেবে কাজ করেছেন। তারপর মকবুল হোসেন মল্লিকও ছিলেন।

আপনার গ্রাম বা এলাকায় রাজাকার কারা ছিল?

- রাজাকার প্রত্যেক গ্রামেই ছিল। তবে রাজাকার ছিল দুই ধরনের। একদল সত্যিকারভাবে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ছিল। তারা পাকিস্তানের পক্ষে ছিল। আরেক ধরনের রাজাকার ছিল, তারা প্রাণের দায়ে রাজাকার হয়েছে। আমাদের এখান থেকে বেশির ভাগ লোকজন ইন্ডিয়াতে চলে যায়। বাড়ি বা পাড়া পাহারা দেওয়ার জন্য প্রত্যেক বাড়ি থেকে দু-একজন করে ছিল। কারও ভাই গেছে। ভাতিজা গেছে। নিজে হয়তো আছে বয়স্ক লোক হিসেবে। পাকিস্তানি সেনারা বা যারা পাকিস্তানপন্থী ছিল তারা এদের নিয়া গিয়া রাজাকার বানাইছে। তাদের দ্বারা কাজ করায়ে নিয়েছে। তো এই ধরনের রাজাকারই আমাদের এখানে বেশির ভাগ ছিল। আত্মরক্ষার খাতিরে তারা রাজাকার হইছিল। এ ছাড়া আরেক দল লোক ছিল তারাও বাধ্য হয়ে রাজাকারে নাম দিত। খানসেনারা বলত, এই ইউনিয়ন থাইকা এতজন লোক দিতে হবে। না দিলে গ্রাম পুড়িয়ে দেওয়া হবে। অন্যদিকে খানসেনাদের যারা দালাল ছিল তারা বলত, কার কার ছেলেপেলে নাই এখানে, সেটা বাছাই করে বা তাদের নাম লিস্ট করে খানসেনাদের দেওয়া হবে এবং সেই ছেলেপেলেকে যদি তারা ধইরা আনি না দেয়, তাহলে তার বাপ-মাকে বা আত্মীয়স্বজনকে মেরে ফেলা হবে। জমিজমা বা বাড়িঘর সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেওয়া হবে। কিন্তু তারা যদি রাজাকার হয়, তাহলে কিছু বলা হবে না। ফলে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু কিছু লোক রাজাকারে নাম দিয়েছিল এবং তারা পরবর্তী সময়ে আমাদের যথেষ্ট সহযোগিতা করছে। ওরা তো ফুল্‌লি আমাদের হেল্প করেছে।

শান্তি কমিটিতে কারা ছিল?

- শান্তি কমিটিতে আমাদের এলাকার কিছু লোক ছিল। কিন্তু সেগুলো তো প্রায় মারা গেছে। ওরা এখন নাই।

তাদের নাম কী বলতে পারেন?

- শান্তি কমিটির লিস্ট আমি একটা পেয়েছিলাম। কিন্তু সেই লিস্ট আমার কাছে এখন আর নাই। ছাতনীতে মৌলভি আবুল হোসেন ছিল। উনি দেশ স্বাধীন হওয়ার পর অ্যারেস্ট হন। তার বিচার হয়। কিন্তু বিচারে উনি খালাস হয়ে আসেন। কোনো কিছু হয়নি তার। এই অঞ্চলের সবচেয়ে বড় রাজাকার ক্যাম্প ছিল ছাতনীতে। এই ক্যাম্পে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের প্রধান জেনারেল নিয়াজি আসছিল একবার। আবুল হোসেন মৌলভি শান্তি কমিটির কোন পদে ছিলেন জানি না। তবে বিশেষ দায়িত্বে ছিলেন। বড় নেতা

ছিলেন এখানকার। উনি এখন ফুলবাড়ীতে জামায়াতে ইসলামীর কোনো এক পদে আছেন। ফুলবাড়ীতে থাকেন। আর একটা নাম, আবুল মৌলভি বলে ছাতনীর লোকেরা। মনে পড়ছে, আফজাল মাওলানা।

আপনার এলাকার সকল স্বাধীনতাবিরোধীকে ধরা হয়েছিল কি?

- সব ধরা হয়নি। যাদের ধরা হয়, তারাও পরে ছাড়া পাইছে। যেমন আফজাল মাওলানা ছাড়া পাইছে। তারপর সবাইকে ধরা হয় নাই। যেমন—যারা আমাদের সাহায্যকারী ছিল, আমরা তাদের বাঁচাইছি। ওরা না থাকলে এখানে কোনো গ্রামের অস্তিত্ব থাকত না।

যুদ্ধের শেষে বাড়ি ফিরে কী দেখলেন?

- গ্রামের অবস্থা অত্যন্ত নাজুক। বাড়িঘরগুলো তো ৮০-৯০ ভাগ নষ্ট হয়ে গেছে। আমি যেটা সবচেয়ে বেশি লক্ষ করেছি সেটা হলো, গ্রামের মধ্যে এমন একটা গাছ আমি পাই নাই যে গাছটায় গুলির চিহ্ন ছিল না, যে গাছের পাতা ঝরে যায়নি।

মুক্তিযুদ্ধকালের কোনো স্মরণীয় ঘটনা আপনার মনে পড়ে কি?

- হাওড়ার যুদ্ধে আমরা মুজাহিদ-আনসার ছিলাম ৫৯ জনের মতো। ইপিআরও কিছু ছিল আমাদের সঙ্গে। খানসেনারা ট্যাংক নিয়া হাওড়ায় অ্যাটাক করে। তার আগে বাঙালি ইপিআররা আমাদের সঙ্গে যোগ দেয়। ইপিআরের হাতে ছিল একটা রকেট লঞ্চার। ওই রকেট লঞ্চার দিয়ে ট্যাংক ক্ষতিগ্রস্ত করা যায়। ওই রকেট লঞ্চার ইপিআররা হাতছাড়া করে নাই। খানসেনাদের ট্যাংক যখন আমাদের কয়েক শ গজের ভিতর আসে তখন ওই রকেট লঞ্চার দিয়ে তাতে আঘাত হানা হয়। আমি তখন একই জায়গার অন্যদিকের আরেকটা ট্রেঞ্চে ছিলাম। আমাদের দলের একজন বলছিল, খানসেনারা আসার পর দেখি পড়ে আছে রকেট লঞ্চারটা। ইপিআররা সেখানে কেউ নাই। আমার এক সঙ্গী গেল ওই রকেট লঞ্চারটা আনতে। ওটা ফায়ার করতে তিনজন লাগে। কিন্তু কীভাবে করতে হয় তা সে জানত। সে একাই রকেট লঞ্চারটা থেকে পাকিস্তানি ট্যাংকে ফায়ার করে। বিকট শব্দ হয়। ফায়ারের সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানি ট্যাংকটা আটকে যায় ওখানে। পাকিস্তানিরা মনে করছে, খুব ক্লোজ থেকেই ফায়ারটা করা হয়েছে। পাকিস্তানিরা ওখানে থেমে গেল। ওই ফাঁকেই আমরা সব বাংকার থেকে উঠে আসি। আমার সেই সাথি মুক্তিযোদ্ধা বলল, আমরা এর আগেও চেষ্টা করছি ওঠার, কিন্তু এত বেশি গুলি যে আমরা মাথা ওঠাতে পারি নাই। তখন গোলাগুলি একটু কমছে। এই ফাঁকে যখনই একজন উঠে দৌড় মাইরা আরেক দিকে যেতে ধরছে, তখনই পিছন থেকে একটা ব্রাশফায়ার এসে তার পিঠে লাগছে। ব্রাশফায়ার লাগার সঙ্গে সঙ্গে তার বুকের অংশটা মনে হলো খুলে গেল, একেবারে সামনে পড়ে গেছে। বুকটাতে আর কিছু নাই। বুকটা ঝাঁঝরা হয়ে গেল। তারপর মুরগির মতো কয়েকটা চক্কর দিয়া সে স্তব্ধ হয়ে গেল। ওর নাম ওছিমুদ্দীন। সন্ধ্যার আগে আগে আমার সে বন্ধুটি আমাকে বলল, ওছিমুদ্দীন নাই, ওছিমুদ্দীন এইভাবেই মারা গেছে। সে বলল, পাশাপাশি বাংকারে ছিলাম আমরা।

আরও কয়েক দিনের ঘটনা। এপ্রিলের প্রথম দিকে যখন লোকজন রংপুর থেকে আমাদের এই অঞ্চলের দিকে আসা শুরু করে তখন আমরা ভাবলাম যে এরা এদিকে আসছে কেন? তাদের কাছেই শুনলাম যে ওখানেও যুদ্ধ শুরু হইছে। আমরা কথাটা বিশ্বাস করতাম না। এটা এপ্রিলের ফাস্ট উইকের দিকে হবে বোধ হয়। আমাদের এখানেও পরবর্তী সময়ে খানসেনারা আসলো। তারপর আমরাও ভারতে গেলাম। মুক্তিবাহিনী গঠন প্রক্রিয়া শুরু হলো। আমরা শুনলাম মুক্তিবাহিনীর জন্য ভারত অস্ত্রশস্ত্র দিতে চাচ্ছে। সেই সময় আমি এই এলাকার হয়ে ভারতের স্থানীয় সামরিক কর্তৃপক্ষের সাথে লিয়াজোঁ মেইনটেন করি। আমি মুজাহিদ ফোর্সের কমান্ডার ছিলাম। আমাদের এখানকার নেতৃবৃন্দও ভারতীয় স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে বলেছিল যে অস্ত্রশস্ত্র সম্পর্কে আমার ধারণা আছে এবং এর আন্ডারে ট্রেনিংপ্রাপ্ত অনেক লোক আছে যারা অস্ত্র ইউটিলাইজড করতে পারবে। ওখানে মাধব বাবু নামে একজন কংগ্রেসের খুব পুরোনো কর্মী ছিলেন। তাঁর বাসায় আমাদের একদিন ডেকে নিয়ে গেলেন। সেখানে বিএসএফের একজন অফিসার ছিলেন। তাঁর সঙ্গে বিস্তারিত কথা হয় যে আমরা কীভাবে অস্ত্র এবং গোলাবারুদ পেতে পারি। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে তারা অস্ত্রশস্ত্র দেয়নি। প্রথম আমাদের নিয়ে গিয়ে তারা ট্রেনিং দেওয়া শুরু করল। ট্রেনিং বিভিন্নভাবে হয়েছে। ট্রেনিংয়ের পর আমরা অস্ত্র পেয়েছিলাম। পরবর্তী সময়ে আরও অনেক আশ্বাস তারা আমাদের দিয়েছিল। ওরা প্রথম দিকে ডাইরেক্ট আমাদের হাতে অস্ত্র দেননি।

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **অমর চাঁদগুপ্ত**
নভেম্বর ২৪, ১৯৯৬

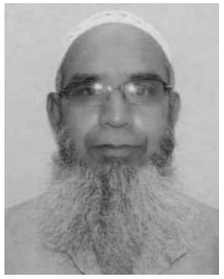

মোহাম্মদ জহুরুল ইসলাম

পিতা : মছির উদ্দীন মোল্লা, গ্রাম : রামচন্দ্রপুর, ডাক : জামগ্রাম ইউনিয়ন : কাজীহাল, থানা : ফুলবাড়ী, জেলা : দিনাজপুর, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নবম শ্রেণী, ১৯৭১ সালে বয়স ১৭ বছর, ১৯৭১ সালে ছাত্র ছিলেন, বর্তমানে অবসর জীবন যাপন করছেন।

আপনি পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর হাতে আক্রান্ত হয়েছিলেন কি?

● হ্যাঁ, আক্রান্ত হয়েছিলাম। শেখ সাহেবের ডাকে সাড়া দিয়ে দেশে যখন অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়ে গেল, তখন আমরা মুক্তিবাহিনীতে যোগদান করি। ইন্ডিয়ার পশ্চিম দিনাজপুরের পতিরাম ক্যাম্পে ভর্তি হই। ভর্তি হওয়ার পর ট্রেনিংয়ের জন্য আমাদের শিলিগুড়ি নিয়ে যায়। সেখানে ট্রেনিং হওয়ার পর ওখান থেকে আমাদের ব্যাক করে দেয় তরঙ্গপুর। সেখান থেকে অস্ত্র, গোলাবারুদ দেওয়ার পর আমাদের পাঠিয়ে দেয় বাংলাদেশে। তারপর আমরা বাংলাদেশে যুদ্ধ করি। যুদ্ধের সময় একবার প্লাটুন কমান্ডার নজরুল ভাইসহ আমাদের হিলিতে পাঠায়। সেখানে একটা গুলি আমার মাথায় লাগে। সেখান থেকে আহত অবস্থায় আমাকে ক্যাম্পে নিয়ে আসে। সেখানে চিকিৎসার পর আমি ভালো হই। তারপর আমি আবার বাংলাদেশে অপারেশন চালাই। আমাদের এলাকায় আটপুকুরহাট নামে এক জায়গায় একটা ব্রিজ আছে, সেই ব্রিজ ভেঙে দেওয়ার জন্য একবার আমাদের দলের সাত-আটজন মুক্তিযোদ্ধাসহ সেখানে যাই। ব্রিজ ভেঙে আমরা আবার চলে আসি ক্যাম্পে। তারপর আবার যুদ্ধ করার জন্য মাছুয়াপাড়া যাই। ওখানেও যুদ্ধ করি। যুদ্ধ করে আমরা ভালোভাবে ফিরে আসি। এভাবে যুদ্ধ করে যাচ্ছিলাম। ১৬ ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হলো। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর দিনাজপুরের আনন্দসাগরে মিলিশিয়া ক্যাম্প উদ্বোধন করা হয়। মিলিশিয়া ক্যাম্প উদ্বোধনের পর আমাদের বলে যে আপনারা যতগুলান মুক্তিযোদ্ধা আছেন, তাঁরা সবাই সেখানে জয়েন করেন। অস্ত্র, গোলাবারুদ জমা করেন। এখানে আমাদের ক্যাপ্টেন শাহরিয়ার ছিলেন। আমরা তাঁর কাছে সব অস্ত্র জমা দেই। জমা দেওয়ার পর আমরা ওখানে থাকলাম। দুদিন ওখানে খাওয়াদাওয়া করি। করার পর তৃতীয় দিন আমাদের নিয়ে গেল দিনাজপুর মহারাজার বাড়ি। সেখানে সৈয়দপুর, চরকাই, ডোমার, নীলফামারী এবং আরও অন্যান্য জায়গা থেকে ট্রাকযোগে গোলাবারুদ এনে জমা করা হতো। মাটির নিচে বোমা ছিল আরকি। অ্যান্টি-ট্যাংক মাইন এবং আরও অন্যান্য বোমা। সেগুলা তুলে নিয়ে এসে ওখানে আমরা বাংকারের মধ্যে রাখতাম। বাংকার থেকে কিছু দূরে ট্রাক রেখে হাতে হাতে সেই গোলাবারুদ বাংকারে রাখতাম। একদিন এক ছেলের হাত থেকে একটি মাইন ফসকে পড়ে যায়। হয়তো ওটার ডেটনেটর ফিট করা ছিল। ভুলে কেউ ওটার ডেটনেটর খুলে রাখেনি। তো ওটা বার্স্ট হয়ে যায় এবং জমা করা অন্যান্য মাইন-গোলাবারুদও বার্স্ট হয়ে যায়। বিস্ফোরণে সেখানে একটা গভীর পুকুরের মতো হয়ে যায়। বহু মুক্তিযোদ্ধা মারা যায়। আমিও আহত হই। আমাদের গ্রামের দুই-তিনটা ছেলে মারা যায়। তারপর আমাকে দিনাজপুর সদর হাসপাতালে ভর্তি করে। কাউকে সদর হাসপাতালে, কাউকে রংপুর, কাউকে ঢাকায়, কাউকে ইন্ডিয়ায়। কার কোথায় চিকিৎসা হয়েছে, আমি বলতে পারব না। আমি তো নিজেই সেই সময় আহত অবস্থায় সদর হাসপাতালে ছিলাম।

তখন কি আপনার জ্ঞান ছিল?

● জ্ঞান ছিল।

সেখানে কতজন মুক্তিযোদ্ধা মারা গেছে?

● পরে শুনেছি, সেখানে কম করে হলেও চার-পাঁচ শ মুক্তিযোদ্ধা অন স্পট মারা গেছে।

আহত কতজন হয়েছেন?

● আহত না হলেও তিন-চার শয়ের কম না।

আপনারা কতজন মুক্তিযোদ্ধা ওখানে ছিলেন?

● আমরা প্রায় আড়াই-তিন হাজার মুক্তিযোদ্ধা ওখানে ছিলাম।

আপনার গ্রামের কয়জন মুক্তিযোদ্ধা ওই বিস্ফোরণে মারা গেছেন?

● আমার গ্রামের তিনজন মুক্তিযোদ্ধা মারা গেছেন।

আপনি কেন মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেন?

● মুক্তিযুদ্ধে কেন অংশগ্রহণ করলাম? যখন দেশের এই ভয়াবহ সময়, বিরাট তাণ্ডব চলছে, শিক্ষিত সব ছেলেপেলেদের পাকিস্তানিরা মেরে ফেলছে, ক্ষমতা হস্তান্তর করে না, আমাদের দমন করতে পারলে তাদের পাকিস্তান পাকিস্তানই

থাকবে, শিক্ষিত ছেলেগুলাকে তারা মারি ফেলাচ্ছে, আমার নিজেরও দশা তাদের মতো হতে পারে, তখন মনের ক্ষোভে দেশ স্বাধীন করার জন্য মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিলাম।

আপনার এলাকায় কখন পাকিস্তানিরা আক্রমণ করল?

- এপ্রিলের প্রথম দিকেই। তারা দিনাজপুর থেকে এসে প্রথম আক্রমণ করল ফুলবাড়ী। সেখান থেকে জিপ-মোটর নিয়ে তারা আমাদের আটপুকুরহাটে ক্যাম্প করল। ক্যাম্প করে বর্ডার টহল দেয় এবং ফুলবাড়ীতে কে বা কারা মুক্তিবাহিনীতে আছে, সে সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে থাকে। খোঁজখবর নেওয়ার সময় তারা গ্রামের বাড়িঘরে আগুন জ্বেলে দিত। সাধারণ মানুষকে ধরে নির্যাতন করত। তারা যে গ্রামে যেত, সে গ্রামে আগুন লাগিয়ে দিত। লোকজন পেলে তাদের ধরে নিয়ে যেত। নিয়ে এসে বলত, 'ব্যাটা তুই মুক্তিবাহিনী।' তারপর অনেককেই গুলি করে মারিছে। আমাদের জলাপাড়া থেকে শমসের আলী মোল্লা নামে একজনকে খানসেনারা ডেকে নিয়ে তাকে গুলি করে মারছে।

আপনার পরিবারের কেউ কি শহীদ হয়েছেন?

- না। তবে আত্মীয়ের মধ্যে একজন শহীদ হয়েছেন।

আত্মীয়ের ভেতরে কে শহীদ হয়েছেন?

- আমার এক ফুফা।

তিনি কীভাবে শহীদ হলেন?

- খানসেনারা তাঁকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে বলেছে, তোমার বংশের মধ্যে কে মুক্তিযোদ্ধা আছে? তখন তিনি বলেছেন, না, কেউ নেই। তখন ওরা বলেছে, আমরা শুনেছি, আছে। তারপর ওরা তাঁকে গুলি করে মারি দিছে।

আপনার এলাকায় কখন থেকে মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা শুরু হয়?

- এখানে প্রথম থেকেই তৎপরতা শুরু হয়।

আপনার এলাকায় রাজাকার কারা ছিল?

- আমাদের ওখানে রাজাকার তো অনেকেই ছিল। নাম মনে নাই।

শান্তি কমিটিতে কারা ছিল?

- তারা রাজাকারদেরই অংশ।

এসব স্বাধীনতাবিরোধীরা এখন কোথায়?

- তারা তো বাংলাদেশেই আছে। বর্তমানেও আছে।

আলবদর, আলশামস কারা ছিল?

- আমাদের বাঙালিদের মধ্যে থেকেই অনেকে ছিল। তারা তো এখনো আছে।

এসব স্বাধীনতাবিরোধীকে ধরা হয়েছিল কি?

- মুক্তিযোদ্ধারা প্রতিশোধমূলক দু-একটারে মারি ফেলছে। বাকিরা তো সব আছে।

তার পরও তাদের ধরা হয়েছিল কি?

- আমার জানামতে হয়নি।

আপনি কত নম্বর সেক্টরে যুদ্ধ করেছেন?

- ৭ নম্বর সেক্টরে।

কোন কোন এলাকায় যুদ্ধ করেছেন?

- হিলি, ফুলবাড়ী, চেলোপাড়া, আমবাড়ী, আটপুকুরহাট।

আপনি হিলিতে যুদ্ধ করেছেন?

- আমরা হিলিতে যুদ্ধ করেছি। ওখানে এফএফ যারা ছিল, তাদের মধ্য থেকে আমাদের কর্তৃপক্ষ একবার মুক্তিযোদ্ধা বাছাই করে নিল। নিয়ে যাওয়ার পর আমাদের বলল অমুক জায়গায় খানসেনাদের ক্যাম্প আছে। খানসেনাদের ওই ক্যাম্প ধ্বংস করতে হবে। তোমরা চতুর্দিকে পজিশন নেও এবং অ্যাডভান্স করো। আমাদের পিছনে ভারতীয় বাহিনী ছিল। তারা আমাদের সাহায্য করেছে। আমাদের জন্য টু ইঞ্চ, থ্রি ইঞ্চ মর্টার গাড়ি দিয়ে পৌঁছে দিয়েছে। আমরা গোলাগুলি করে সামনে অ্যাডভান্স করেছি।

হিলিতে আপনারা কতজন মুক্তিযোদ্ধা পাকিস্তানি ক্যাম্পে অ্যাটাক করেছিলেন?

- ৪০০-৫০০ জন।

তাতে আপনারা কি পাকিস্তানি সেনাদের হটাতে পেরেছিলেন?

- না, তখন আমরা তাদের হটাতে পারিনি। আমাদের অনেকে মারাও গেছে। অনেকে ভেগেও এসেছে। অনেকে আহতও হয়েছে। সেখানে আমরা বেশ কয়েক দিন ধরে যুদ্ধ করেছি। তারপর পিছে হটে এসেছি।

আপনি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সবচেয়ে ভয়াবহ যুদ্ধ কোথায় করেছেন?

- হিলিতে।

হিলিতে আপনাদের কতজন মুক্তিযোদ্ধা মারা গেছে?

- হিসাব রাখা তো সম্ভব নয়। আমি নিজেও সেই যুদ্ধে আহত হয়েছিলাম। পরে শুনেছিলাম, আমরা চার-পাঁচ শ গিয়েছিলাম, তাদের মধ্যে ১২০ জন মারা গেছে।

সেই যুদ্ধে আপনি কীভাবে আহত হলেন?

- যুদ্ধ করতে করতে আমার গুলি শেষ হয়ে গেল। পরে আর কোনো সাপ্লাই পেলাম না। তখন ক্রল করে ভেগে আসতেছি। জমির উঁচু আইল পার হওয়ার সময় আমার মাথা একটু ওপরে উঠে গেছিল, তখন আমার মাথার এক পাশে গুলির আঘাত লাগে। আমি আহত হই।

আমবাড়ীতে আপনি কীভাবে যুদ্ধ করেছেন?

- তখন বর্ষাকাল। আমরা এখানকার খানসেনাদের মাছুয়াপাড়া ক্যাম্পে অ্যাটাক করি। তারা যখন আমাদের ওপর কাউন্টার অ্যাটাক করে, তখন

আমরা ভেগে যাই। শেষে ইন্ডিয়ান ফৌজদের সহযোগিতায় আমরা তাদের তাড়িয়ে দেই।

আপনারা কি পাকিস্তানি সেনাদের ধরতে পেরেছিলেন?

● হাতেনাতে, জীবিত অবস্থায় ধরতে পারিনি। তবে লাশ পেয়েছি।

এরকম কতটা লাশ আপনারা পেয়েছেন?

● চারটার মতো লাশ আমরা পেয়েছি।

পাকিস্তানি সেনাদের বাংকারে আপনারা কী দেখেছেন?

● দেখছি, তারা ক্যাম্প ছেড়ে ভেগে গেছে। এটা হলো মোহনপুর ব্রিজের পাশে। ওখানে তিন-চারটা মেয়ে পাওয়া গেছে। তাদের অবস্থা খুবই করুণ। তাদের বাংকার থেকে বের করে আনা হয়। ওখানে দুটো খানসেনাও পাওয়া গেছে। জীবিত অবস্থায় নয়, মৃত। মেয়েদের আমরা কাটলা ক্যাম্পে নিয়ে আসি।

আপনারা মেয়েদের কী অবস্থায় পেলেন?

● পরনে শুধু পেটিকোট, শাড়ি-কাপড় কিছু ছিল না, কাপড়চোপড় ছেঁড়া। সব যুবতী মেয়ে।

এই মেয়েদের বাড়ি কোথায় ছিল?

● ঠিক গ্রামের কথা এখন আমার মনে নাই। তারা উচিতপুর, আমবাড়ী—ওই দিককারই হবে।

সে মেয়েদের পরে আপনারা কী করলেন?

● প্রথমে ক্যাম্পে নিয়ে আসলাম। তারপর বাপ-মায়েদের ডেকে নিয়ে এসে তাদের কাছে ফেরত দেওয়া হয়েছে।

যুদ্ধের শেষে ফিরে আপনার গ্রাম এবং এলাকার কী অবস্থা দেখলেন?

● যে অবস্থা দেখেছি সে কথা কি বলে শেষ করা যাবে! কারও ঘর আছে, জিনিসপত্র কিছুই নাই। আমি মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিলাম। আমার বাড়ি সম্পূর্ণ পোড়া অবস্থায় পেয়েছি। ফিরে এসে কিছুই পাইনি। কারও হয়তো ভাই মারা গেছে, কারও বাবাকে খানসেনারা ধরে নিয়া যাইয়া মাইরে ফেলাইছে। এ রকম করুণ দৃশ্য।

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **ভবেন্দ্রনাথ বর্মণ**
অক্টোবর ২৪, ১৯৯৬

মোহাম্মদ মকবুল হোসেন

পিতা : দীন মোহাম্মদ আলী, গ্রাম : বোয়ালদা
থানা : হাকিমপুর, জেলা : দিনাজপুর
শিক্ষাগত যোগ্যতা : সপ্তম শ্রেণী, ১৯৭১ সালে বয়স ২০ বছর
১৯৭১ সাল থেকে ব্যবসা করছেন।

১৯৭১ সালে আপনি আক্রান্ত হয়েছিলেন কি?

● হয়েছিলাম। আমাকে ছাত্র হিসাবে ধরা হয়েছিল। ধরার পর আমার ওপর নির্যাতন করা হইছিল। পরে আমাকে ছেড়ে দেয়। এরপর আমি পালিয়ে ভারতে চলে যাই। আমার বন্ধুবান্ধব সব আমার ক্লাস ফ্রেন্ড ছিলেন। তাঁরা আমার চেয়ে পড়াশোনা বেশি জানতেন। তাঁদের সঙ্গে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করি।

আপনি কেন মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেন?

● পাকিস্তানিদের নির্যাতন এবং তাদের অমানুষিক ব্যবহারের জন্য আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করি।

আপনার এলাকায় কখন থেকে পাকিস্তানিরা আক্রমণ করল?

● এটা তো ছাব্বিশে মার্চ থেকে।

কীভাবে তারা আক্রমণ করল?

● ওরা প্রথমে আইসা গ্রামে ঢুকল। গ্রামে ঢুকে প্রথমে তারা আগুন লাগিয়ে দিতে শুরু করল। খড়ের বাড়ি বেশি ছিল পল্লি এলাকায়। চালে মারলে আগুন ধরে যেত। আর ওদের দেখে মা-বোনেরা গরু, বাছুর, ছাগল, ভেড়া নিয়ে পালাতে আরম্ভ করল। মানুষজন যে যেদিকে যেতে পারে সেদিকে চলে গেল গ্রাম ছেড়ে।

পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী আপনার এলাকায় আর কী কী করল?

● অনেক কিছু করছে। সবচেয়ে বড় উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে আগুন লাগিয়ে

দেওয়া, লুট করা, নারী-নির্যাতন করা—ম্যালা কিছু তারা করছে।

আপনার পরিবারের কেউ শহীদ হয়েছেন কি?

- আমার পরিবারে শহীদ হয়েছেন আমার শ্রদ্ধেয় বড় ভাই গোলাম মোস্তফা। তাঁর পরিবার তিন বছর ধরে সরকারি ভাতা পাচ্ছে। একই সঙ্গে আমরা যুদ্ধ করেছিলাম। তিনি শহীদ হয়েছেন।

কীভাবে শহীদ হয়েছেন?

- যুদ্ধ করতে গিয়ে শহীদ হয়েছেন। উনি আমার সঙ্গে ছিলেন। সেটা ডাঙ্গাপাড়ার পাশে শহীদ হয়েছেন। আমিও আহত হয়েছি। উনি তখন আমার সঙ্গে ছিলেন না। আমার সঙ্গে আরও অনেকে ছিলেন। এখনো তাঁরা বেঁচে আছেন। আমি আহত হয়েছি মোহনপুর ব্রিজে। ওখানে তার কাটতে গিয়েই আমার পায়ে গুলি লাগছিল।

আপনার এলাকায় কখন থেকে মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা শুরু হয়?

- আমার এলাকায় মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা শুরু হয় একাত্তরে আমরা যখন ভর্তি হইলাম। সম্ভবত মে মাসে। আমরা প্রথমে ভর্তি হই কামারপাড়া ফার্স্ট ব্যাচ, ৭ নম্বর সেক্টরে। কামারপাড়া ভর্তি হওয়ার পর প্রথমে আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো রায়গঞ্জে। সেখানে ১২-১৪ দিন ট্রেনিং করার পর শুধু ব্রিজ ভাঙার জন্য আমাদের আবার নিয়ে যাওয়া হলো আমার এলাকা হাকিমপুর থানায়। আমাদের দিল এক্সপ্লোসিভসহ অন্যান্য জিনিস। আমরা ব্রিজ ভাঙার কাজ সম্পন্ন করার পর কমান্ডারের কাছে গিয়ে রিপোর্ট দেই। পরে এলাকাভিত্তিক যুদ্ধের জন্য আমাদের পাঠানো হলো হাকিমপুর থানায়। সেখানে আমরা ছিলাম কামারপাড়ায়। হাকিমপুরে আমরা বহু জায়গায় যুদ্ধ করেছি—ফুলবাড়ী, মোহনপুর ব্রিজ, দিনাজপুর নিউ টাউন, পার্বতীপুর। আমার সঙ্গে যাঁরা অংশ নিয়েছিলেন তাঁরা আমার চেয়ে বেশি শিক্ষিত ছিলেন। যেমন ফুলবাড়ীর মনসুর ভাই, পার্বতীপুরের বুলবুল আহমেদ, চিরিরবন্দরের শফিকুল ইসলাম। আমার দলের কমান্ডার হিসাবে তাঁরা কাজ করেছেন।

আপনার এলাকায় বা গ্রামে রাজাকার বা আলবদর বা আলশামস বা স্বাধীনতাবিরোধী কারা ছিল?

- আমার জানামতে, যারা তৎকালীন পাকিস্তান আমলে মুসলিম লীগ করত, তারাই স্বাধীনতাবিরোধী কাজ করেছে।

তারা এখন কোথায়?

- তারা অনেকে নিহত হয়েছে। হয়তো বয়োজ্যেষ্ঠ দু-একজন বেঁচে আছে। আর যারা ইয়াংম্যান ছিল, তারা তো রাজাকারই ছিল। তারাও অনেকে বেঁচে আছে, অনেকে মারাও গিয়েছে।

যুদ্ধের শেষে এসব স্বাধীনতাবিরোধীকে ধরা হয়েছিল কি না?

- সরকার তাদের সাধারণ ক্ষমা প্রদান করেছিল। সে জন্য তাদের আমরা কিছু বলি নাই। তা ছাড়া এলাকার লোকজন কারও না কারও বাপ, চাচা, দাদা, ভাই লাগে—যার জন্য তাদের আমরা ক্ষমা করে দিয়েছি।

আপনি কোন কোন এলাকায় যুদ্ধ করেছেন? যুদ্ধ চলাকালীন দু-একটি স্মরণীয় ঘটনার কথা বলুন।

- আমি যুদ্ধ করেছি হিলিতে মওড়াপাড়া এলাকায়। হিলি-বাসুদেবপুর ক্যাম্প। আমি যুদ্ধ করেছি দিনাজপুর নিউ টাউন; নবাবগঞ্জ শালবাগান, চরারহাট—যে চরারহাটে আমারই পার্টির অনেক লোক নিহত হয়। সেখানে আমি লিডার হিসাবে আমার দলের নেতৃত্ব দিয়েছিলাম। ১৩ জন ছেলে নিয়ে ছিল সেই দল। সেখান থেকে আমি পালিয়ে গিয়েছিলাম নিজের জীবন বাঁচাতে। পরদিন সেখানে কমপক্ষে ২০০ জন লোককে পাকিস্তানিরা নির্মমভাবে হত্যা করে। এটা আমার জীবনের স্মরণীয় ঘটনা।

  আরেকটা ঘটনা। যিনি আমার শ্রদ্ধেয় কমান্ডার ছিলেন, তিনি তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসে আমাদের সঙ্গে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। উনার বাড়ি ছিল কুমিল্লা। উনি হাবিলদার মেজর ছিলেন। তাঁর নাম ছিল শাহজাহান। উনি শহীদ হন আমার সামনে। এখানে আমি এক ঘটনা ঘটাইয়া অনেক পুরস্কারও পেয়েছি। পার্বতীপুরের মোতালেব আর আমি এক খানসেনাকে ধরে নিয়ে এসেছিলাম ভারতে। তিনি একজন মেজর ছিলেন। তাঁর নাম ছিল আমির খান। তাঁর ডান হাতে গুলি লেগেছিল। এ জন্য আমাকে ছুটি দেওয়া হয়েছিল, মুরগি খাওয়ানো হয়েছিল। সেখানে এটাই আমার সবচেয়ে বড় স্মরণীয় ঘটনা। ভারতে তাঁর অনেক সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছিল। আমি ধরে নিয়া আসায় উনি বেঁচে গিয়েছিলেন। তাঁর হাত কেটে ফেলা হইছিল। পরে উনি রায়গঞ্জ হাসপাতালে ছিলেন। আমি সেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছি। উনি আমাকে অনেক শ্রদ্ধা করতেন। তখন আমি কিছু কিছু উর্দু বলতে পারতাম। উনিও উর্দুতে কথা বলতেন। সত্য কথা বলার জন্য উনাকে আমি অনেক শ্রদ্ধা করতাম, যদিও উনি পাকিস্তানি সেনা। এটা একটা বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা।

যুদ্ধের শেষে গ্রামে ফিরে আপনার এলাকার অবস্থা কেমন দেখলেন?

- যুদ্ধের শেষে গ্রামে ফিরে দেখি যে অনেক বাড়িঘর বিধ্বস্ত হয়েছে। অনেক চেনা লোক হারিয়ে গেছে। তাদের আমি পাইনি। উপরন্তু আমার নিজের বাসস্থানকে ধ্বংস করে দেওয়া হইছে। জানালা-কপাটের গরিবি হাল, আমার বাড়িটি ছিল মাটির। সব বিধ্বস্ত করে দেওয়া হইছে। আবার নতুন করে সব করতে হইছে।

আপনার এলাকার স্কুল, কলেজ, মসজিদ, মাদ্রাসা, মন্দির এবং ব্রিজ, রাস্তাঘাটের অবস্থা কেমন ছিল?

- স্কুল, কলেজ আমার এলাকায় মোটামুটি ভালো ছিল। ব্রিজ ছিল না। যোগাযোগ সর্বত্র বিচ্ছিন্ন ছিল। আমরা দলের সহকর্মীদের নিয়ে ব্রিজ ধ্বংস করেছিলাম। মসজিদ বা মন্দির বা স্কুল—এগুলো মোটামুটি ঠিক ছিল। মসজিদ বা স্কুলে—বোয়ালদা হাইস্কুলে—খানসেনাদের ক্যাম্প ছিল। সেই ক্যাম্পও আমি দুই-একবার আক্রমণ করেছি। যা-ই হোক, আমি বেঁচে গেছি আল্লার রহমতে।

আপনি হিলিতে যুদ্ধ করেছেন?

- হিলিতে আমি যুদ্ধ করেছি। নওয়াপাড়াতে সবচেয়ে বড় যুদ্ধ হয়। শুধু আমি নই, আরও কয়েকটা ছেলের কথা বলেছি। হয়তো আপনিও চিনবেন। বিরামপুরের কাসেম নামে এক ডাক্তার ছিলেন। তাঁর এক ছেলে ছিল বাচ্চু। এখনো সে আর্মিতে আছে। আমার সমবয়সী। আমার ক্লাসফ্রেন্ড; সে বোয়ালদা স্কুলে আমার সঙ্গে পড়ত। হিলির দুই-একজন ছিল। কিছুদিন আগে একজন মারা গেছেন আর একজন বেঁচে আছেন। আর বোয়ালদা গ্রামে আমরা প্রায় ১১ জন ছিলাম। বাইরের বলতে পার্বতীপুরের একজন ছিল। চরগাঁয়ের একজন ছিল। এই যুদ্ধ প্রায় তিন দিনের মতো চলে। অনেক ভাই শহীদ হয়েছেন। অনেক ইন্ডিয়ান আর্মি শহীদ হয়েছেন, অনেক খানসেনাও নিহত হয়েছে। তবু আমরা তাদের উৎখাত করেছি ওখান থেকে।

হিলিতে আপনাদের মুক্তিবাহিনীর কতজন সদস্য প্রাণ হারিয়েছিল?

- জানামতে, যুদ্ধ চলাকালে ছয়জন মারা গেছে। আর এমনি যাঁরা মারা গেছেন তাঁরা তো গেছেন খানসেনাদের গুলিতে। যুদ্ধকালীন যাঁরা মারা গেছেন তাঁদের কথা তো বলেছিই। ইন্ডিয়ান আর্মি যাঁরা সঙ্গে ছিলেন তাঁরাও তো মারা গেছেন। অত পরিসংখ্যান দেওয়া সম্ভব হবে না। আপনি ধরতে পারেন যে কমসে কম এই যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন শ দুয়েক।

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **ভবেন্দ্রনাথ বর্মণ**
অক্টোবর ১১, ১৯৯৬

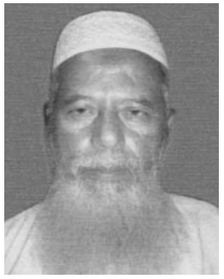

মোহাম্মদ মজিবর রহমান

পিতা : তফা শেখ, গ্রাম : সজলপুকুর, ডাকঘর থানা ও পৌরসভা : ফুলবাড়ী, জেলা : দিনাজপুর, শিক্ষাগত যোগ্যতা : অষ্টম শ্রেণী
১৯৭১ সালে বয়স ২১ বছর, ১৯৭১ সালে মুজাহিদ বাহিনীর সদস্য ছিলেন
বর্তমানে চাকরি করেন।

১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে আপনি কি আক্রান্ত হয়েছিলেন?

- হ্যাঁ, হইছিলাম। যুদ্ধের সময় রাজশাহীর শিবগঞ্জ কলেজের ওখানে। আমাদের প্ল্যান ছিল খানসেনাদের শিবগঞ্জ কলেজের ক্যাম্প যেভাবে হোক আমরা ধ্বংস করে দেব এবং পাকিস্তানি সেনাদের ওখান থেকে আমরা হটাব, না হয় নিজেরা মরব। আমরা সেখানে একসঙ্গে প্রায় ৫০০ মুক্তিযোদ্ধা গিয়া অ্যাটাক করছিলাম। কিন্তু পাকিস্তানি সৈন্যদের কাউন্টার অ্যাটাকে আমরা অনেক হতাহত হইছিলাম। তারা খুব সুরক্ষিত অবস্থানে ছিল। ফলে আমরা খুব মার খেলাম। কেউ মারা গেলাম। কেউ গুলি খেলাম। আমি নিজেও তাদের গুলিতে আহত হইছি।

আপনি কেন মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেন?

- খানসেনাদের জন্য আমাদের দেশ বিরান হয়ে যাচ্ছে। খানসেনারা যাকে তাকে মারতেছে। ভাইকে মারতেছে, বোনকে মারতেছে, বাবাকে মারতেছে, শিশুকে মারতেছে, মা-বোনের ইজ্জত লুটতেছে। আমরা এই দেশকে, বাংলার মাটিকে ভালোবাসি। এই জন্য মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করছি।

আপনার এলাকায় পাকিস্তানি সৈন্যরা কখন আক্রমণ করে?

- তারিখটার কথা আমার সঠিক খেয়াল হচ্ছে না। দিনটা শুক্রবার ছিল। রাত ১০টার দিকে যে তারা আমাদের এখানে আক্রমণ করেছিল, এটা আমার মনে

আছে। হঠাৎ ওই দিন রাতে আইসা ফুলবাড়ী টাউনের চারদিকে তারা ফায়ার শুরু করল। তখন আমরা দৌড়াদৌড়ি করে এদিক-সেদিক চলে গেলাম। অনেক লোক গ্রামে-গঞ্জে চলে গেল। সম্ভবত খানসেনারা রাতে দিক ভুল করে শহরের বাইরে শেলটার নিল। ফুলবাড়ী হাসপাতালের সামনে মুচিপাড়া ছিল, সেই মুচিপাড়ার মুচিদের ধরে রেখে খানসেনারা তাদের ঘরের বেড়ার ফাঁকে ফাঁকে এলএমজি ফিট করে রাখছিল। রাতে তাদের আর কোনো সাড়াশব্দও ছিল না। তারা যে মুচিপাড়ায় আছে এ খবর আমরা কেউই জানতাম না। মুচিপাড়ার কাউকেই তারা ওই রাতে বের হতে দেয় নাই। পরের দিন অনেকে বলল, ওরা চলে গেছে। কেউ বলল আমবাড়ী গেছে, কেউ বলল অন্য জায়গায় গেছে। যা-ই হোক, মকবুল ড্রাইভার, আমি, আলী হোসেন সাহেব, আরও অনেকে কয়েকটা গাড়িতে উঠে আমরা রওনা করলাম নিমতলার মোড় থেকে। লক্ষ্য, পাকিস্তানিদের প্রতিরোধ করা। আমরা ফুলবাড়ী হাসপাতালের গেটে মাত্র গেছি আর তখনই মুচিপাড়ার ভিতর থেকে আমাদের ওপর ব্যাপক ফায়ার শুরু হয়। গুলিতে ওখানেই সঙ্গে সঙ্গে মকবুল ড্রাইভার মারা গেল। আরও কয়েকজন মারা যায়। কয়েকজন আহত হয়। আর আমরা কয়েকজন কোনোরকমে গাড়ি থেকে নিচে ঝাঁপ দেই। আমাদের বুঝতে অসুবিধা হলো না পাকিস্তানি সেনাদের উপস্থিতি। আমি ঝাঁপ দিয়ে পড়ে ক্রল করে নদীর কাছে যাই। আমার কাছে তখন কোনো অস্ত্র ছিল না। মাথার ওপর দিয়া গুলি যাচ্ছে। আমাদের দলের লোকেরাই আমার মাথার ওপর দিয়া গুলি করতেছে। আমি হাত দিয়া তাদের অনেক ইশারা দিলাম। তারা কেউ টের পেল না। তখন যাইয়া নদীতে ঝাঁপ দিয়া তবে আমি বাঁচি। সকাল থেকে বিকাল চারটা পর্যন্ত ওখানে লড়াই চলে। এই পারে ছিল ইপিআর, পুলিশ আর মুজাহিদ বাহিনীর লোক। অন্যদিকে খানসেনারা। প্রচণ্ড গুলি চলতেছে। মনে হলো, আমার জীবন বুঝি আর বাঁচে না। তখন আমি আবার সেখান থেকে ক্রল করে এক হিন্দু ভদ্রলোকের বাড়িতে ঢুকি। তার বাড়িতে দেখি একটা পাতকুয়া। জীবন বাঁচানোর জন্য ওই পাতকুয়ার মধ্যে আমি নামি। কিছুক্ষণ পর গোলাগুলিটা থেমে গেল। পরে আমি পাতকুয়ার মধ্যে থেকে বাইর হইলাম। দক্ষিণ দিকে কাঠের ঘর দেখলাম। সেই ঘরের পাশ দিয়ে হাসপাতালের ওইখানে আসে দেখি যে খানসেনাদের গোলাগুলি নাই। আমাদের মকবুল ড্রাইভারসহ আরও কয়েকজন মারা গেছে। আর ওরা পলাইয়া গেছে। কয়েকজন খানসেনা পালাইতে পারে নাই। ওদের কাছে অস্ত্র-গোলাবারুদ তখন ছিল না। তখন সবাই মিলে গিয়া আমরা খানসেনা চারজনকে ধরলাম। ধরে মারপিট করে তাদের নিয়ে যাওয়া

হলো থানায়। খানসেনারা প্রথম দিকে কিন্তু আমাদের এখানে টিকতে পারে নাই।

পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী আপনার এলাকায় পরে এসে আর কী করল?

- খানসেনারা পরে আইসা আমাদের এলাকায় ক্যাম্প করছিল। তারা আমাদের এলাকায় বাড়ি পুড়ে দিল, মাল লুট করল। মানুষ খুন করল। যা কিছু পাইল লুটতরাজ করে নিয়ে চলে গেল।

মুক্তিযুদ্ধের সময় আপনার পরিবারের কেউ শহীদ হয়েছেন কি?

- আমার খালু শহীদ হয়ে হয়েছেন। আমার ঘরের মধ্যে তিনি লুকিয়েছিলেন। সেখানে তাকে খানসেনারা গুলি করে মারছে।

আপনার এলাকায় কখন থেকে মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা শুরু হয়?

- আমার এলাকায় যে দিন প্রথম খানসেনারা ঢুকল তার পরদিন থেকেই তৎপরতা শুরু হইছে। সবাই বলছেন যে আমাদের মুক্তিযোদ্ধা হতে হবে, লড়াই করতে হবে। খানসেনাদের বিরুদ্ধে লড়াই না করলে আমাদের এ দেশ মুক্ত করতে পারব না, বাঁচতেও পারব না।

আপনার গ্রাম বা এলাকায় রাজাকার কারা ছিল?

- বিহারিরা রাজাকার বেশি ছিল। আমাদের দেশে যারা মুসলিম লীগ করত, তাদের মধ্য থেকে রাজাকার, আলবদর, আলশামস বেশি হয়েছে। সাধারণ লোকদের মধ্য থেকে অনেককে জবরদস্তি করে তারা রাজাকার বানাইছিল। যাদের জবরদস্তি করে রাজাকার বানাইছিল তারা যাওয়ার আগে অনেকে আমাদের জিগ্যেস করত যে, ভাই আমরা কি যাব? আমরা বলতাম, গেলে বোধ হয় ভালো হয়। ওদের সাথে থাইকা আমাদের হেল্প করবেন আপনারা। আমাদের কথামতো তারা রাজাকারে জয়েন করেছে। তারা জয়েন করে কখন কী হয় সে সম্পর্কে আমাদের সংবাদ দিত। আর সেই সংবাদ নিয়ে আমরা তাদের পিছনে রাতে ধাওয়া করতাম।

আপনার এলাকায় শান্তি কমিটিতে কারা ছিল?

- আমার এলাকায় শান্তি কমিটিতে মাহমুদ মিয়া, পৌরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান নুরু ছিল। নুরু মিয়ার ভাগিনা সামসুল ছিল। সে আমাদের কয়েকজন মুক্তিফৌজকে ধরে খুব অত্যাচার করিছে। রেল ঘুন্টির ওখানে তেঁতুলতলায় কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধার গায়ের চামড়া কেটে লবণ এবং ঝাল লাগাইছে। পাছার মধ্যে পর্যন্ত ঝাল দিছে। তারা বলছে, বল বেটা, কোথায় মুক্তিফৌজ আছে? কে মুক্তিফৌজ? মাহমুদ মিয়া চেয়ারম্যান এবং পৌরসভার এক্স চেয়ারম্যান নুরু মিয়া মারা গেছে। সামসুলও মারা গেছে।

সকল স্বাধীনতাবিরোধীকে ধরা হয়েছিল কি?

- হ্যাঁ, ধরা হয়েছিল। তাদেরকে সরকার ক্ষমা করার পর তারা ছাড়া পাইয়া বাড়ি আসছে।

যুদ্ধের শেষে গ্রামে ফিরে আপনার এলাকার অবস্থা কী দেখলেন?

- যুদ্ধের শেষে গ্রামে ফিরে দেখি কারও বাড়ি নাই, কারও মা নাই, কারও বাবা নাই, কারও ভাই নাই—খালি এই এক কথা শুনি। আর চারদিকে কান্নার রোল।

আপনি কোথায় ট্রেনিং নিলেন?

- আমি তো মুজাহিদ ছিলাম। আওয়ামী লীগ নেতা কাইয়ুম ডাক্তার সাহেব আমাকে, নজমুলকে, মঞ্জুকে এবং সামাদকে মেজর নজমুল সাহেবের কাছে নিয়ে গেলেন। তখন আমরা মেজর নজমুল সাহেবকে বললাম যে, স্যার, আমাদের ট্রেনিং নেওয়া আছে, আমরা মুজাহিদ। আমাদের কাছে মুজাহিদের আইডেনটিটি কার্ড ছিল। ওটা সেক্টর কমান্ডার নজমুল হক সাহেবকে দেখানোর পর বললেন যে, তোমরা মুজাহিদ ছিলে? আমরা বললাম, হ্যাঁ স্যার। তখন উনি বললেন, তোমাদের ট্রেনিং নিতে হবে না। ১৯৬৫ সালের যুদ্ধেও আমরা অংশগ্রহণ করছি, সেটাও বলছি। এই কথা শুনে উনি খুব খুশি হইলেন। একপর্যায়ে বললেন, বলুন তো একটা ব্রিজ উড়াইয়া দিতে হয় কেমন করে? আমাদের এক্সপ্লোসিভ ট্রেনিংও নেওয়া ছিল। তখন আমরা সবাই মিলে দেখিয়ে দিলাম যে কীভাবে একটা ব্রিজ উড়াই দিতে হয়। তো উনি খুব খুশি হইয়া বললেন যে, ঠিক আছে, আপনারা আজকেই একটা কাজ নেন। আমরা বললাম, কী কাজ স্যার? উনি বললেন, বাংলাদেশের ভিতরে একটা ব্রিজ আপনাদের উড়াই দিতে হবে এবং তাহলেই বুঝব যে আপনারা ঠিক ট্রেনিংপ্রাপ্ত। তখন একটা ব্রিজ উড়াতে যা যা লাগে সব উনি দিলেন। আর আমাদের সবাইকে একটা করে স্টেনগান আর ১০০ রাউন্ড করে গুলি দিলেন। আমরা সব নিয়া বাংলাদেশের ভিতরে চলে আসলাম। সন্ধ্যার দিকে রওনা দিছি। ওইখান থাইকা আসলাম খয়েরবাড়ি নদীর ঘাটে। এটা ফুলবাড়ী থানার মধ্যে। ঘাট পার হইয়া গেলাম মতিপুর। মতিপুর গ্রামে ইয়াসিন আর স্বপন ছিল। তারা যে বাড়িতে থাকত আমরাও সে বাড়িতে উঠলাম। ইয়াসিন ছিল আমাদের গ্রামেরই লোক। ওখানে যাইয়া উঠছে। এ খবর আমরা আগে থেকেই জানতাম। আমাদের নিজস্ব একটা লোক পাইলাম। ওদের বললাম, আপনাদের এইখানে আমরা থাকব। আজকে একটু আমাদের জায়গা দেন। ওনারা আমাদের কথা শুনে একেবারে কান্না কান্না ভাব করতে লাগলেন। অবশ্য আমাদের জায়গা দিলেন। তারা ওই রাতে আমাদের খাওয়াইলেন-

দাওয়াইলেন। এদিকে বড়াইপাড়ার দরেজ মণ্ডল ছিল খানসেনাদের দালাল। সে আমাদের কথা কীভাবে যেন জানতে পেরে খানসেনাদের কাছে খবর দিছে। খানসেনারা কোনো এক ক্যাম্প থেকে আইসা সেখানে গাড়ি থেকে নামে। আমরা খবর পাইয়া মুহূর্তে ওই বাড়ি থাইকা বাহির হইয়া দৌড় দিয়া গেছি। সেখানে একটা খাল ছিল, সেই খালে ঝাঁপ দিছি। খালে কচুরিপানার মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে লুকিয়ে থাকলাম। খালটার দুদিকেই বনজঙ্গল ছিল। সে যে কী কষ্ট আমাদের তা বলার না! তারপর খানসেনারা আসি তো ঘুরি ঘুরি দেখি গেল। আমাদের পাইল না। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। খানসেনারা চলে যাওয়ার পর আমরা খাল থেকে উঠে এসে মালামাল নিয়ে রেললাইন পার হয়ে আসলাম। খাল পার হয়ে এক গ্রামে ঢুকে মোহনপুরের ওখানে যে একটা ব্রিজ আছে, সেটা উড়িয়ে দেওয়ার জন্য প্ল্যান তৈরি করা হলো। ব্রিজের ওখানে গিয়ে দেখি যে ব্রিজে রাজাকাররা পাহারা দিচ্ছে। আমরা মালামাল লুকিয়ে রেখে সঙ্গের কয়েকজনকে বললাম, তোরা গিয়ে ওদের সাথে গল্প কর, আমরা পরে গিয়ে তাদের সারেন্ডার করাব। রাজাকারদের ওই দলের মধ্যে আমাদের পরিচিত তিনজন ছিল। তারা আমাদের কথামতোই রাজাকারে গেছিল। আমাদের সঙ্গে কয়েকজন স্থানীয় সাহায্যকারীও ছিল। তাদের ধরার জন্য আমরা এই কৌশল নিলাম।

আমাদের দলের কয়েকজন গিয়ে কিছু বুঝে ওঠার আগেই অস্ত্র ধরে রাজাকারদের সারেন্ডার করাল। আমরা কাজ ভাগ করে নিছিলাম। কেউ রাজাকারদের বানতেছি, কেউ পাহারা দিছি। আবার কেউ ব্রিজে এক্সপ্লোসিভ ফিট করতেছি। আমি আর সামাদ দায়িত্ব নিলাম ব্রিজের গার্ডারে এক্সপ্লোসিভ ফিট করার। আর আইয়ুব নামের এক ছেলে ছিল ময়মনসিংহের, তাকে বললাম, তোরা রাজাকারদের নিয়ে আগে চলে যাবি। আমি, সামাদ এবং মঞ্জু, আমরা এক্সপ্লোসিভ ফিট করব। আর মঈনরে বললাম, তুই দক্ষিণ দিকে এলএমজি নিয়ে পাহারায় থাকবি। একজনকে বললাম, তার নামটা এখন মনে নাই, তুই উত্তর দিকে থাকবি। আর আমরা খুব জলদি কাজটা করলাম। কাজটা করার পর তার বিছাইলাম। তারপর তারে আগুন লাগায়া দিয়া আমরা দৌড় দিলাম। দৌড় দিয়া কোয়ার্টার মাইল দূরে চলে গেলাম। কিন্তু এক্সপ্লোসিভ আর বার্স্ট হয় না। আমি সামাদকে বললাম, এটা কী হলো? এটা কী করলি তুই? তুই কি তারটায় আগুন লাগিয়ে পানিতে ফেলছিস। আগুন লাগলে বার্স্ট হবে না কেন? তখন সামাদ জেদ করে আমারে নিয়ে আবার সেখানে চলল। আমরা মাত্র ১০০ গজ কি তার বেশি গেছি তখন ব্রিজটার ওখানে বিকট একরকম সাউন্ড হলো এবং

চারদিকে আলো ঝলমল হইয়া গেল। আমাদের চোখ দুইটা যেন আর কাজ করে না। মাইন বার্স্ট হইয়া গেল। তারপর তো ওখান থেকে ফির আমরা উল্টা দৌড় দিলাম। আমি তো বড়াইপাড়ায় ঢুকলাম। রাত তখন প্রায় চারটা। তারপর আমরা সবাই একত্র হলাম। যারা রাজাকারদের ধরে নিয়া গেছিল তারা অন্য জায়গায় ছিল। বিভিন্ন দিক থেকে আমরা তাদের কাছে গেলাম। গিয়া শুনলাম, রাজাকারদের মধ্যে যে তিনজন বিহারি রাজাকার ছিল। সেই তিনজন বিহারি রাজাকার পলাইতেছিল। যে মুক্তিযোদ্ধারা ওদের পাহারা দিচ্ছিল, তারা দিছে ওদের গুলি করে। গুলিতে তিন বিহারি রাজাকারই মারা গেছে। ওরা ওদের লাশ নদীতে ফালাই দিছে। তারপর বাকি রাজাকারদের নিয়া আমরা সবাই মিলি বর্ডার পার হইয়া ইন্ডিয়া চলি গেলাম। আমাদের সাহায্যকারী হিসাবে হাকিমের ছেলে মুজিবর এবং আরও কয়েকজন ছেলে ছিল। ওদের নিয়া ইন্ডিয়ান কমান্ডার কে সি বাটের কাছে হাজির হলাম। তাঁকে বললাম, স্যার, এরা সাহায্য করছে, এদের নিয়া আসছি। ইন্ডিয়ান কমান্ডার এদের শাবাশ দিলেন।

তারপর কোথায় যুদ্ধ করলেন?

- ফুলবাড়ী-দিনাজপুর রোডের মোহনপুরে ব্রিজ উড়াইলাম প্রথমবার। ব্রিজ উড়াইয়া ওখান থেইকা তো চলে আসলাম। তারপর আমরা আসলাম ভোজ্জপুরীতে। এটা দিনাজপুরের কোতোয়ালি থানায়। ওখানে খানসেনারা ছিল। হেভি ডিফেন্স। আমাদের সঙ্গে বিএসএফের এক কর্নেল সাহেব ছিলেন। উনি আমাদের সঙ্গে নিয়ে প্ল্যান করলেন যে খানেদের ভোজ্জপুরীর ডিফেন্সটা যেভাবেই হোক উঠিয়ে দিতে হবে। আমরা ওখানে গেলাম কয়েক শ মুক্তিযোদ্ধা। বেশ সংখ্যায় বিএসএফও ছিল। ট্রেঞ্চ তৈরি করে আমরা ভোর চারটায় তাদের ওপর অ্যাটাক করলাম। এই ব্যাপক লড়াইয়ে আমাদের পক্ষের না হলেও শতাধিক মুক্তিফৌজ আর বিএসএফ হতাহত হলো। কারও পা চলে গেল, কারও হাত চলে গেল। আমাদের সঙ্গে অনেকক্ষণ যুদ্ধ চলার পর খানসেনারা সন্ধ্যার আগ দিয়া পালিয়ে গেল। আমরা এরপর তাদের ডিফেন্সে ঢুকলাম। ঢুকে দেখি, একটা বড় মোটর ভ্যানে তাদের ওয়্যারলেস, রাইফেল, এলএমজি, এসএমজি গান, টু ইঞ্চ মর্টারের গোলা ইত্যাদি পড়ে রয়েছে। তারা সব রেখে ভাগছে।

ভোর হয় হয়, এমন সময় দেখি যে একদল লোক পালিয়ে যাচ্ছে উত্তর দিকের রোড দিয়া। দিনাজপুর ফুলবাড়ীর যে রোডটা আছে ওই দিকে তারা ভাগতেছে। আমাদের বিএসএফের কাছে ছিল হেভি গান। তখন আমি তাদের একজনকে বললাম, ওস্তাদ, ওই দেখেন, ওরা চলে যাচ্ছে। এগুলো

খানসেনা মনে হয়। বিএসএফও নিশ্চিত হলো যে ওরা খানসেনা। তখন তারা ঝট করে গান সেট করে ফায়ার দিয়ে চলল। মুহূর্তে কয়েকজন খানসেনা পড়ে গেল। আমরাও ফায়ার করতে থাকলাম। তখন পাকিস্তানি সৈন্যরা আবার তাদের মোহনপুর ডিফেন্স থেকে আমাদের ওপর আর্টিলারি ফায়ার শুরু করল। তারপর তারা শালবন থেকেও মারা শুরু করল। পাকিস্তানিদের প্রবল গোলাবর্ষণে বেলা ১২টা পর্যন্ত ওখান থেকে আমরা আর বের হতে পারি নাই। হেভি আর্টিলারি ফায়ার। এদিকে আমাদের সাপোর্ট করার জন্য ভারতের ট্যাংক আসলো। আবার একই সময় ভারতীয় আর্মির আর্টিলারি মোহনপুর আর শালবনের দিকে ব্যাপকভাবে গোলা মারতে লাগল। এর পরই খানসেনাদের ফায়ার বন্ধ হলো। পরের দিন গিয়ে দেখি যে আগের দিন ভোরে আমরা যে গোলা মারছিলাম, তাতে ১১ জন খানসেনা শেষ। তারপর আমরা সব দখলটখল করলাম।

এরপর প্রোগ্রাম হলো খানসেনাদের খানপুর ক্যাম্প আক্রমণ করার। আমাদের অফিসাররা যুদ্ধের প্ল্যান করলেন। এর তিন দিন পর আমরা সবাই মিলে ওখানে গেলাম। আমরা গিয়া দেখি যে আমাদের যাওয়ার আগেই খানসেনারা খানপুর ক্যাম্প থেকে সরে গেছে। আমাদের কমান্ডার তখন বললেন যে ওরা যখন সরে গেছে তো আর কী করা। আমরা বাইর দিক দিয়া এখানেই ডিফেন্স নিয়া থাকি। তারপর আমরা ছোট ছোট পার্টি হলাম। মফিজ সাহেবের ছেলে মন্টু, সম্ভবত বর্তমানে পুলিশের এসপি, সে ছিল, আমি ছিলাম, মঞ্জু ছিল, সামাদ ছিল। আরও অনেকে ছিল। ভারতীয় এবং বাংলাদেশ আর্মিরও কয়েকজন ছিল। আমরা তিনটা দল হলাম। তিনটা দলই পাকিস্তানিদের প্রলুব্ধ করার জন্য ফায়ার দিলাম। ফায়ার দেওয়ার পর ওরা আমাদের পাতা ফাঁদের মধ্যে ঢুকল। খানসেনারা আমাদের ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়ে গেল। আমি ছিলাম ঠিক রাস্তার দক্ষিণ দিক মুখ করে এলএমজি নিয়া। খানসেনারা যদি আসে তো এই রাস্তা দিয়েই যাবে। আমি আমার ডিফেন্সে বইসা দেখতেছি ওরা আসতেছে কি না। ওরা ঠিকই আসলো এবং গোলাগুলিতে পড়ে ওই রাস্তা দিয়াই ভাগার চেষ্টা করে। যখন ওরা আমার রেঞ্জের মধ্যে আইছে, তখন আমি এলএমজির ফায়ার দিই। ফায়ারের সঙ্গে সঙ্গে একজন খানসেনা পড়ে যায়। আরেক খানসেনার পা উড়ে যায়। ওদের যে ওয়্যারলেস ম্যান ছিল সে ও তার ওয়্যারলেস সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আর বাকিরা গোলাগুলির মধ্যেই এদিক-ওদিকে ক্রল করে জঙ্গলের আড়াল দিয়ে ভেগে যায়। সন্ধ্যার আগেই তারা সব ভেগে গেল। তারপর আমরা ওখান থাকি ভারতে চলে আসলাম।

এই ঘটনার পরদিন সকাল ১০টার দিকে কয়েকজন লোক গিয়া বলতেছে, ভাই, যেখানে আপনারা কালকে লড়াই করছেন সেখানে একটা ঘরের মধ্যে এক খানসেনা ঢুকি আছে। তার হাতের মধ্যি কী জানি একটা আছে! আমরা তো ভয়ে যাতি পারছি না। কেউ যদি যায় তো তারে মারি দিতে পারে। তখন আমরা বললাম, হয়তো থাকতেও পারে। তখন আমি আমার দলের সবাইকে ডাক দিলাম। সবাই একত্র হওয়ার পর আমি বললাম, চলো, দেখি কী করা যায়। সবাই গিয়া দেখি যে সেখানে পাবলিকের পাহারা। পাবলিক কিন্তু কেউই সেই ঘরের কাছে ভিড়তেছে না। আমি যে ঘর থেকে খানসেনাদের ওপর ফায়ার করছিলাম সেই ঘরেই নাকি ওই খানসেনাটা লুকাইয়া আছে। তখন আমি ঘরের পিছন দিক দিয়া ক্রল করে গিয়া দেখি যে সত্যি এক খানসেনা। ব্যাটা একটা এলএমজি হাতে নিয়া বসি আছে। এমন ভাব নিয়া বসি আছে যে কেউ কাছে গেলেই তাকে গুলি করবে। আমি ব্যাক করলাম। তারপর আমরা আলোচনা করে ঠিক করলাম কীভাবে ওকে জীবিত ধরা যায়। ব্যাটা হাতে এলএমজি ধরে রাখছে ঠিকই কিন্তু ওটার হয়তো গুলি নাই। তবে গ্রেনেড থাকতে পারে। আমরা একসাথে কয়েকজন ওর ওপর চার্জ করলাম। দরজা ভেঙে একসাথে তার ওপর পড়লাম। কেউ ওর হাত ধরল, কেউ বা পা। সে পাল্টা আক্রমণের কোনো সুযোগই পাইল না। সে শক্তিও বোধ হয় ওর ছিল না। মানসিকভাবেও সে ছিল বিপর্যস্ত। আমরা সার্চ করে তার কাছে একটা গ্রেনেড পাইলাম। আর ওই এলএমজিটা। কয়েক রাউন্ড গুলিও ছিল। খানসেনাটাকে আমরা বার করে নিয়ে আসলাম। এরপর তো পাবলিককে আর থামানো যায় না। কেউ জুতা দিয়ে মারে, কেউ ঝাঁটা দিয়ে মারে। কেউ লাঠি নিয়ে এগিয়ে যায়। ওকে নিয়ে আমরা বিরাট এক ঝামেলার মধ্যে পড়ে গেলাম। ভাবি, কী করি ওকে নিয়ে! তো ও আমাদের বলে, ভাই আপভি মুসলমান হ্যায়, হামভি মুসলমান হ্যায়। হামকো মাত মারো ভাই। ভাই, হামকো মাত মারো। আমি তাকে বললাম, আমরা যতটুকু পারতেছি ঠেকাইতেছি। মনে মনে বললাম তোমাদের মতো গাদ্দারদের তো সঙ্গে সঙ্গেই শেষ করে দেওয়ার কথা। আমাদের ওপর আগে থেকেই নির্দেশ ছিল, কোনো খানসেনাকে জীবিত অবস্থায় ধরতে পারলে তাকে জীবিত রাখা। শেষ পর্যন্ত জনগণকে অনেক বুঝাইয়া আমরা শান্ত করলাম। তারপর ওই খানসেনাকে নিয়া আমরা আবার ভারতে ঢুকলাম। ওখান থাকি পরে তাকে বালুরঘাট পাঠিয়ে দেওয়া হলো।

এই ঘটনার পরপরই কামারপাড়া থেকে আমাদের বলা হলো যে

রাজশাহীর সোনামসজিদ থেকে কানসাট পর্যন্ত খানসেনাদের যে হেভি ডিফেন্স আছে সেই ডিফেন্স থেকে তাদের তাড়াতেই হবে। কামারপাড়া ক্যাম্পে আমাদের সবাইকে কমান্ডার ডাকলেন। আমরা বললাম, স্যার, যেভাবেই হোক এ দেশ স্বাধীন করতে হবে, মরি আর বাঁচি। আমি মরি গেলে আমার ভাই লড়বে, ভাই মরে গেলে তার ভাই লড়বে। আমরা এ দেশ স্বাধীন করবই ইনশাল্লাহ। আমরা যখন নেমেছি তখন তো আর পিছাব না, স্যার। তারপর সেখানে আমাদের অনেকগুলো দলকে একত্র করলেন তিনি। ক্যাপ্টেন ইদ্রিস আমাদের লিড করতেন। একটা ট্রাকে করে আমাদের শিবগঞ্জের কাছে বর্ডারে নামিয়ে দেওয়া হলো। তারপর ওখান থেকে আমরা শিবগঞ্জের কানসাট পর্যন্ত গেলাম। কিন্তু ওখানে যাওয়ার পরই খানসেনারা আমাদের কথা কীভাবে যেন জানতে পারছে। পাকিস্তানিরাই আমাদের ওপর আক্রমণ করে বসল। ওদের সঙ্গে বিকাল তিনটার দিকে খুব গোলাগুলি হলো। ওরা নদীর ওপারে। আমরা এ পারে। আমাদের কমান্ডিং অফিসার বললেন, হটতে হবে বা হটে আসছি এসব কথা শুনতে আমি রাজি নই। আমরা বললাম, স্যার, ঠিক আছে। এই বলে আমরা আবার ব্যাক করে সেখানে গেলাম। আমাদের কারও খাওয়াদাওয়া হয় নাই। কয়েকজন তো খিদার জ্বালায় খুব কাহিল হয়ে পড়ছে। আমি তাদের বললাম, ঠিক আছে সামনে গিয়া আমরা খাব। আমরা আবার কানসাট গেলাম। সেখানে সিদ্ধান্ত হলো, যেভাবেই হোক আমরা শিবগঞ্জ কলেজে খানসেনাদের ডিফেন্সে আক্রমণ করব এবং সেখান থেকে খানসেনাদের হটিয়ে দেব। কানসাট যাওয়ার পর ওখানে আমরা রান্না চড়িয়ে দিলাম। ছেলেগুলোকে তো খাওয়াইতে হবে। কেউ রান্না করতিছে, কেউ তরকারি কাটতেছে। রান্নাটান্না শেষ করে খেয়েদেয়ে চার-পাঁচজন লোক নিয়ে গেলাম রেকি করার জন্য। যাহোক, তারপর নৌকা নিয়ে আমরা রেকি করলাম। আমরা দেখলাম যে শিবগঞ্জ কলেজ বিল্ডিংয়ের দোতলায় খানসেনারা পজিশন নিয়া আছে। খুব হেভি ডিফেন্স করছে। রেকি করে আসি আমরা কমান্ডারকে তাদের অবস্থানের কথা বললাম।

এদিকে আমার ছেলেদের কয়েকজন, হঠাৎ বলল যে তারা এ অপারেশনে যাবে না। আমি তাদের বললাম, দেখো, তোমরা ভয় কোরো না, যার মৃত্যু লেখা আছে, সে-ই মরবে। আর যার নাই, তার গায়ে কোনো গুলিই লাগবে না। আল্লাহকে তোমরা স্মরণ করো। যার যেটা লেখা আছে, সেটাই ঘটবে। তোমরা কেউ সেটা ফেরাতে পারবে না। তখন তারা বলল, ঠিক আছে। তারপর ফির নতুন করে প্ল্যান তৈরি করা হলো। তারপর ওখান থেকে

আমরা কলেজের দিকে মুভ করতে শুরু করলাম। মুভ করছি, এমন সময় চাঁপাইনবাবগঞ্জের কয়েকজন ছেলে বলছে, আপনারা কোথায় যাবেন? আমরা বললাম, কেন বাবা, আমরা ওই পারে যাব। তারা বলছে, রাস্তার মধ্যে খানসেনারা সাদা সাদা বড় বড় কী জানি পুঁততেছে। চারদিকে পুঁতছে অনেকগুলো। আপনারা কেমনে যাবেন? ওদিকে গেলে মারা যাবেন। এই ছেলেগুলো আমাদের খুব সাহায্য করছিল। তাদের কথা শুনে মনে হলো এগুলো মাইন। অ্যান্টি-পার্সোনাল মাইন। তখন আমি তাদের বললাম, কোন দিকে বাবা, চলো, দেখাও তো। তারপর দৌড়ে গিয়ে আমি ক্যাপ্টেনকে সব বললাম। উনি বললেন, তাই নাকি! এরপর আমরা চাঁপাইয়া ছেলেদের নিয়ে চলি গেলাম। তারা দেখিয়ে দিল ওই সব স্পট। আগের রাতে একটু বৃষ্টি হইছিল। মাইন বসানোর জন্য যেসব জায়গায় মাটি খুঁড়ে খানসেনারা মাইন বসাইছে সেই সব জায়গার মাটিগুলো বসে গেছে। কোনো কোনো গর্তের মাইন দেখা যাচ্ছে। কতকগুলোর পিন বার হয়ে রইছে। এসব দেখে আইসা আমাদের কমান্ডারকে বললাম, স্যার, খানসেনারা যদি আমাদের তাড়া করে তখন তো আমাদের ছেলেগুলো পিছনে ব্যাক করার সময় এই মাইনে মারা যাবে। তখন উনি বলছে ঠিকই তো, তাহলে এগুলো আগে উঠাতে হবে। কে পারবে? তখন আমি বললাম, স্যার, আমি তো মুজাহিদে ছিলাম, আমার ট্রেনিং আছে, আমি উঠাইতে পারমু। উনি বললেন, সত্যি পারবা! আমি বললাম, পারমু। তখন উনি আমার পিঠে তিনটা থাপড় দিয়ে আমারে কয়, চলো। আমি চাঁপাইয়া ছেলেদের সঙ্গে নিয়া গেলাম। তারা খুন্তি আর ডালা আনি দিল। খুন্তি দিয়া একটা একটা করে মাইন আমি বার করি আর পিনটা খুলি ডালিতে রাখি দেই, যাতে ওগুলো বার্স্ট না হতে পারে। একটা মাইনের সাথে আর একটা মাইন লাগে তো বার্স্ট হয়ে যেতে পারে। মাইন তুললাম ৯২ কি ৯৩টা। আমার এখন অতটা খেয়াল নাই, অনেক দিনের কথা। এভাবে মাইন তুলি তারপর চলে আসলাম। ক্যাপ্টেন সাব বলল, ওইগুলো চেকপোস্টে পাঠিয়ে দাও। সোনা মসজিদ পার হয়েই চেকপোস্টটা। উনি মাইনগুলো ওখানে পাঠিয়ে দিল। চাঁপাইয়া ছেলেরা আরও বলল, আমরা প্রথম যেখানে গেছিলাম সেখানেও খানসেনারা মাইন বসাচ্ছে। ক্যাপ্টেন সাহেব বলল, ওই পথ দিয়েও তো আমাদের যাতি হবে, আসতি হবে। উনি বলছে, ওগুলোও তুলতে হবে। চলো, তুমি যখন আছো, ভয় কী? তোমার ভয়ের কোনো কারণ নাই, চলো। ওনার কথামতো গিয়া ওগুলোও তুললাম। ওখানে পাইলাম ৬০টা। তারপর খাওয়াদাওয়া করি সন্ধ্যায় সবাই একত্র হলাম। আমরা মুজাহিদ, মুক্তিযোদ্ধা, ইপিআর পাঁচশোর ওপরে ছিলাম।

তারপর ক্যাম্প থেকে আমাদের সবাইকে ডাকি নেওয়া হলো। ক্যাপ্টেন সাহেবের নির্দেশমতো রাত দুইটার দিকে আমরা নদীর পাড়ে গেলাম। নৌকা বাঁধা আছে নদীতে। নদী পার হতে হতে রাত তিনটা বেজে গেল। তারপর ভোর চারটার দিকে আমরা কলেজের দিকে যাওয়া শুরু করলাম। সকাল হতে হতে আমরা রেঞ্জের কাছাকাছি পৌঁছে গেলাম। আমাদের সাথে বিভিন্ন অস্ত্রপাতির মধ্যে রকেট লঞ্চারও ছিল। আমরা রেঞ্জের মধ্যে যাওয়ামাত্রই ওরা দোতলা থেকে আমাদের ওপর ফায়ার শুরু করে দিল। মনে হচ্ছে বৃষ্টি পড়তেছে—এ রকম গুলি। এসএমজির ফায়ার। এলএমজির ফায়ার। মেশিন গানের ফায়ার। টু ইঞ্চ মর্টার, থ্রি ইঞ্চ মর্টার আমাদের ওপর সমানে মারতেছে। আমাদের অবস্থান ওরা জানছে। আমরা খুবই নাজেহাল হলাম। তার পরও দুই ঘণ্টা তাদের সাথে লড়লাম। কিন্তু দেখি আমাদের ছেলে খুব বেশি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কেউ মারা যাচ্ছে। কেউ উনডেড হয়ে যাচ্ছে, কেউ পলায় যাচ্ছে। কোনো দিগ্বিদিক নাই। তার পরও এভাবে লড়াই চলল। আমরা পারলাম না। শেষ পর্যন্ত আমরা ফায়ার দেই আর আস্তে আস্তে পিছাই। নদীর পাড়ে যেখানে নৌকা ছিল সেখানেও কিছু মুক্তিযোদ্ধা ছিল। তারাও ভুল করে আমাদের ওপর গুলি করতে লাগল। ক্যাপ্টেন ইদ্রিস বলল, তোমরা সব এখানে থাকো, আমি দেখছি। তারপর উনি গিয়া আমাদের দলের পিছনটা সামলাল। উনি পিছনের মুক্তিযোদ্ধাদের নাকি বলছে, এই ব্যাটা, তোমরা আমাদের লোকদেরই শেষ কইরে দিলা। তখন ওরা ওপরের দিকে ফায়ার শুরু করল। তখন আমরা নিচ দিক দিয়া নদীতে আসি পড়লাম। নদী পার হইয়া দেখি যে আমারও ঠ্যাঙ্গে গুলি লাগছে। চায়নিজ রাইফেলের গুলি। লাস্টে দেখি খুব খারাপ লাগতেছে। পা ভারী হয়ে যাচ্ছে। তখন আর এক কদমও এগোতে পারি না। আমি কখন যেন জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেছি। আর কিছু জানি না।

আমাদের নিয়া আসলো মালদহ হাসপাতালে। সেখানে জর্জ সাহেব আসলেন আমাদের দেখতে। অ্যাম্বুলেন্সে করে বিকাল চারটার সময় আমাদের রায়গঞ্জ আর্মি হাসপাতালে নিল। সঙ্গে সঙ্গে তারা আমাদের ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা নিলেন। তারপর আমাদের কাউকে ১৮ দিন রাখল। কাউকে ২০ দিন রাখল। ১৮ দিনের মাথায় হাসপাতাল থেকে আমাদের বলল, আপনাদের এখন রিলিজ করা হবে। রিলিজ কাউকে এক দিন আগে দিল, কাউকে এক দিন পরে দিল। এ রকম দিতে দিতে যে দিন আমাদের রিলিজ করল, সে দিন দেখি আমাদের সামাদকে হাসপাতালে ঢোকাচ্ছে। সে-ও গুরুতর আহত। আমরা পাঁচজন সে দিন রিলিজ নিছিলাম।

এরপর আমাদের পাঁচজনকে ওখান থেকে পাঠিয়ে দিল চেকপোস্টে। সেখান থেকে আমাদের কামারপাড়ায় পাঠিয়ে দিল। কামারপাড়া থেকে বলল, তোমরা সেভেন সেক্টরে চলে যাও। তখন চলে আসলাম বলাহার ক্যাম্পে। ওখানে দেখি কর্নেল কে সি বাট সাহেব। উনি আমাদের দেখে বললেন, তোমরা কয়জন আসছ। আমি বললাম, স্যার, আমরা পাঁচজন আসছি। আমরা কথাবার্তা বলছি, এমন সময় তার কাছে একটা ওয়্যারলেস কল আসলো। কে সি বাট সাহেব আমাদের বললেন, ওয়্যারলেস মেসেজ আসছে, তোমরা জলদি তৈরি হয়ে আসো। আমরা জলদি রেডি হয়ে এলাম তার কাছে। যাওয়ামাত্র বলল, এখনি মুভ করতে হবে। এই গাড়ির মধ্যেই ওঠো। আমাদের গাড়িতে উঠিয়ে নিল। উঠিয়ে দিয়ে বলল, তোমরা কামারপাড়া চলি যাও। আমরা কামারপাড়ায় গেলাম। আমরা গাড়িতে করে কামারপাড়ায় গিয়ে দেখি, সেখানে বাংলাদেশের আর্মির বহু সদস্য—বিএসএফ, ইন্ডিয়ান আর্মি, এফএফ, এমএফ—আমরা সবাই মিলে না হলেও কয়েক হাজার হয়ে গেলাম। তখন আমরা সবাই জানার চেষ্টা করি আমাদের কোথায় যেতে হবে। কিন্তু কেউ সে কথা বলে না। মুভ করার অল্প কিছুক্ষণ আগে বলল, হিলিতে অ্যাটাক করা হবে। কেউ কেউ অবশ্য সেখানে না যাওয়ার জন্য গাঁইগুঁই করতে থাকল। আমরা বললাম, ঠিক আছে। আমরা তো দেশেই যাচ্ছি, আলহামদুলিল্লাহ। আমরা খুব খুশি হলাম। কেউ না হলেও আমি খুশি হলাম। আজকে হিলিতে ঢুকব। ইন্ডিয়ান আর্মির কয়েকজন আগেই সেখানে রেকি করার জন্য গেছিল। ইন্ডিয়ান আর্মির যারা রেকি করতে গেছিল, তাদের সবাই হিলির বাজার ঘুরে, সবকিছু দেখেটেখে আসে আমাদের রিপোর্ট দিল যে সেখানে কেউ নেই। খানসেনারা সব ছেড়ে চলে গেছে। তাদের কথামতো আমরা মুভ করলাম। আমাদের গাড়িতে করে নামিয়ে দিল হিলি বাজারের কাছে। আমরা বাম দিকে ঢুকে পড়লাম। ঢুকে বোধ হয় ৫০ কি ১০০ গজ গেছি, কেউ আগে যাচ্ছি, কেউ পিছে যাচ্ছি। দলে দলে বিভিন্ন পার্টি বিভিন্ন দিক দিয়া যাচ্ছে। আর তখনই খানসেনারা প্রচণ্ড ফায়ার শুরু করল। মনে হলো, ভূমিকম্প শুরু হইছে। আল্লাহ যাদের হায়াত রাখছিল তারা বোধ হয় বাঁচল, আর না হলে ১০০০ জনের মতো হবে কবুতরের মতো পড়ে গেল। আমরা আগাতেও পারি না, পিছাতেও পারি না। আমরা যারা বাঁচি ছিলাম, তারা ওই গোলাগুলির মধ্যে টিকতে না পেরে অনেকক্ষণ পর ক্রল করে ব্যাক করলাম। ফিরে আসার পর আর ভিতরে ঢোকা গেল না। আমাদের বহু ক্ষয়ক্ষতি হলো। পরে দেখলাম, খানসেনারা কাঠের পর কাঠ, তার ওপর

ইট-বালি দিয়ে উঁচু করি বাংকার তৈরি করছে। ওই বাংকারে আর্টিলারি ফায়ার করলেও কিছু হবে না। মিডিয়াম গানের শেল মারলেও কিছু হবে না। খানসেনারা খুব হেভি বাংকার তৈরি করছিল সেখানে। প্লেন আইসা বোম্বিংও করছে। তাতেও কিছু হয় নাই শুনছি। লাস্টে বাংকারে গরম পানি ঢালা হইছে। তারপর তারা বাংকার থাকি দলে দলে বারাইছে। যারা বাংকার থেকে বারাইছে তারা কেউ মারা পড়ল, কেউ সারেন্ডার করল। আমাদের যারা আহত হইছিল তাদের হাসপাতালে ভর্তি করাইল। আর যারা একটু ভালো ছিল তাদের মধ্যে থেকে আবার বাছাই করে নিয়ে বগুড়ার দিকে রওনা দিল। আমরা বগুড়ায় গেলাম। ওখানে আমরা প্রথমে ইন্ডিয়ান আর্মি ও বিএসএফের কাছে গিয়া শেলটার নিলাম। পরে ওদের ওখানে না থাকি আমরা বাইরে শেলটার নিয়া সেখানে তাঁবু টানিয়ে থাকলাম। আমরা ওখানে থাকলাম বেশ কিছু দিন। পরে আমাদের ব্যাক করে পাঠিয়ে দিল রংপুর ক্যান্টনমেন্টে। রংপুর ক্যান্টেনমেন্ট থেকে আবার সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্টে আসলাম। সেখানে থাকার সময় আমাদের দলের আবদুল্লাহ, জব্বার, খায়রুল আর্মিতে চলে গেল। মহসীনও চান্স পাইছিল, কিন্তু মহসীন গেল না। আমাদের আবার একদিন বলল, তোমরা যারা যারা উনডেড, তারা এক দিকে হও। আমরা অনেকে হাত তুললাম। তখন আমাদের একদিকে করে বলল, 'আপনাদের সিভিল লাইনে যদি চাকরি দেওয়া হয় তাহলে কি করবেন?' আমরা বললাম, 'চাকরি করব স্যার।' আমি পরে তাদের সার্টিফিকেট নিয়া পাবলিক হেলথ ডিপার্টমেন্টে দরখাস্ত দিয়া চাকরি পাইছি। এতটুকুই দেশের জন্য আমার করার ছিল, আমি সেটা করছি। খোদা আমাকে বাঁচায়ে রাখছে—এ জন্য তাঁর দরবারে হাজার সালাম।

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **অমরচাঁদ গুপ্ত**
নভেম্বর ২০, ১৯৯৬

মোহাম্মদ মতিউর রহমান

পিতা : মৃত মফিজউদ্দীন মণ্ডল, গ্রাম : রুদ্রানী, ডাক : জামগ্রাম
ইউনিয়ন : এলুরিয়া, থানা : ফুলবাড়ী, জেলা : দিনাজপুর, শিক্ষাগত
যোগ্যতা : এইচএসসি, ১৯৭১ সালে বয়স ২০ বছর
১৯৭১ সালে ছাত্র ছিলেন, বর্তমানে অবসর জীবন যাপন করছেন
মোহাম্মদ মতিউর রহমানের ছবি পাওয়া যায়নি।

১৯৭১ সালের মার্চ মাসে ফুলবাড়ীতে কী ঘটেছিল?

- ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে আমরা থানা থেকে পাকিস্তানি পতাকা নামিয়ে দিয়ে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করি। তৎকালীন বামপন্থী সংগঠনের একটি অংশের কতিপয় স্থানীয় কর্মী পতাকা তোলার কারণে আমাদের আক্রমণ করে এবং তাদের সাথে আমাদের মারপিট হয়। ওই মারপিটে আমার বাঁ হাতটা ভাঙি যায়। আমার ডান কানটা প্রায় উপড়ে ফেলা হয়। আমার কানে চারটা সেলাই দেওয়া হয়। তখন স্বাধীনতার যে স্লোগান দেওয়া হচ্ছিল তাতে অনেকে বিরোধিতা করছিল। অনেকে আবার পক্ষে ছিল। স্থানীয় কোনো কোনো বিহারির মনোভাব খুবই খারাপ ছিল। তারা গোপনে বাঙালিদের নিধন করার ষড়যন্ত্র করতেছিল। আর এ সময়ই সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্ট থেকে বাঙালি সৈন্যরা পাকিস্তানিদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় রাতের অন্ধকারে ফুলবাড়ীতে আসে। এখানে আমরা তাদের জন্য একটা ক্যাম্পের ব্যবস্থা করি এবং সেখানে তাদের চিকিৎসাসেবা ও ওষুধপাতির ব্যবস্থা করা হয়।

মুক্তিযুদ্ধের পূর্বমুহূর্তে ফুলবাড়ীতে বাঙালি এবং অবাঙালিদের মধ্যে যে সংঘর্ষ হয়, সে সম্পর্কে আপনি কী জনেন?

- এ সম্পর্কে আমি মোটামুটি যেটা জানি তা হলো, তখন বেশির ভাগ স্থানীয় অবাঙালি একটু ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় ছিল। আমরা তাদের জন্য পাহারার ব্যবস্থা করেছিলাম। ওদের আমরা বলতাম, ভাই, এটা বাঙালি আর অবাঙালির কোনো ব্যাপার না। এই দেশ সবারই। প্রথম দিকে তারাও আমাদের মিছিলে যোগ দিত এবং স্লোগানও দিয়েছিল। আমাদের সঙ্গে কাজও করেছিল। কিন্তু তারপর কী এক চক্রান্তের ফলে তারা ক্রমশ আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে যায়। আমরা জানতে পারলাম, এখানে এক অবাঙালি ডাক্তার তাদের প্ররোচনা দিচ্ছিল। তার প্ররোচনায় তারা আমাদের ওপর আক্রমণ করার সাহস পায়। আর এরই ফলে একদিন বাঙালি-অবাঙালি সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায়। সংঘর্ষে একজন বাঙালি মারা যায়। তখন উত্তেজনা আরও বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

সে সময় এখানে বিহারি কতজন মারা যায়?

- কোনো বিহারি মারা যায়নি। কয়েকজন শুধু আহত হয়েছিল।

আপনার এলাকায় পাকিস্তানি সৈন্যরা কখন আক্রমণ করে?

- আমাদের এলাকায় পাকিস্তানিরা আক্রমণ করেছে ২৭ কি ২৮ মার্চ। আমাদের এখানে কিছু মুজাহিদ ছিল। আর ছাত্রলীগের ছেলেপেলেরাও তখন কিছুটা ট্রেনিংপ্রাপ্ত ছিল। ছাত্রলীগের ছেলেরা মুজাহিদদের সঙ্গে নিয়ে তাদের বাধা দেয়। তখন উভয় পক্ষে প্রচণ্ড লড়াই শুরু হয়।

তারা কীভাবে আক্রমণ করল?

- ফুলবাড়ী শহরের পশ্চিম পাশে একটা নদী আছে। ওই নদীর ধারে তারা কী অবস্থায় আসছে, এটা আমরা ততটা জানতে পারি নাই। ওখানে আইসা তারা প্রথমে গুলি শুরু করে। তখন আমরা তাদের প্রতিরোধ করি। সংঘর্ষে ওরা দুই থেকে তিনজন মারাও যায়।

তখন আপনার কী ভূমিকা ছিল?

- তখন আমিও প্রতিরোধযুদ্ধে অংশ নেই। আমি মুজাহিদদের সহযোগিতা করছি। সেই দিন পাকিস্তানিরা ফুলবাড়ী দখল করতে পারে নাই। তারা এখান থেকে ফুলবাড়ী-ভবানীপুর-পার্বতীপুর ভাগি গেছে। এসব জায়গা তখন মুক্ত। তারপর খোলাহাটির বদরগঞ্জ খাদ্যগুদামের কাছে পাকিস্তানি সৈন্যদের সঙ্গে আমাদের সংঘর্ষ হয়। এখানে থার্ড বেঙ্গলের ক্যাপ্টেন আনোয়ার সাহেব যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন। উনার ডান হাতে গুলি লাগে। ওখানে অনেক মুজাহিদ এবং থার্ড বেঙ্গলের সৈনিক মারা যায়। তারপর ওইখান থেকে বিকাল তিনটা কি সাড়ে তিনটার দিকে আমরা সবাই হটে আসি। সেই দিন সন্ধ্যার আগে আগে পাকিস্তানি সৈন্যরা ফুলবাড়ী আবার দখল করে নেয়। আমরা তার আগেই চলে আসছিলাম ফুলবাড়ীতে। আমরা তখন ইন্ডিয়ার দিকে, মানে বর্ডারের দিকে যাওয়া শুরু করলাম।

পাকিস্তানি সৈন্যরা তারপর কী করল?

- তারা এখানে আসে ফুলবাড়ী দখল করার পর ক্যাম্প করছে। জ্বালাও-পোড়াও করছে। কিছু বাঙালি হত্যা করছে। তারপর আস্তে আস্তে গোটা এলাকা তারা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে।

মুক্তিযুদ্ধে আপনার পরিবারের কেউ কি শহীদ হয়েছেন?

- আমার পরিবারের কেউ শহীদ হয় নাই।

পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে আপনি কি আক্রান্ত হয়েছিলেন?

- হ্যাঁ, যুদ্ধের সময় আমি আক্রান্ত হয়েছিলাম।

কীভাবে আক্রান্ত হলেন?

- আমরা তখন যুদ্ধ করতেছিলাম। এখানকার বর্তমান সংসদ সদস্য মোস্তাফিজুর রহমানের গ্রামের বাড়ির কাছে একটা পুকুর আছে বেলপুকুরিয়া নামে। আমরা ওই পুকুরের পূর্ব পাশে ছয়জন মুক্তিযোদ্ধা পজিশন নিয়ে খানসেনাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতেছিলাম। ওরা পিছন দিক দিয়ে আমাদের সম্পূর্ণ ঘিরে ফেলছিল। আমরা প্রথম বুঝতে পারি নাই। আমাদের একজন মুক্তিযোদ্ধা, তার নাম মোয়াজ্জেম, সে ওদের দেখতে পায়। তার সংকেত পেয়ে তখন আমরা ক্রল করে পূর্ব পাশ দিয়ে ধানখেতের মধ্যে যাই। ধানখেতের মধ্যে গিয়ে আমরা লুকিয়ে থাকি। তারা আমাদের দেখতে পায়নি। পরে সেখান থেকে আমরা আবার আমাদের ক্যাম্পে যেতে সক্ষম হয়েছি।

আপনি কেন মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেন?

- তখন মনে করলাম আমরা ইয়ং ছেলেপেলেরা যদি না যাই, তাহলে এই দেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ কে করবে, এ দেশ হানাদারমুক্ত কে করবে? আমরা তখন ছাত্রসংগঠন করতাম। সংগঠনের ছেলেপেলেরা একত্র হয়ে আলোচনা করে ঠিক করলাম যে আমাদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে হবে। তখন আমরা সবাই মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করলাম।

আপনার এলাকায় মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা কখন থেকে শুরু হয়?

- ওটা মে মাসের দিকে শুরু হয়। আমরাই শুরু করি। হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে আমাদের প্রথম যুদ্ধে একজন মুক্তিযোদ্ধা মারা যায়। আমজাদ নামে একজন মুক্তিযোদ্ধার দুই পায়ে গুলি লাগে। আর খায়ের নামে একজন মুক্তিযোদ্ধাকে খানসেনারা ধরে নিয়ে যায়।

আপনি সে যুদ্ধে ছিলেন?

- হ্যাঁ, আমি সেই যুদ্ধে ছিলাম। আমার সাথিরা আজও অনেকে জীবিত। অনেকেই সেই যুদ্ধে ছিল।

সেই যুদ্ধে আপনারা কতজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন?

- সেই যুদ্ধে আমরা মুক্তিযোদ্ধা ছিলাম ৩০ জনের মতো।

আপনারা প্রথম পাকিস্তানিদের আক্রমণ করছিলেন, না পাকিস্তানিরা আপনাদের আক্রমণ করেছিল?

- আমরাই পাকিস্তানিদের ক্যাম্পে আঘাত হানার জন্য যাচ্ছিলাম। পথিমধ্যে কিছু রাজাকারের সহায়তায় খানসেনারা আমাদের ওপর আক্রমণ চালায়। তাদের আক্রমণে আমাদের সহযোদ্ধা একজন নিহত হয়। আর একজনকে তারা ধরে নিয়ে যায়। আর একজন জখম হয়।

যাকে ধরে নিয়ে যায়, তাকে পরে আপনারা ফেরত পেয়েছেন কি?

- পাকিস্তানি সৈন্যরা ওকে ধরে সেখানেই তার ওপর খুব অত্যাচার করে। সে মারা গেছে মনে করে পাকিস্তানিরা তাকে ফেলে যায়। কেউ একজন তাঁকে নিয়ে গিয়ে রাজপুর সদর হসপিটালে ভর্তি করিয়ে দেয়। সে ওখানে চিকিৎসা নিয়ে ভালো হইয়া যায়।

পাকিস্তানি সৈন্যরা কি আপনার এলাকায় কোনো গণহত্যা করেছিল?

- হ্যাঁ, গণহত্যা করেছিল, বড়াই নামক স্থানে। বড়াইহাটের দক্ষিণ পাশে। প্রায় ৮১ জন লোককে সেখানে তারা এক দিনে হত্যা করেছে। তার ভিতর শিশু, বৃদ্ধ, যুবক-যুবতী সব ধরনেরই মানুষ ছিল।

এ ঘটনা কি আপনি দেখেছিলেন?

- হ্যাঁ, আমি পরে দেখেছি।

আপনার এলাকায় রাজাকার, আলবদর কারা ছিল?

- আমাদের এলাকায় রাজাকার ছিল। কিন্তু আলশামস এবং আলবদর বাহিনী আমাদের এলাকায় তৈরি হয় নাই। আমাদের গ্রামের উত্তর-পূর্বের গ্রাম দামাদারপুর এবং খজাপুর এলাকার কিছু ছেলেপেলে বাধ্য হয়ে রাজাকারে নাম দিয়েছে নিজের গ্রাম বাঁচাবার জন্য, এলাকা বাঁচাবার জন্য। তারা তেমন একটা ক্ষতি করে নাই। খানসেনাদের সহায়তাও করে নাই। মানুষের ক্ষতিও করে নাই।

পাকিস্তানি সেনারা আপনার এলাকায় কোনো গণহত্যা করেছিল কি?

- হ্যাঁ, গণহত্যা করেছিল, বড়াই নামক স্থানে। বড়াইহাটের দক্ষিণ পাশে। ৮১ জন লোককে সেখানে তারা এক দিনে হত্যা করেছে। তার ভিতর শিশু, বৃদ্ধ, যুবক-যুবতী—সব ধরনেরই মানুষ ছিল।

আপনার এলাকায় শান্তি কমিটিতে কারা ছিল?

- শান্তি কমিটিতে এখানকার বাঙালি এবং অবাঙালিরা ছিল। তার ভিতর আবুল হোসেন, হাজি মোমিন, ফজলার চেয়ারম্যান, কেনান সরকার, হাতেম, জুমরাতি এবং আরও কয়েকজনের নাম বেশি বেশি শোনা যায়। এ ধরনের ব্যক্তি শান্তি কমিটিতে আরও ছিল। তাদের ভিতর কিছু লোক মারা গেছে। আর কিছু লোক এখনো আছে।

এসব স্বাধীনতাবিরোধীকে যুদ্ধ চলাকালে বা দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ধরা হয়েছিল কি?

- হ্যাঁ, কিছু ধরা হয়েছিল। দালাল আইনে অনেকে ধরা পড়ছিল। অনেকে পালিয়ে গিয়ে রাজধানী ঢাকাতে ছিল।

যাদের ধরা হয়েছিল তারা ছাড়া পেল কীভাবে?

- এরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাধারণ ক্ষমার কারণে ছাড়া পাইছে। আবার কেউ কেউ আইনের ফাঁক দিয়া ছাড়া পাইছে।

আপনি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে কোন কোন এলাকায় যুদ্ধ করেছেন?

- দিনাজপুর জেলার ফুলবাড়ী, পার্বতীপুর, রংপুরের বদরগঞ্জ ইত্যাদি এলাকায় যুদ্ধ করেছি। যুদ্ধের স্বার্থে যখন যেখানে যাইতে হয়েছে গেছি। কখনো গেরিলা, কখনো সম্মুখযুদ্ধ করেছি।

ফুলবাড়ী থানার কোথায় আপনি যুদ্ধ করেছেন?

- ফুলবাড়ী থানায় যুদ্ধ করেছি মেলাবাড়ী এলাকায়। তারপরে মাছুয়াপাড়া জলপাইতলি ক্যাম্প এলাকায়। ওখানে মুক্তিফৌজের অনেক ছেলেপেলে মারা যায়। ৫০ জনের মতো মুক্তিযোদ্ধা ওখানে মারা যায়।

তারা কীভাবে মারা যায়?

- তারা বেশির ভাগ মারা যায় শেলের আঘাতে।

আপনারা কতজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন সেখানে?

- তিন শ থেকে সাড়ে তিন শ মুক্তিযোদ্ধা। আমরা তিনটা ভাগে বিভক্ত হয়ে ওখানে রাতের বেলা এসে পাকিস্তানি সৈন্যদের ক্যাম্পটি অ্যাটাক করি। কিন্তু ওদের হেভি গোলার আঘাতে আমাদের বেশ কিছু মুক্তিযোদ্ধা ওখানে মারা যায়।

তাদের ক্যাম্প আপনারা দখল করতে পারছিলেন কি?

- সে দিন তাদের ক্যাম্প আমরা দখল করতে পারি নাই। তার কিছুদিন পর অবশ্য ওরা ওইখান থেইকা ক্যাম্প সরিয়ে নিয়ে যেতে বাধ্য হইছে।

এ রকম ভয়াবহ যুদ্ধ আর কোথায় করেছেন?

- এ রকম ভয়াবহ যুদ্ধ আরেকটা সংঘটিত হয় ফুলবাড়ী থানার কাজীহাল ইউনিয়নের আটপুকুরহাট নামে জায়গায়। ওখানে এবং মাদলাহাটে খানসেনারা ছিল। এই দুই জায়গার মাঝখানে একটা বড় ব্রিজ আছে। ওই ব্রিজটা আমরা ওড়াই দেওয়ার পর তাদের সাথে আমাদের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। সে যুদ্ধ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলে। আমরা ওদের ত্রিমুখী আক্রমণ করেছিলাম। আমাদের ধারণা, সে দিন ১৫ থেকে ২০ জন খানসেনা আমরা হত্যা করতে পেরেছি। কিন্তু তাদের লাশ আমরা নিয়ে আসতে পারি নাই।

সেই যুদ্ধে আপনাদের কোনো মুক্তিযোদ্ধা নিহত বা আহত হয়েছিল কি?

- ওই যুদ্ধে আমাদের কোনো মুক্তিযোদ্ধা নিহত বা আহত হয়নি। সে দিন আমাদের সঙ্গে মন্টু ভাই, উনি এখন পুলিশের এসপি, মকসুদ ভাই, তারপরে বর্তমান জাতীয় সংসদ সদস্য মুস্তাফিজুর রহমান, প্রাক্তন সৈনিক মহসীন ভাই ছিলেন। তাঁদের সুদক্ষ নেতৃত্বের কারণেই ওই যুদ্ধে আমাদের পক্ষে কোনো হতাহত হয় নাই।

রংপুর জেলার বদরগঞ্জ থানার যুদ্ধ সম্পর্কে আপনি কী জানেন?

- রংপুর জেলার বদরগঞ্জ থানার প্রোপারে একটা বাজার আছে। সেখানে বড় নদীর ধার দিয়ে আমাদের ডিফেন্স তৈরি করা ছিল। আমরা ডিফেন্সে থাকাকালে ওরা কীভাবে যেন আমাদের কথা জানতে পারছে। তখন ওরা আমাদের ওপর আক্রমণ করে। তারা আমাদের ডিফেন্সে প্রচণ্ডভাবে গোলা মারতে থাকে। তাদের আক্রমণে আমরা ডিফেন্স থেকে হটে যাই। ভোর থেকে সকাল ১০টা পর্যন্ত সেখানে যুদ্ধ হয়। সে দিন আমাদের অনেক মুক্তিযোদ্ধা মারা যায়। ক্যাপ্টেন আনোয়ার ওই যুদ্ধে ছিলেন। উনি আমাদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

ওই যুদ্ধে পাকিস্তানি সৈন্য কতজন আহত বা নিহত হয়েছিল?

- এটার সঠিক হিসাব আমাদের পক্ষে দেওয়া সম্ভব না। কেননা, প্রচণ্ড গোলাগুলির মুখে আমরা কেউ টিকতেই পারিনি। ডিফেন্স নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে আমাদের পক্ষে অনেক হতাহত হয়েছিল।

মুক্তিযুদ্ধকালে আপনার কোনো স্মরণীয় ঘটনার কথা কি মনে পড়ে?

- স্মরণীয় ঘটনা হলো, ফুলবাড়ী থানার দক্ষিণে খয়েরবাড়ী এলাকার গোয়ালপাড়ার দুইজন মুক্তিফৌজকে রাজাকারদের সহায়তায় খানসেনারা ধরে। এ দুইজনের একজন হিন্দু সম্প্রদায়ের ছিল। মুসলমান মুক্তিযোদ্ধাকে নির্যাতন করে তাকে দিয়েই পাকিস্তানি সৈন্যরা একটা গর্ত খুঁড়িয়ে নেয় এবং সেখানে তাকে গুলি করে হত্যা করে। আর হিন্দু মুক্তিযোদ্ধাকে, তার নামটা আমার এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না, তাঁকে পাকিস্তানি সৈন্যরা হত্যা করে একটা গাছে টাঙিয়ে রাখে। দীর্ঘদিন ধরে লাশটা ওখানে ওই অবস্থায় ছিল। ওই দুইজন মুক্তিযোদ্ধার মর্মান্তিক মৃত্যু কোনো দিন ভুলবার নয়। এলাকার মানুষ এখনো ওই দুইজন মুক্তিযোদ্ধার কথা আলোচনা করে।

আপনার এলাকা যখন শত্রুমুক্ত হয় তখন আপনি কোথায় ছিলেন?

- আমার এলাকা যে দিন শত্রুমুক্ত হয়, সে দিন শুক্রবার ছিল। ডিসেম্বরের ৬ কি ৭ তারিখ হবে। আমরা ফুলবাড়ী শহর থেকে পশ্চিমে সিন্দরহাটি গ্রামে অবস্থান করতেছিলাম। জুম্মার নামাজের পর আমাদের ফুলবাড়ী ব্রিজ উড়িয়ে দেওয়া হয়। তখন আমরা মনে করলাম, হয়তো খানসেনারা ব্রিজ উড়িয়ে দিয়ে পালাইতেছে। তখন আমাদের এখানে ভারতীয় ট্যাংক এবং পদাতিক

বাহিনী পুরাপুরি ডিফেন্স নিয়ে আছে। আমরা মনে করছিলাম যে আজ না হয় কাল শনিবার আমরা ফুলবাড়ীতে আক্রমণ করব। কিন্তু পরে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে সে দিন বিকালের দিকে আমরা আস্তে আস্তে আগাইতে আগাইতে ফুলবাড়ীর পশ্চিম পাশে একটা কলেজ আছে, সেই কলেজের পাশেই ডিফেন্স করলাম। তারপর আমরা খবর নিয়ে জানলাম যে ফুলবাড়ী শহরের ভিতর কোনো খানসেনা নাই। তবু আমরা তখনই শহরে ঢোকা নিরাপদ মনে করলাম না। আমরা কয়েকজন মিলে চিন্তাভাবনা করলাম যে আজ সন্ধ্যা লাইগে গেছে বরং কাল শনিবার সকাল আটটা-নয়টার দিকে আমরা ফুলবাড়ী বাজারের মধ্য দিয়ে শহরে ঢুকব। পরের দিন আমরা শহরের মধ্যে ঢুকি।

সে দিন আপনারা কতজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন?

- মুক্তিযোদ্ধা আমরা ছিলাম গ্রুপ গ্রুপ অবস্থায়। আমাদের গ্রুপে ছিল ১৫ জনের মতো।

আপনাদের সঙ্গে ভারতীয় সৈন্য কতজন ছিল?

- এটা সঠিক বলা সম্ভব না। তারা অনেক ছিল। সংখ্যা বলতে পারব না।

তারপর আপনারা কী করলেন?

- ভারতীয় বাহিনী ফুলবাড়ী বাজারের দক্ষিণে রাইস মিলের ওখানে ক্যাম্প করল। আর আমরা ফুলবাড়ী শহরের উত্তর পাশে একটা পরিত্যক্ত বাড়িতে ক্যাম্প করলাম। দুদিন পর স্থানীয় আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি ডাক্তার মোজাফফর হোসেন, ফুলবাড়ী কলেজের প্রিন্সিপাল আবদুল আজিজ সাহেবের সহযোগিতায় থানা প্রশাসনটা চালু করার জন্য আমরা চেষ্টা করেছি।

সেই সময় ফুলবাড়ী এলাকার বাড়িঘরের অবস্থা কেমন ছিল?

- ম্যাক্সিমাম বাড়িঘর ভাঙা অবস্থায়। পোড়া বাড়ির মতো বা একেবারে শ্মশানের মতো মনে হইতেছিল।

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **ভবেন্দ্রনাথ বর্মণ**
ডিসেম্বর ২১, ১৯৯৬

মোহাম্মদ শাহাবুদ্দীন শাহ্

পিতা : মোহাম্মদ তাজউদ্দীন শাহ্, গ্রাম : খাগড়াবন্দ, ইউনিয়ন : হরিরামপুর থানা : পার্বতীপুর, জেলা : দিনাজপুর, শিক্ষাগত যোগ্যতা : বিএ, ১৯৭১ সালে বয়স ১৯ বছর, ১৯৭১ সালে ছাত্র ছিলেন, বর্তমানে কৃষিজীবী।

১৯৭০ সালের নির্বাচন এবং তার পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে আপনি কী জানেন?

- ১৯৭০ সালের নির্বাচনের সময় বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা আওয়ামী লীগকে ভোট প্রদান করি। কিন্তু পাকিস্তানি প্রেসিডেন্ট ক্ষমতা হস্তান্তর করতে টালবাহানা শুরু করল। তখন আওয়ামী লীগের ডাকে দেশে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। সে সময় আমি কারমাইকেল কলেজের ছাত্র ছিলাম। ইয়াহিয়া খান ২ মার্চের অধিবেশন বাতিল করায় রংপুরে কয়েকটি ছাত্রসংগঠনের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো যে এটার প্রতিবাদ করা হবে। আমরা সবাই কারমাইকেল কলেজ চত্বরে একত্র হলাম। কলেজ চত্বরে সে দিন কিছু জনতাও আমাদের সঙ্গে যোগদান করেছিল। ৩ মার্চ সকাল নয়টা কি সাড়ে নয়টার দিকে কারমাইকেল কলেজের পার্শ্ববর্তী লালবাগ রেলগেট থেকে রংপুর টাউনের দিকে আমরা প্রতিবাদ মিছিল শুরু করলাম। এটা জঙ্গি মিছিল ছিল। এই মিছিল রংপুর শহরের জাহাজ কোম্পানির মোড়ে পৌঁছালে মিছিলে গুলি করা হয়। গুলিতে মিছিলের দুজন ছাত্র আহত হয়। পরে শুনলাম, একজন নিহত হয়েছে।

এই মিছিলে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মনসুর আলী, আবদুল মালেক, শহীদ মুক্তার এলাহী প্রমুখ ছাত্রনেতা। মুক্তার এলাহী ছাত্রলীগের কারমাইকেল কলেজ শাখার সভাপতি এবং আবদুল মালেক সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। আরও দুজন নেতৃস্থানীয় নেতা আমাদের সঙ্গে ছিলেন। তাদের একজনের

নাম জিয়াউল ইসলাম এবং অপরজনের নাম রফিকুল ইসলাম গোলাপ। বিহারিরা [অবাঙালি মুসলিম] জাহাজ কোম্পানির মোড়ে এই মিছিলে গুলি করেছিল। গুলির কথা শুনে ছাত্র-জনতা খুবই উত্তেজিত হয়ে পড়ে। মৃত্যুসংবাদ তাদের আরও মারমুখী করে এবং এর ফলে ছাত্র-জনতাকে আর নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়নি। কিছুসংখ্যক উত্তেজিত ছাত্র-জনতা বিহারিদের সহায় সম্পত্তির ওপর হামলা করে। জাহাজ কোম্পানির মোড়ে বেশ কিছু বিহারি ব্যবসা-বাণিজ্য করত এবং সেখানেই তারা বসবাস করত। বিহারিদের জেনারেল বুট হাউস, প্যারাডাইস কোম্পানি, জাহাজ কোম্পানি প্রভৃতি দোকানপাট ভাঙচুর এবং লুট করা হয়। আমরা এটা আর সামাল দিতে পারলাম না। কয়েক ঘণ্টা পর কারফিউ জারি হয়ে গেল রংপুরে। যখন কারফিউ জারি হয়ে গেল তখন আমরা রাস্তা ছেড়ে চলে এলাম। ছাত্র-জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। নেতারা কে কোথায় চলে গেল তার কোনো ঠিক নাই। নেতারা চলে যাওয়ার আগে অবশ্য আমাদের বলল যে, তোমরা নিজ নিজ এলাকায় চলে যাও। আমি চলে গেলাম জুম্মাপাড়ায়। ওখানে একটা বাড়িতে আমি লজিং থাকতাম।

নির্বাচনে জয়লাভ করা সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ক্ষমতা না দেওয়ায় দেশের মানুষের মধ্যে তখন ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল। তারা বলল যে, এই উর্দুভাষীদের সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখাই যাবে না। আমাদের এলাকার সর্বত্রই এই কথা। আমরা কারফিউয়ের কারণে ঘরে আটকা থাকলাম আর বার হওয়া গেল না। পরের দিন, অর্থাৎ ৪ মার্চ বেলা দুইটার সময় কারফিউ শিথিল হলো। তখন আমি লজিং বাড়িতে বলে বাইসাইকেলে চড়ে নিজ বাড়িতে চলে আসলাম। বাড়িতে চলে এসে আমার বন্ধুবান্ধব, সঙ্গীসাথিদের সঙ্গে নিয়ে নিজ এলাকাতেই কাজ শুরু করলাম। প্রথমেই পার্বতীপুরের বিভিন্নজনের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। এর মধ্যে একদিন স্থানীয় এমএনএ শাহ্ মাহ্তাবকে খুঁজে বার করার জন্য আমি দিনাজপুর গেলাম। দিনাজপুরে তাঁর সঙ্গে দেখা হলো। তিনি আমাকে ২২ মার্চ পার্বতীপুরে জনসভা করার প্রোগ্রাম দিলেন এবং সেটা আয়োজনের জন্য আমাকে নির্দেশ দিলেন। তাঁর কথামতো আমরা পার্বতীপুরে জনসভার আয়োজন করি। এ জন্য আমরা কয়েক দিন ধরে মাইকিং করে বিভিন্ন এলাকায় প্রচার চালাই। জনসভায় ১০-১৫ হাজার লোক হয়। জনসভার স্থান ছিল বাহাদুর হাট। তখন ওখানে তো কয়লাখনি ছিল না, এখনকার মতো মানুষজনেরও তেমন আনাগোনা ছিল না। একদম পল্লিগ্রাম। তার পরও বাহাদুরহাটে ১০ হাজার থেকে ১৫ হাজার মানুষের সমাবেশ ঘটেছিল।

মানুষ পাকিস্তানিদের আচরণে এতই ক্ষুব্ধ ছিল যে তারা দলে দলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জনসভায় যোগ দিল। জনসভার পর জনগণের মধ্যে একটা স্বতঃস্ফূর্ত জঙ্গি ভাব এসে গেল। মানুষের সংগ্রামী চেতনা আরও বেড়ে গেল। জনগণের সবার মনোভাব : আমরা আমাদের দাবি আদায় না করে আর ঘরে ফিরব না। জনসভায় আমাদের এখানকার তৎকালীন স্থানীয় নেতা সরদার সাহেব, সরকার শাহ্তাব উদ্দীন, জাতীয় পরিষদ সদস্য মাহ্তাব সাহেব বক্তৃতা করলেন। এমএনএ মাহ্তাব সাহেবের বক্তৃতায় আমাদের ছেলেরা ভীষণ আবেগাপ্লুত হয়ে পড়ল। শাহ্ মাহ্তাব তাঁর বক্তৃতার একপর্যায়ে বললেন, আপনাদের মধ্যে কে আছেন, যে দেশের জন্য রক্ত দিতে পারেন। তাৎক্ষণিকভাবে আমি একটা সাদা কাগজে আমার বাম হাতের আঙুল ব্লেড দিয়ে চিরে রক্ত দিয়ে লিখলাম, 'জীবন বাজি রেখে হলেও আমরা স্বাধিকার আর স্বাধীনতার জন্য লড়াই করে যাব।' সে দিন ওই রক্তমাখা কাগজটি নিয়ে আমরা উপস্থিত সবাই শপথ গ্রহণ করলাম। ২২ মার্চ মধ্যপাড়ার ইতিহাসে স্বাধীনতার এক অনন্য দিবস হিসেবে এলাকার মানুষ এখনো স্মরণ করে। এই দিনটা 'রক্ত-স্বাক্ষর' দিবস হিসেবে এখনো পালন করা হয়। শাহ্ মাহ্তাব সে দিন আরও বলেছিলেন, আপনাদের মধ্যে এখন যে চেতনা এসেছে, ইনশাল্লাহ আমাদের আর কেউ দাবিয়ে রাখতে পারবে না। আমরা মুক্ত হবই ইনশাল্লাহ। শৃঙ্খলা রক্ষা করুন এবং নেতার নির্দেশের অপেক্ষায় থাকুন।

১৯৭১ সালের পঁচিশে মার্চ পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর আক্রমণ সম্পর্কে আপনি কী জানেন?

● ঢাকার খবর সঙ্গে সঙ্গে আমরা পাইনি। ছাব্বিশে মার্চ প্রথম জানতে পারলাম যে সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্টে খানসেনারা হামলা করেছে। সেখানে আমাদের বেঙ্গল রেজিমেন্টের যারা আছে তাদের ওপর তারা আক্রমণ করেছে। তারপর ক্রমশ ঢাকা এবং অন্যান্য এলাকারও খবর পেলাম। ২৭ মার্চ আমার কাছে থার্ড বেঙ্গলের দুজন বাঙালি সেনা আসলো। তাদের একজনের নাম সুবেদার শহীদুল্লাহ, অপরজন সুবেদার জহীরউদ্দীন প্রধান। তারা সামরিক পোশাকে ছিলেন না। কিন্তু পরিচয় দিলেন যে তারা থার্ড বেঙ্গলের সদস্য এবং সৈয়দপুরে পঁচিশে মার্চ রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাতে আক্রান্ত হয়েছিলেন। সদস্যদ্বয় জানালেন, তাঁরা কোনোরকমে জীবনরক্ষা করেছেন কিন্তু তাদের পরিবার-পরিজন বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আছে। তাদের কী হয়েছে, এ সম্পর্কে তারা কিছুই জানে না। তারা এখানে চলে আসছে তাদের পরিবার-পরিজনদের খোঁজখবর নেওয়ার জন্য। আমার কাছে এ

ব্যাপারে তারা সাহায্য কামনা করল। সে সময় আমার কাছাকাছি মোতালেব মণ্ডল নামে স্থানীয় এক যুবনেতা ছিলেন। তিনি আমার বড় ভাইয়ের মতো এবং একজন সংগ্রামী নেতা। তিনি এবং আমি তাঁদের কথাগুলো শোনার পর আমাদের ভিতরে আবেগ এবং উত্তেজনার সৃষ্টি হলো। তাঁদের বললাম, আমরা আমাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করব আপনাদের পরিবার-পরিজনকে খুঁজে বের করতে। এরপর ওনারা আমাদের ওখানে খেয়েদেয়ে ফুলবাড়ীর দিকে চলে গেলেন। যাওয়ার আগে তাঁরা আবারও বললেন যে, আপনারা একটু সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্টের পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোতে খোঁজ নেবেন, হয়তো তারা ওখানেই আছে। আমরা সম্মতি জানালাম। ২৭ মার্চ তো যেতে পারলাম না।

এদিকে ২৭ মার্চ রেডিওতে স্বাধীনতার ঘোষণা শুনলাম। ওই দিন মেজর জিয়াউর রহমানের ঘোষণা আমি রেডিওতে কিছুটা শুনছি। রেডিওতে আমি মেজর জিয়া বলছি, আমাদের যুদ্ধ চলছে, সর্বাধিনায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি—এরকম বলছে আরকি। সে দিন আমি ভাষণের সবটা শুনতে পারি নাই। সেই সময় মানুষ যেখানে রেডিও থাকত সেখানে দল বেঁধে খবর বা কোনো ঘোষণা শোনার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকত।

২৮ মার্চ সকালে নাশতা-পানি খেয়ে আমি আর মোতালেব মণ্ডল কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে বদরগঞ্জ হয়ে চলে গেলাম শেখের হাটের দিকে। সেখানে এক বয়স্ক ব্যক্তিকে থার্ড বেঙ্গলের দুই সৈনিকের পরিবারের কথা বললাম এবং অনুরোধ করলাম যে এদের কোনো সন্ধান দেওয়া যায় কি না। তখন মুরুব্বি আমাদের বললেন, একটু অপেক্ষা করেন, দেখি কীভাবে তাদের খোঁজ নেওয়া যায়—এই কথা বলে তিনি শেখের হাটের ভিতরে চলে গেলেন। ঘণ্টা খানেক পর ঘুরে আসি তিনি বললেন যে, যাদের খুঁজতেছেন তাদের কোনো পরিচয়পত্র আপনাদের কাছে আছে কি না। তখন আমি সুবেদার শহীদুল্লাহ সাহেব স্বাক্ষরিত একটা চিঠি তাঁকে দিলাম। ভদ্রলোক বললেন, একজনের খোঁজ পেয়েছি, তবে তিনি কার স্ত্রী তা বলতে পারব না। আমাকে চিঠিটা দেন, তারা দেখলে হয়তো বুঝতে পারবে। এই বলে আবার চিঠিটা নিয়া গেল। এর আধঘণ্টা পর উনি আসলেন। তাদের সঙ্গে শহীদুল্লাহ আর জহীরউদ্দীন প্রধান সাহেবের স্ত্রী আসল। জহীরউদ্দীন সাহেবের স্ত্রীর নাম হোসনে আরা। তো হোসনে আরা আসি আমাদের দেখে বলে যে, আপনাদের ভাই কোথায়? তার সঙ্গে ছোট ছোট বাচ্চা আছে। তাদের ছোট বাচ্চাগুলো নিয়া তারা হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। রাত হয়ে

যাওয়ায় সে দিন আমরা আর আসতে পারলাম না। পরদিন তাদের সবাইকে আমি আমার বাড়িতে নিয়ে আসলাম। বাড়িতে এসেই আমি ফুলবাড়ীতে শহীদুল্লাহ সাহেবকে খবর দিলাম। এটা মার্চের ২৯ তারিখে। কিন্তু শুনলাম যে তারা সেখানে নাই। তারা নাকি বদরগঞ্জে ডিফেন্স তৈরি করছে, যাতে রংপুর ক্যান্টনমেন্ট থেকে খানসেনারা এদিকে আগাই আসতে না পারে। নিশ্চিত হলাম ২৯ মার্চ বিকাল থেকে ওনারা বদরগঞ্জে ডিফেন্স তৈরি করতে ব্যস্ত। রাত্র নয়টার সময় আমরা সেখানে গেলাম। সেখানে সুবেদার শহীদুল্লাহ এবং জহীরউদ্দীনের সঙ্গে দেখা করে জানালাম যে তাদের ওয়াইফ এবং সন্তানদের পাওয়া গেছে এবং তারা এখন আমার বাড়িতেই আছে। ওরা বললেন যে, ওরা এখন ওখানেই থাক, পরে দেখব, আমাদের তো এখন যাওয়ার সুযোগ নেই। সেখানে তখন নন্দ কুণ্ডু, ননী গোপাল এবং আনিসুল চৌধুরী সাহেব ছিলেন—আনিসুল চৌধুরী ১৯৬৯ সালে মুসলিম লীগ থেকে আওয়ামী লীগে যোগদান করেছিলেন। তাঁরা আমাদের নির্দেশ দিলেন মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য খাবারদাবার, চাউল-ডাউল ইত্যাদি সংগ্রহ করার জন্য। ৩০ মার্চ আমরা গ্রাম থেকে চাউল, খই, মুড়ি যা পেলাম, সংগ্রহ করে গরুর গাড়িতে করি তাদের পৌঁছায় দিলাম। ১ এপ্রিল তারা ডিফেন্সে থাকল। ২ এপ্রিল ১০টা-১১টার সময় রংপুর ক্যান্টনমেন্ট থেকে খানসেনারা সত্যি আসলো। সেখানে প্রথম ভীষণ যুদ্ধ হলো। খানসেনারা ছিল ভারী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। তাদের সামনে আমাদের থার্ড বেঙ্গল, ইপিআর, স্থানীয় মুজাহিদ এবং আনসার বাহিনী হালকা অস্ত্রশস্ত্রের কারণে বেশি সময় টিকে থাকতে পারে নাই। ২ এপ্রিল তারিখে তাদের জন্য আমরা আবার চাউল-ডাউল ইত্যাদি নিয়া যাইতেছি। বদরগঞ্জের দুই মাইল দূরে থাকতেই দেখি অসম্ভব গুলি আর শেলিং হচ্ছে। গোলাগুলির শব্দে আমরা ভীত হয়ে পড়লাম। তার কিছুক্ষণ পর লোকজনের মুখে শুনলাম যে থার্ড বেঙ্গল, ইপিআর, মুজাহিদ, আনসার সমন্বয়ে গড়া আমাদের মুক্তিবাহিনী যারা ডিফেন্সে ছিল তারা পাকিস্তানি বাহিনীর প্রবল আক্রমণে ছত্রভঙ্গ হয়ে কে কোথায় চলে গেছে তার কোনো খবর নাই। আরও শুনলাম, বদরগঞ্জের পশ্চিম পাশে কাওয়ারডাঙ্গা নামে একটা জায়গা আছে, সেখানে কিছু ইপিআর সৈনিক তাদের ছোট ছোট অস্ত্র নিয়া অবস্থান করছে। আমরা সেখানে গেলাম। যাওয়ার পর তারা বলল, ভাই, টিকতে পারলাম না, এখনই আমাদের ব্যাক করতে হবে। আমি তাদের বললাম, আপনারা কিছু খাওয়াদাওয়া করেন। তারা বলল, খাওয়াদাওয়া করার কোনো অবকাশ নাই, এখানে বেশি দেরি করা যাবে না। হয়তো খানসেনারা নদী পার হয়ে

গেছে। বদরগঞ্জ নদী পার হয়ে এদিকে ঢুকতে পারে। তারপর ওরা সবাই দ্রুত চলে গেল।

এদিকে জহীরউদ্দীন প্রধান আর শহীদুল্লাহ সাহেবও চলে গেছেন। সেখানকার মানুষজন খুব ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় ছিল। তারা বাড়িঘর ছেড়ে পালাতে থাকল। এই অবস্থায় আমরাও ফিরে এলাম। দেখতে দেখতে এপ্রিলের ১৪-১৫ তারিখ পর্যন্ত চলে গেল। আমি মোতালেব মণ্ডল এবং অন্যদের ইন্ডিয়া পাঠিয়ে দিলাম। মোতালেব মণ্ডলরা ইন্ডিয়ায় গিয়ে শহীদুল্লাহ এবং জহীরউদ্দীন সাহেবের নাগাল পেল। ওদের সহযোগিতায় তারা মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করল। এদিকে এ সময়ের মধ্যে আমি বদরগঞ্জের আশপাশের বিভিন্ন গ্রাম থেকে থার্ড বেঙ্গলের ২৫-৩০ জনের ফ্যামিলিকে উদ্ধার করে তাদের আমার বাড়িতে নিয়ে আসলাম। তারা আমাদের বাড়িতেই থাকল। এরপর ইন্ডিয়া থেকে আমার কাছে একটা চিঠি আসলো যুবক ছেলেপেলেদের পাঠানোর জন্য। এই চিঠি পাওয়ার পর আমি ইন্ডিয়ায় না গিয়ে ছেলেপেলেদের সংগঠিত করে ইন্ডিয়ায় পাঠাতে থাকলাম। আমি সত্যিকারভাবে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লাম। আমি কিন্তু ভাই দেশ স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত আর ভারতে যেতে পারলাম না। আমার এ এলাকা থেকে আমি, বদরগঞ্জের আফসার আলী, মিঠাপুকুর থানার সোলেমান মিয়া এবং এই এলাকার এমদাদুল, মিজানুর রহমান আর একজন হিন্দু ছেলে তার নাম পুলিন—আমরা সংঘবদ্ধভাবে মুক্তিবাহিনীর জন্য ছেলে সংগ্রহ করতে থাকলাম। আমরা সবাই একত্র হয়ে ওই এলাকার সোলেমান মিয়ার নেতৃত্বে যুবক ছেলেদের সংগ্রহ করা শুরু করলাম। অনেক ছেলেপেলে আমরা এখান থেকে পাঠিয়ে দিলাম। আমি তখন বাড়িতে থাকতাম না। একদিন নিজ এলাকায় আসার পর আমি বাড়িতে খোঁজ নিয়ে শুনি আমার বাড়ির অবস্থা খুব খারাপ। পার্বতীপুরে অসংখ্য বিহারি ছিল। বাচ্চু খাঁ নামে তাদের একজন নেতা আছিল। সেই বাচ্চু খাঁ আমাদের এলাকার বিভিন্ন ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আর মেম্বারদের নিয়ে 'শান্তি কমিটি' নামে একটা কমিটি গঠন করে। এপ্রিল মাসের শেষ দিক থেকে সে মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে একটা সংগঠন তৈরি করা শুরু করল। এই বাচ্চু খাঁ এবং অপর নন-বাঙালিরা পার্বতীপুরের আশপাশে যে গ্রামগুলো ছিল সেইগুলো জ্বালিয়ে-পোড়ায় শেষ করে দিল। ফলে লোকজন ইন্ডিয়ায় যাওয়া শুরু করল ব্যাপকভাবে। বদরগঞ্জ এলাকা থেকে হিন্দু-মুসলমান সমস্ত মানুষ আমাদের এই দিক দিয়া তখন ইন্ডিয়া যাচ্ছে। তারা কেবল বাঁচার জন্য পরিবার-পরিজন নিয়া ধনসম্পদ, বাড়িঘর সমস্ত ছেড়ে ইন্ডিয়ার দিকে যাচ্ছে। অন্যদিকে পার্বতীপুর

এলাকা থেকে শত শত বাঙালি পরিবার আমাদের এই জঙ্গল এলাকায় আশ্রয় নেওয়ার জন্য আসতেছে। উদ্বাস্তু এসব মানুষ তখন আমাদের খাগড়াবন্দ, দলাইপোতা, মধ্যপাড়া, গুড়গুড়ি, ওসমানপুর, হাজীপুর প্রভৃতি এলাকায় আশ্রয় নিল। আমার বাড়িতে আশ্রয় নিল প্রায় ১৫-২০টা ফ্যামিলি। এ ছাড়া বেঙ্গল রেজিমেন্ট পরিবারের সদস্যরা তো ছিলই।

আমাদের গ্রাম এলাকার মানুষ বড় ডুগিত (চাল রাখার মাটির বড় পাত্র) করে চাউল রাখে সারা বছর ভাত খাওয়ার জন্য। আমাদের পরিবারের সারা বছরের চাল কয়েক দিনের মধ্যেই শেষ হয়ে গেল। এর পর থেকে অনেক কষ্ট করে সংসার চালানো শুরু করলেন আমার পিতা। এর মধ্যে রাজাকার বাহিনী তৈরি হয়ে গেছে। আমাদের গ্রামের কিছুসংখ্যক লোক রাজাকার বাহিনীতে চলে গেছে। আমার বাড়ি থেকে প্রায় দুই মাইল দূরে হচ্ছে ওসমানপুর গ্রাম, ওই গ্রামটা ছিল রাজাকারদের আখড়া। গ্রামটি রাজাকারদের মিনি ক্যান্টনমেন্ট হিসাবে পরিচিতি লাভ করল। ওই গ্রামের প্রায় প্রত্যেকটা ফ্যামিলির কেউ না কেউ রাজাকার বাহিনীতে যোগদান করল।

১৯৭১ সালে আপনি কি আক্রান্ত হয়েছিলেন?

● হ্যাঁ, ১১ শ্রাবণে হয়েছিলাম। এর আগে আমার কাছে মোতালেব ভাই ইন্ডিয়া থেকে একটা চিঠি পাঠায়। চিঠির মূল কথা ছিল এলাকার খবরাখবর ভালোভাবে নিয়ে এলাকা সম্বন্ধে একটি রিপোর্ট পাঠানো। এ সময় রাজাকার বাহিনী তৈরি হচ্ছিল। অনেকেই রাজাকার বাহিনীতে যাওয়ার চেষ্টা করতেছে। আমার গ্রাম থেকে কিছু লোক চলে গেল। পার্শ্ববর্তী ওসমানপুরের কথা বললাম। এটাই কিন্তু তাদের জানার বিষয় ছিল। এটাই আমার ওপর নির্দেশ ছিল। মিলিটারি আর রাজাকাররা কী করছে, সেটা দেখার জন্য আমি গোপনে বদরগঞ্জ এলাকা পার হয়ে তারাগঞ্জ পর্যন্ত গেছিলাম গুড় বহনকারী একটি গাড়িতে করে। তখন গুড় আমাদের এই এলাকা থেকে ওখানে যেত। আমি একটা গরুর গাড়ি ঠিক করলাম। আমার বাড়ি থেকেও দু-চারটা গুড়ের হাঁড়ি আমি তুলে দিলাম গরুর গাড়িতে। বাবা-মা তো আমাকে যাইতেই দেয় না। তাদের বারণ সত্ত্বেও আমি গেলাম। আমার তো এটা তখন নেশার মতো, না গেলে চলবে না। তখন আমি গুড়ের গাড়ির সঙ্গে তারাগঞ্জ চলে গেলাম। গুড় বিক্রি, ওটা তো অছিলা মাত্র। আসলে সবকিছু দেখা এবং খবরাখবর নেওয়ার জন্য গেছি।

আমার তারিখ মনে আছে, ১১ শ্রাবণ। আমি তারাগঞ্জ থেকে ফিরছি, বদরগঞ্জের পশ্চিম এলাকার রেল গুমটির পশ্চিম দিক দিয়ে রেললাইনটা

পার হয়ে এসেছি। ওখানে ঠাকুরবাবুর বাগান নামে একটা জায়গা আছে। সেখানে দাঁড়ায় আছি। তখন দেখি ওসমানপুরের একদল রাজাকার কেবল লাঠিটাটি নিয়া ট্রেনিং নিচ্ছে। তারপর তারা আমার সামনে দিয়া চলে গেল। তারা আমাকে দেখল। কিন্তু আমার সঙ্গে তারা কেউ কথা বলে নাই। ওই রেল গুমটিতে দুইজন নন-বেঙ্গলি ছিল। দেখি, নন-বেঙ্গলি দুইজন আমার দিকে আসতেছে। এরা আমাকে চিনত বলে মনে হলো। আমি একসময় বদরগঞ্জের ছাত্র ছিলাম। বদরগঞ্জের অনেকেই আমাকে চিনত। ওই দুইজনের পিছনে পিছনে আরও কয়েকজন আসতে থাকে। ওরা যখন নিকটবর্তী হলো তখন দেখি, ওদের পিছনে আরও চার-পাঁচজন আসতেছে। এরা রাজাকার এবং নতুন ট্রেনিং নিচ্ছে। বিহারি কজন নিকটবর্তী হয়ে বেশ জোরেই আমাকে বলল, এই, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন? এই ধরো এটা। তখন তো আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম। তারপর দৌড় দিলাম। কিন্তু দৌড়াইতে পারলাম নারে, ভাই! সে দিন একটু বৃষ্টি হইছিল। নয়নতলায় ছোট একটা গর্তে আমি পড়ে গেলাম। তখন বিহারিরা এসে আমাকে খপ করে ধরল। তারপর ওরা আমাকে বদরগঞ্জে নিয়ে গেল। বদরগঞ্জে সর্দারপাড়ায় যে রেলব্রিজটা আছে ওই রেলব্রিজের কাছে তখন খানসেনারা ডিফেন্স করে আছে। ওখানে নিয়া গিয়া তারা আমাকে মারধর শুরু করল। কিলঘুষি মারতে মারতে হাত বেঁধে ফেলল। হাত বান্ধি হঠাৎ জোরে হ্যাঁচকা টান মারে আর আমি ধুড়ম করি পড়ি যাই। এভাবে কিছুক্ষণ চলল। তারপর শিল-পাথরের ওপর দিয়ে আমাকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া শুরু করল। একসময় স্টেশনের দিকে নিয়া গেল। ওখানে কিছু লোক ছিল, তাদের মধ্যে আমার কিছু চেনা লোকও ছিল। চেনা সবাই আমাকে দেখি তো অবাক! তারপর পাকিস্তানিরা আমাকে থানার ভেতর নিয়া গেল। থানা এলাকার ভিতর নিয়া গেছে পর দেখি যে, রাজাকাররা কেবল লাইন করি খাড়া হইছে। ম্যালা লাইন। তারা প্যারেড করতেছে। বাঁশের লাঠি তাদের হাতে। সব ট্রেনিং নিচ্ছে। আমাকে নিয়ে যাওয়ার পর দুইজন খানসেনা আসি চেয়ারে বসল। তারপর আমাকে বেধড়ক পেটানো শুরু করল। ভাই, সে পিটানোর কোনো শৃঙ্খলা নাই। কোথায় লাগতেছে, কোথায় মারতেছে তার কোনো ঠিক নাই। তারপর রাজাকার আর বিহারিরা আমার পায়েও বন্ধন দিল। তারপর আমাকে চিত করে শোয়াইল। এবার দুইখান খালি পায়ের তলায় মাইর শুরু করল লাঠি দিয়া আর বলতে থাকল, 'মুক্তিফৌজ কাহাঁ, বাতাও শালা, আওর না বাতাও তো শালেকো গুলি করো।' এইভাবে ওরা উর্দুতে কথা বলতেছিল। তারপর রাজাকারদের তিন-চারজন আমাকে

ধরল। থানার যে পুলিশ তারা কিন্তু আমাকে দেখে হতবাক। পুলিশ ওদেরকে সাহায্য করতেছে না। রাজাকার, খানসেনারা দুইজন, আর বিহারিরা আসি আমার পা দুইটা আলগা করি বদরগঞ্জ থানার সেকেন্ড অফিসারের যে বাসাটা এবং সেই বাসার সামনে যে আমগাছটা, সেই আমগাছটার একটা ডালে আমাকে উল্টা করে লটকাইল। লটকাইয়া আবার মাইর শুরু করল। তাদের বক্তব্য একটাই, 'হাতিয়ার কাহাঁ, মুক্তিফৌজ কাহাঁ'। আর কিছু বলেটলে না, আমি তো সব বুঝিও না। তারা মেরে আমার সমস্ত শরীর ক্ষতবিক্ষত করল। তাদের মারের চোটে আমার শরীর একেবারে নিস্তেজ হয়ে পড়ল। একপর্যায়ে আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম। জ্ঞান ফিরে এলে দেখি আমি তখনো গাছেই লটকানো আছি। এরপর ওরা আমাকে নামাল। আমি আর নড়তে পারতেছি না। তখন বাচ্চা মিয়া পাইকার নামে এক প্রভাবশালী লোক ছিলেন। উনি বদরগঞ্জ থানা পিস কমিটির বোধ হয় চেয়ারম্যান ছিলেন। তারপর খয়ের মাস্টার, শ্যামপুর হাইস্কুলের হেডমাস্টার, বদরগঞ্জে বাড়ি, তারপরে আবদুল হামিদ সাহেব, উনিও একসময় শ্যামপুর হাইস্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন, এ সময় তিনি বদরগঞ্জ হাইস্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন, তারা সবাই আমাকে দেখে চিনলেন। আমাকে দেখে তারাও হতবাক। বাচ্চা মিয়া পাইকার খানদের সঙ্গে কথা বললেন। তিনি ওদের জিজ্ঞাসা করলেন, ছেলেটাকে কী জন্য নিয়ে আসছেন? পিস কমিটি গঠন করেছেন শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য। এই ছেলের অপরাধ কী? এই কথা শুনে ওই দুই খানসেনা তাদের এমন এক ধমক মারল যে ওরা সব চুপ হয়ে গেল। কেউ আর কথা বলতে সাহস করল না। ক্রমে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসলো। খানসেনারা বিহারি আর রাজাকারদের কী যেন হুকুম দিল। হুকুম দিয়ে ওরা আর ওখানে থাকল না। আমি সবই দেখতিছি। কিন্তু নড়তে পারতেছি না, সমস্ত শরীর আমার ক্ষত-বিক্ষত এবং প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করছিলাম। এই যে আমার আঙুলটা এখনো বাঁকা দেখছেন, এটা তখনকার ভাঙা। তারপর আমার পা দেখেন, এখনো একাত্তরের চিহ্ন বহন করে চলেছি। যাহোক, খানসেনারা চলে যাওয়ার অনেকক্ষণ পর থানার ভিতরে যে বন্দীখানা অর্থাৎ থানাহাজত, ওইটার ভিতরে নিয়া গিয়া আমাকে ঢুকাইল। গণেশ নামে এক হিন্দু ছেলেকেও তারা ধরি আনছে, ওকেও খুব মারছে। আর পার্বতীপুরে বর্তমান বিএনপির যে সেক্রেটারি সাজিদুর রহমান, ওকেও কিন্তু তারা ধরি নিয়ে গেছিল। তবে সাজিদুরকে তারা ছাড়ি দিছে। গণেশ, আমি আর শশধর নামে আর একজন হিন্দু—এই তিনজন থাকলাম থানাহাজতে। বদরগঞ্জ থানার তখন যে ওসি

ছিল, তার নাম খেয়াল নাই, রাত্রে উনি থানাহাজতের সামনে আসলেন। তিনি দাঁড়িয়ে সেপাই আর দারোগার সাথে কথা বলতেছেন। তাদের কথা আমি শুনতে পাচ্ছি। তিনি তাদের বলছেন, চালান দিলে এরা কিন্তু বেঁচে যাবে। আপনারা আসেন, এখনই এদের চালান দিয়ে দেই। তারপর উনি সত্যি আমাদের কোর্টে চালান দেওয়ার সব ব্যবস্থা নিলেন। সেই রাতেই কয়েকজন সেপাই আর এক দারোগা গভীর রাতে আমাদের স্টেশনে নিয়া আসল। হাঁটতে তো কেউ পারতেছি না। তারা কোনোরকমে আমাদের ধরে স্টেশনে নিয়া আইলো। রাত তিনটা কি সাড়ে তিনটার ট্রেনে করে রংপুরে এনে সরাসরি কোর্টে নিয়া গেল। তারপর সেখান থেকে রংপুর জেলখানায়। ১১ শ্রাবণে আমি অ্যারেস্ট হই। আর ১১ দিন পর আমি জামিনে মুক্তি পেলাম। একজন বাঙালি ম্যাজিস্ট্রেট আমাকে জামিন দিয়ে দিছেন। আমি জামিন পেয়ে চলে আসি। আর কোর্টে যাইটাই নাই। তখন তো আমি অসুস্থ। সমস্ত শরীরে ঘা। এই রকম অবস্থায় মাস দেড়েক দুয়েক আমি মধ্যপাড়া, পাঁচপুকুরিয়া, রসুলপুর গ্রামে লুকাইয়া থাকলাম নিজের জীবন রক্ষা করার জন্য। গ্রামে তো তখন কোনো রকম ওষুধও পাওয়া যায় না। এভাবে থাকতে থাকতে ঘাগুলো ক্রমশ কম হয়ে আসলো। আমি সুস্থ হয়ে উঠলাম।

এর পরপরই দেখলাম আমাদের এলাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতা বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে। শত শত মুক্তিযোদ্ধা আমাদের এই জঙ্গলের দিকে চলে আসা শুরু করল। মোতালেব মুক্তিযোদ্ধার নেতৃত্বে এক দল, আলাউদ্দীন এবং কায়সার আলীর নেতৃত্বে আরও দুটি মুক্তিযোদ্ধা দল আসলো। তারা এই এলাকায় শেলটার নিয়ে অপারেশন শুরু করল। এর মধ্যে একদিন ওসমানপুর থেকে রাজাকার, খানসেনা আর বিহারি আমাদের এখানে আসে। তারা আসি আমাদের কাচারিতে আগুন লাগিয়ে দিল। আমার বাবাকে অ্যারেস্ট করল। আহম্মদ আলী, মজিদ শাহকে অ্যারেস্ট করল। আবদুল হামিদ শাহ আমাদের এলাকার সেই সময়ের একজন প্রবীণ লোক ছিলেন। আমার বাবার চাচাতো ভাই তিনি, তাকেও অ্যারেস্ট করল। আরও বিশিষ্ট কিছু লোককে খানসেনারা অ্যারেস্ট করে নিয়ে গেল। হোসেনপুরের দিকে নিয়া গিয়া তাদের ওপর অকথ্য নির্যাতন করে পাকিস্তানিরা। তবে মারে নাই। অবশ্য ওই দিন আমাদের খামার এলাকায় অন্য এক লোককে তারা গুলি করে মারছে। আমাদের এলাকার নেজামউদ্দীন হাজি সাহেবের ছেলে শাহাবুদ্দীনকে ওরা সে দিন গুলি করে মারছে। তারপরে আমাদের ইউনিয়নের তখন চেয়ারম্যান ছিলেন আজিজ চৌধুরী, তার ভাই মতি

চৌধুরীকেও খানসেনারা ওই দিনই মারছে। ওদের মারার কারণ শুনছি, ওরা নাকি মুক্তিযোদ্ধাদের সাথেও লিয়াজোঁ রাখত, আবার খানসেনাদের দালাল ওই বাচ্চু খাঁর সাথেও লিয়াজোঁ রাখত। এই সংবাদ পাকিস্তানি দালাল বাচ্চু খাঁ খানদের বলে। তার পরই ওই গ্রামে আসি খানসেনারা ওদের মারি দিছে।

আপনি কি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন?

● আমি ট্রেনিংপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা নই। দেশের ভিতরে থেকেই মুক্তিযুদ্ধের কাজ করছি। আমি নিজে সরাসরি যুদ্ধে যাই নাই।

আপনার এলাকা কখন পাকিস্তানি সৈন্যরা আক্রমণ করল?

● আমার এলাকা বাংলা আষাঢ় মাসের শেষ দিকে প্রথম আক্রমণ করে।

কীভাবে আক্রমণ করল?

● বাংলা আষাঢ়-শ্রাবণের দিকে রাজাকার আর নন-বেঙ্গলিগুলোসহ খানসেনারা পার্বতীপুর, ভবানীপুর আর বদরগঞ্জ থেকে আসে। আমাদের এদিকে ঘন বন-জঙ্গল থাকায় তারা প্রথমদিকে আমাদের এলাকায় আসেনি। শুনছি তারা আসতে ভয় করত। পরে এরা একসঙ্গে এদিকে আসে। আসি গ্রামগুলো লুটতরাজ করে। কোথাও কোথাও আগুন লাগিয়ে দেয়। অনেক ধরপাকড়-মারধর করে। মানুষজনকে হত্যাও করে।

পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী আপনার এলাকায় আর কী করল?

● পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী আমাদের এলাকায় অপারেশন চালিয়ে মুক্তিযোদ্ধা খোঁজা শুরু করল। মুক্তিযোদ্ধারা আমাদের এখানেই বেশি থাকত। মুক্তিযোদ্ধাদের খাবারদাবার, শেল্টার দেওয়া, যোগাযোগ—এসব কাজ তো আমিই করেছিলাম, সাথে বন্ধুরা ছিল। গুড়গুড়ি আর মধ্যপাড়া দুইটা আলাদা মৌজা হলেও গুড়গুড়ি-মধ্যপাড়া একসঙ্গে বলে থাকে সবাই। গুড়গুড়ি আর মধ্যপাড়া পাশাপাশি। এই গুড়গুড়ি-মধ্যপাড়ার জঙ্গলে মুক্তিযোদ্ধারা থাকত। পাকিস্তানিরা এসে মুক্তিযোদ্ধাদের খুঁজতে থাকে। তারা বলে গুড়গুড়-মধ্যপাড়া কাহাঁ। তারপরই তারা এই এলাকায় আক্রমণ শুরু করে। একদিন মুক্তিযোদ্ধা কায়সার আলীর দল আমাদের এই পার্শ্ববর্তী উত্তরা গ্রামে পাকিস্তানিদের আক্রমণের মধ্যে পড়েছিল। মুক্তিযোদ্ধাদের দলটি ছিল ২০-২৫ জনের। গোটা দলটাই কিন্তু সে দিন শেষ হয়ে যেত। কিন্তু অল্পের জন্য তাদের জীবন বেঁচে গেছে। খানসেনা আসছে জানতে পেরে তৎক্ষণাৎ তাদের হাতিয়ার কোথায় যেন লুকিয়ে ফেলে। পরে আমরা জানছি, ওখানে যে বিল আছে আমাদের, সেই বিলের মধ্যে ডুবে কচুরিপানা মাথায় দিয়ে আত্মগোপন করেছিল। যে বাড়িগুলোতে ওরা ছিল সেই

বাড়িগুলোতে খানসেনারা অপারেশন করছিল। কিন্তু আল্লাহর রহমতে আগাম খবর জানার কারণে আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা রক্ষা পাইছে। আর এ আগাম খবর দিয়েছিল গ্রামের মানুষ।

স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় আপনার পরিবারের কেউ শহীদ হয়েছে কি?

- আমার পরিবারের কেউ শহীদ হয় নাই। তবে আমাদের এখানকার মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হয়েছে দুইজন। একজনার নাম হলো ফজলার রহমান। আর একজনের নাম আবু তাহের। ছেলেটার বাড়ি কিন্তু কুমিল্লা। এখানে তার বোনের বিয়া হইছিল। যুদ্ধের আগে থেকেই ও আমাদের এখানে ওর ভগ্নিপতির সাথে থাকত এবং এখানকার স্কুলে পড়ত। ওই ছেলেও মুক্তিযোদ্ধা ছিল। সে শহীদ হয়েছে।

আপনার এলাকায় কখন থেকে মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা শুরু হয়?

- আষাঢ় মাসের শেষ দিক থেকে আমাদের এলাকায় মুক্তিফৌজের তৎপরতা শুরু হয়। শ্রাবণ মাসে বেড়ে যায়।

আপনার গ্রাম বা এলাকায় রাজাকার কারা ছিল?

- আমার গ্রামে রাজাকার ছিল কালিয়া মণ্ডল, সিরাজুল শাহ্, আবদুস সালাম, নুরুল ইসলাম, সামসুল হক বেঙ্গু, হামিদ আলী এবং আরও কয়েকজন।

শান্তি কমিটিতে কারা ছিল?

- শান্তি কমিটিতে মজিদ শাহ্ আর সৈয়দুল শাহ্ ছিল।

তারা এখন কোথায়?

- মজিদ শাহ্ মারা গেছেন। উনি আওয়ামী লীগের স্থানীয় একজন নেতা হয়েও শান্তি কমিটিতে গেছিলেন। কিন্তু সৈয়দুল শাহ্ আগাগোড়াই আওয়ামী লীগবিরোধী লোক ছিল। জামায়াতে ইসলামী করতেন। সৈয়দুল শাহ্ এখনো বেঁচে আছেন।

আপনার এলাকায় আলবদর, আলশামস কারা ছিল?

- আলবদর, আলশামস আমার গ্রামে বা আমার এলাকায় কেউ ছিল না।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সব স্বাধীনতাবিরোধীকে ধরা হয়েছিল কি?

- ১৬ ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আমাদের মুক্তিফৌজেরা সব বের হয়ে পড়ল, সামনে আসলো। আর তখন শান্তি কমিটির লোকজন, রাজাকার এবং অন্য দালালরা আত্মগোপন করল। আমাকে যে দুজন রাজাকার ধরিয়ে দিছিল তাদের নাম শাহাবুদ্দীন আর আনসার ফকির। এই দুইজনকে ধরে ফেলল আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা এবং তাদের মারধর করে ছেড়ে দেয়। শান্তি কমিটিতে এবং রাজাকারে আর যেসব লোক ছিল, তাদের কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। কেনান সরকার খানসেনাদের বড় সাহায্যকারী ছিল।

ফুলবাড়ী বা কোথায় যেন বাড়ি, এই কেনান সরকার একজন হত্যাকারী। বহু হিন্দুকে সে হত্যা করছে এক দিনেই। একদিন সে অনেক শরণার্থীকে পথে হত্যা করছে এবং তাদের ধনসম্পদ লুটতরাজ করছে। আর পার্বতীপুরের নঈম কাজীও বহু হিন্দু, মুক্তিযোদ্ধা এবং আমাদের স্বাধীনতাসংগ্রামের পক্ষের লোকজনের ওপর অনেক নির্যাতন করেছে। সে অনেক মানুষও হত্যা করেছে।

তারা ছাড়া পেল কীভাবে?

- কিছু কিছু লোক জেলখানায় থাকল। কেউ মারপিট খেয়ে মারা পড়ল। এর-ওর সাহায্য নিয়েও কেউ কেউ রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা করল। আইনের ফাঁক, সাক্ষীর অভাব থেকেও অনেকে ছাড়া পেল।

যুদ্ধ শেষে আপনার এলাকার অবস্থা কেমন দেখলেন?

- যুদ্ধ শেষে দেখি বিভিন্ন গ্রামের বেশির ভাগ বাড়িঘর ভাঙাচুরা, সব তো শেষ। মানুষের খাবার নাই। হাজার হাজার মানুষ নিরাশ্রয়। যুদ্ধ শেষে ভারতে আশ্রিত লোকজন যখন আসা শুরু করল, তখন তাদের মাথা গোঁজার ঠাঁই এখানে ছিল না।

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **অমরচাঁদ গুপ্ত**
নভেম্বর ২৯, ১৯৯৬

শহীদুর রহমান

পিতা : কায়েমউদ্দীন, গ্রাম ইউনিয়ন ও ডাকঘর : খয়েরবাড়ী, থানা : ফুলবাড়ী, জেলা : দিনাজপুর, শিক্ষাগত যোগ্যতা : এইচএসসি, ১৯৭১ সালে বয়স ১৭ বছর, ১৯৭১ সালে ছাত্র ছিলেন, বর্তমানে চাকরি করেন।

১৯৭১ সালে আপনি কি পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাতে আক্রান্ত হয়েছিলেন?

- না।

আপনি কেন মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেন?

- অংশগ্রহণের পিছনে বেশ কয়েকটা কারণ ছিল। তার মধ্যে প্রধান কারণ হলো, এই দেশ আমাদের। পাকিস্তানি আর নন-বেঙ্গলিরা আমাদের দেশের ওপর আক্রমণ করেছে। এইটা প্রতিহত করার জন্য, দেশকে শত্রুমুক্ত করার জন্য, দেশ স্বাধীন করার জন্যই আমাদের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করা।

কীভাবে অংশগ্রহণ করলেন?

- আমার তারিখটার কথা ঠিক খেয়াল নেই। মে মাসের ৫-৭ তারিখের দিকে পাকিস্তানি সৈন্য আর বিহারিরা আমাদের গ্রামে আক্রমণ করে। তাদের আক্রমণে আমার বাড়ি বিধ্বস্ত হয়। তারপর আমি আমাদের ফ্যামিলি সহকারে ভারতে আশ্রয় নেই। সেই সময়ই পতিরামে একটা ক্যাম্প শুরু হলো। আমরা পাঁচজন প্রথম ক্যাম্পটা তৈরিতে কাজ করি। আমরা প্রথম ব্যাচ। কিছুদিন পর পতিরাম থেকে আমরা শিলিগুড়িতে ট্রেনিংয়ের জন্য চলে যাই। ওখানে এক মাস ট্রেনিং নেওয়ার পর আমাদের আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসা হলো। পতিরামের তিন কিলোমিটার দূরে আরেকটা ক্যাম্প ছিল ভারতে। সেটার নাম ছিল বরাহার ক্যাম্প। সেই ক্যাম্পে আমাদের নামিয়ে দেওয়া হয়। রাত্র তখন দুইটা। আমরা ওখানে পরদিন সারা দিন বিশ্রাম নেই। ওখানে একজন ইন্ডিয়ান মেজর এবং একজন ক্যাপ্টেন ছিলেন। মেজর সাহেব আমাদের কয়েকটা গ্রুপে ভাগ করালেন। প্রতি গ্রুপে ৭ থেকে ১০ জন করে মুক্তিযোদ্ধা দেওয়া হলো। বলা হলো, তোমরা ভিতরে ঢুকবে, রেকি করবে এবং হিট অ্যান্ড রান পদ্ধতিতে শত্রুদের ওপর আক্রমণ করবে। আমরা সাতজনের একটা টিম বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ফুলবাড়ী থানার ভিতরে ঢুকি।

তারপর?

- আমরা সাধারণ মানুষের বাড়িতে আশ্রয় নিলাম। এরপর আমরা রাতে অপারেশন করি। দিনের বেলা আমরা চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থেকে খোঁজ নিতাম কোথায় হিট করা যায়। সন্ধ্যাবেলা আমরা সবাই ফিরে এসে এক জায়গায় মিলিত হয়ে আলোচনা করে ঠিক করতাম কোন পাশে হিট করা যাবে। আমরা একেক দিন একেকটা পাশ বেছে নিতাম। সাধারণত সন্ধ্যাবেলা খেয়েদেয়ে রাতে আমরা বেরিয়ে যেতাম। হয়তো কোনো পাকিস্তানি ক্যাম্পের কাছাকাছি গিয়ে সারা রাত ওদের সঙ্গে গোলাগুলি করতাম। ভোরের দিকে ফিরে আসতাম। আমরা প্রতিদিন একই গ্রামে থাকতাম না। কোথাও হিট করার পরই সেখান থেকে আরেক গ্রামে চলে যেতাম। এভাবেই আমরা আক্রমণ করেছি এবং সেটা এই থানার মধ্যেই।

কোথায় কোথায় যুদ্ধ করেছেন?

- একবার মাছুয়াপাড়ায় যুদ্ধ করেছি। এখানে পাকিস্তানি সৈন্যদের ক্যাম্প ছিল। এটা বর্ডারের একদম কাছেই। এটা ফুলবাড়ী থানা থেকে ৫ কিলোমিটার দূরে। তখন আমরা ছিলাম ৬০ থেকে ৭০ জন। এখানে যে দিন আমরা খানসেনাদের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হই, ওই দিনই আমারই সামনে আমাদের ফুলবাড়ী কলেজের প্রিন্সিপাল আজিজ সাহেবের ভাই, নামটা আমার খেয়াল হচ্ছে না, নিহত হন। ওখানে আমাদের আরও চারজন নিহত হয়। খুব কষ্ট করে পালিয়ে এসেছি ওখান থেকে। ওখানে ছোট্ট একটা ভুল হয়ে গিয়েছিল আমাদের।

  আমাদের বলা হয়েছিল যে তোমরা পাকিস্তানিদের ক্যাম্প থেকে অন্তত ১০০ গজ পিছিয়ে অবস্থান নেবে কিন্তু আমাদের যে টিম লিডার ছিল সে খুব সাহসী ছিল। সে আমাদের একেবারে ক্যাম্পের সামনে নিয়ে গিয়েছিল। প্রায় ৫০ গজের মধ্যে। প্রথমে কথা ছিল ভারতের সেনাবাহিনী পাকিস্তানি অবস্থানে শেলিং করবে। সে জন্য আমাদের বলেছিল টার্গেট থেকে ১০০ গজ পিছিয়ে থাকতে। শেলিং করার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আমরা এগিয়ে যাব। কিন্তু আমাদের যে লিডার ছিল, সে আমাদের টার্গেটের ৫০ গজের মধ্যে নিয়ে যাওয়ামাত্রই শেলিংটা শুরু হয় এবং শেল আমাদের ওপরই পড়তে থাকে। আমরা রাত্রিবেলা ঠিক বুঝতে পারিনি যে কে মারা গেল বা কে থাকল। শেলিং শেষ হওয়ার পর উভয় পক্ষ থেকেই শুরু হলো ফায়ারিং। সেখানে একটা পুকুর আছে। পুকুরের ওই পারে ওরা অর্থাৎ খানসেনারা। খানসেনা শ দেড়েকের মতো, আর আমরা ৬০-৭০ জনের মতো

ছিলাম। সারা রাত ধরে গোলাগুলি করার পর আমরা পিছিয়ে আসি। সকাল হয়ে গেল। পিছিয়ে এসে একটা স্কুলে আমরা মিলিত হলাম। সেখানে এসে দেখলাম আমাদের চারজন ছেলে নেই। সকালবেলা আবার আমরা চারজনকে পাঠিয়ে দিলাম রেকি করার জন্য। তারা সংবাদ নিয়া আসলো যে, চারজনই খানসেনাদের গুলিতে নিহত হয়েছে এবং লাশ খানসেনাদের কাছে। সকাল হয়ে গিয়েছিল এবং আমরা যখন পিছিয়ে আসছি, সঙ্গে সঙ্গে খানসেনারা ঘিরে নিয়েছে জায়গাটা। ঘিরে নেওয়ার পর লাশগুলো ওরাই নিয়ে গিয়েছিল।

আপনার এলাকায় কখন পাকিস্তানিরা আক্রমণ করল?

● প্রথমে পাকিস্তানি বাহিনী ঠিক নয়, ওদের মদদপুষ্ট কিছু বিহারি আমাদের গ্রামে আক্রমণ করে। এপ্রিলে পাকিস্তানিরা আক্রমণ করে ফুলবাড়ী দখল করে নেয়। তাদের সঙ্গে বিহারিরাও ছিল। তখন থেকে স্বাধীনতার আগ পর্যন্ত তারা ওই এলাকাতেই ছিল। তখন আমি ছিলাম না। আমি মুক্তিবাহিনীতে চলে যাই। পাকিস্তানি সৈন্য আর বিহারিরা আমাদের গ্রামের বাড়িঘর সার্চ করে যেটুকু নেওয়ার মতো সম্পদ ছিল, তারা তা নিয়েছে। বিশেষ করে, ওদের যেটা অভ্যাস ছিল, মেয়েমানুষের ওপর টর্চার করা, সেটা তারা বেশি করে। আমাদের গ্রামের দুইটা মেয়েকে তারা খুব নির্যাতন করেছিল। আমাদের গরু-বাছুর, ধনসম্পদ যা ছিল, সবই তো তারা নিয়ে গেছে।

পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী গ্রামের লোকজনকে তেমন অত্যাচার করতে পারেনি। জনগণের মধ্যে আগেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে, যে কারণে তারা পালিয়ে যায়। অল্প কিছু মানুষ গ্রামে ছিল, তারাও যখনই শুনতে পেয়েছে যে পাকিস্তানি সেনা আসতেছে তখনই তারা সবকিছু ছেড়েছুড়ে দুই-তিন মাইল পিছে চলে গেছে।

সেই সময় আপনার পরিবারের কেউ শহীদ হয়েছে কি?

● না।

আপনার এলাকায় কখন থেকে মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা শুরু হয়?

● এপ্রিলের শেষের দিকে আমরা ট্রেনিং নেওয়া শুরু করি। ট্রেনিং শেষ হলেই আমরা তৎপরতা শুরু করি। এটা বোধ হয় জুন মাস থেকে।

আপনার গ্রাম বা এলাকায় কারা রাজাকার ছিল?

● আমাদের গ্রামে একজন মাতব্বর ছিল। সে রাজাকারের লিডার ছিল। ওর নাম ছিল আফাজউদ্দীন মণ্ডল। আর যারা ছিল তারা নিরীহ, খুব গরিব মানুষ। কিছুটা পয়সার লোভে তারা রাজাকার হয়েছে। অন্য রাজাকাররা আমাদের কিছু সাহায্য করেছে। আমরা যখন রাতে এই এলাকায় আসতে চাইতাম, তখন ওদের খবর পাঠাতাম যে আসব কি না। ওরা যখন আমাদের বলত যে, ঠিক আছে আসেন, পার করে দেব আপনাদের, তারপরই আসতাম।

শান্তি কমিটিতে কারা ছিল?

● শান্তি কমিটিতে আমাদের গ্রামেরই আরেকজন ছিলেন। আলহাজ শফিউদ্দীন আহমেদ। শান্তি কমিটিতে গেলেও উনার মনোভাব ভালোই ছিল। উনার এক ছেলে ছিল মুক্তিযোদ্ধা। উনি বয়স্ক লোক এবং হাজি ছিলেন, যার জন্য এখানকার যারা নন-বেঙ্গলি ছিল, যারা পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে ছিল তারা তাকে শান্তি কমিটিতে নিয়েছিল। হাজি সাহেবও চাচ্ছিলেন খানসেনাদের সঙ্গে কো-অপারেশন রাখতে, যাতে এই গ্রামের মধ্যে কোনো অত্যাচার-জুলুম না হয়।

এই এলাকার স্বাধীনতাবিরোধীদের ধরা হয়েছিল কি?

● দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আমি যখন গ্রামের বাড়িতে গেলাম, তখন আমার সঙ্গে সেই রাজাকার কমান্ডারের দেখা হয়েছিল। আমার সাথে তখন অনেক সাথি ছিল। তারা ওই লোকটাকে মারার জন্য উদ্যত হয়েছিল। কিন্তু আমি লোকটাকে মারতে দেই নাই। আমরা স্বাধীন যখন হয়েই গেছি, তখন লোকটাকে মেরে কোনো লাভ ছিল না বলে আমি তাকে মারতে দেইনি।

যুদ্ধ শেষে গ্রামে ফিরে আপনি কী অবস্থা দেখলেন?

● খানসেনারা আমার বাড়িটা ভেঙে দিয়েছিল। এলাকার পুলটুল ছিল সব ভাঙা। গ্রামের অনেক বাড়িঘর খানসেনারা আগুন দিয়া পুড়িয়ে দিছে। সেগুলো তখন ওভাবেই পড়ে ছিল।

যুদ্ধকালের কোনো স্মরণীয় ঘটনার কথা কি আপনার মনে পড়ে?

● হ্যাঁ, মনে আছে। অনেক কথা মনে পড়ে। সবচেয়ে বড় ঘটনা, পানিঘাটাতে পাকিস্তানি সেনাদের সঙ্গে আমরা প্রথম যুদ্ধ করতে গিয়েছিলাম। আমাদের মধ্যে একটু ভয়ের ব্যাপার ছিল। যাহোক, সেখানে যুদ্ধ করে আমরা ফিরে আসার সময় দেখি আমাদের দলের এক মুক্তিযোদ্ধা নাই। তাকে খুঁজতে গিয়ে দেখা গেল যে সে এক গাদার মধ্যে আত্মগোপন করে আছে। গাদাটা ছিল গোবরের। ছোট ডোবা বানিয়ে যেখানে লোকে গরুর মল বা গোবর ফেলে। সেই গোবরের গাদার মধ্যে সে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে ছিল। ওখান থেকে তাকে বের করে আনা হলো। তাকে সকালবেলা ওখান থেকে বের করে আনার পর আমরা দেখলাম যে শরীরে বসন্তের ঘা হলে যেমনটা হয়, তার গোটা শরীরটা ঠিক সে রকম। ওটা দেখে আমার মনের অবস্থা খুবই খারাপ হয়েছিল।

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **আবদুল কাইয়ুম**
নভেম্বর ০৯, ১৯৯৬

পরিশিষ্ট

মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা ট্রাস্ট

সালাহ্উদ্দীন আহমদ, সভাপতি
রেহমান সোবহান, সদস্য
এ কে খন্দকার, সদস্য
মঈদুল হাসান, সদস্য পরিচালক
মামুন-উর রশিদ, সদস্য
মতিউর রহমান, সদস্য

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, গবেষণা এবং স্বাধীনতা-উত্তর রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজ-সংস্কৃতি বিষয়ে গবেষণার জন্য ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা ট্রাস্ট। ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন এ দেশের বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ, অর্থনীতিবিদ ও সমাজসেবী। তাঁরা হলেন : অধ্যাপক এ আর মল্লিক (শিক্ষাবিদ, উপাচার্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও সাবেক মন্ত্রী), অধ্যাপক সালাহ্উদ্দীন আহমদ (জাতীয় অধ্যাপক ও ইতিহাসবিদ), অধ্যাপক খান সারওয়ার মুরশিদ (শিক্ষাবিদ ও সাবেক উপাচার্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়), অধ্যাপক রেহমান সোবহান (অর্থনীতিবিদ ও সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের [১৯৯০] উপদেষ্টা), ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম (রাজনীতিবিদ ও আইনজীবী), মঈদুল হাসান (সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ ও *gjavi ’71* বইয়ের লেখক), শামসুন নাহার রহমান (সমাজসেবী), মাহবুবুল গনি (ব্যবসায়ী)।

ট্রাস্টিদের মধ্যে অধ্যাপক এ আর মল্লিক, শামসুন নাহার রহমান, মাহবুবুল গনি ও অধ্যাপক খান সারওয়ার মুরশিদ মৃত্যুবরণ করেছেন। ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম পদত্যাগ করেন। নতুন ট্রাস্টি হিসেবে তিনজন অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। তাঁরা হলেন : এ কে খন্দকার, বীর উত্তম (মন্ত্রী ও সাবেক বিমানবাহিনী প্রধান), মামুন-উর রশিদ (সাবেক সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার) ও মতিউর রহমান (সম্পাদক, *c^g AvGjv*)।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসচর্চা, লালন ও বিকাশে মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা ট্রাস্টের অধীনে ১৯৯০ সাল থেকে পরিচালিত হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্র। প্রতিষ্ঠার পর থেকে মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্র মুক্তিযুদ্ধের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ, গবেষণা ও নিয়মিত সেমিনার-সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করে আসছে।